ভীমপলশ্রী

বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়
(বনফুল)

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড্ পাবলিশিং কোং লিঃ
৮-সি, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৯

প্রকাশক ঃ
শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বি. এ.
সি, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৯

মূল্য চার টাকা আট আনা
দ্বিতীয় সংস্করণ
চৈত্র, ১৩৫৭

মুদ্রাকর ঃ
শ্রীত্রিদিবেশ বসু, বি. এ.

উৎসর্গ

বন্ধুবর শ্রীযুক্ত আশু দে
(প্রখ্যাত 'অ্যাসিউড্')
করকমলে—

২০।১১।৪৮
ভাগলপুর

ভূমিকা

সুবিখ্যাত হাস্যরসিক 'Ben Travers'এর বিখ্যাত পুস্তক 'A Cuckoo in the Nest'এর রসবস্তুকে আমি বাংলায় রূপান্তরিত করবার প্রয়াস পেয়েছি এই গ্রন্থে। আখ্যানটিকে যথাসম্ভব বাঙালী রূপ দেবার জন্যে কিছু কিছু পরিবর্তনও করেছি মাঝে মাঝে।

'বনফুল"

২০।১১।৪৮

ভাগলপুর

ভীমপলশ্রী

(১)

প্রথমেই জেনে রাখা ভাল যে কাহিনীটি বিবৃত করতে উদ্যত হয়েছি তার স্থানকাল পাত্রপাত্রী সমস্তই কাল্পনিক। ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক, সামাজিক কোন রকম ফাঁদে পা দেবার ইচ্ছে নেই। স্থান অবশ্য আমাদেরই দেশ, কালও বর্ত্তমান—হোটেল, মোটর, ফোন, রেডিও, রেলগাড়ি, সবই আছে—পাত্র-পাত্রীও বাঙালী। তরুণ-তরুণী, সেকেলে, দুই-কালের-সীমা-রেখায়-দণ্ডায়মান সব রকম ব্যক্তিই আছেন।

সুশোভন গল্পের নায়ক। সার্থক-নামা ব্যক্তি। কোথাও কখনও অশোভন হয় নি। কান্তি অনিন্দ্য, ব্যাঙ্ক-ব্যালান্সও অনিন্দ্য। ভবিষ্যতও নিন্দনীয় নয়। কারণ বাপ মা ভাই বোন প্রভৃতি কোনও রকম ঝামেলা নেই। মাত্র কিছুদিন আগে বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষায় স-সম্মানে উত্তীর্ণ হয়েছে; একটি সুনির্ব্বাচিত সুহৃদ-গোষ্ঠী আছে। চাকরি কিম্বা ব্যবসা করে' অর্থোপার্জ্জন করবার প্রয়োজন হয় না। এ অবস্থায় সুতরাং যা অনিবার্য্য তাই তিনি হয়েছিলেন—'কমরেড্'। সুদের টাকা উপভোগ করতে করতে ক্যাপিট্যালিজমের নিন্দে করে' তিনি অবসর এবং চিত্তবিনোদন করতেন। কমরেড্ বান্ধবীও জুটেছিল কয়েকটি। বিয়ের সামাজিক বাজার মন্দা আজকাল। বুদ্ধিমতী বাঙালী মেয়েরা রাজনৈতিক বাজারে ভীড় করেছেন সুতরাং তর্ক, গান, গল্প, গুজব, থিয়েটার, সিনেমা, সাহিত্য, দেশোদ্ধার প্রভৃতি নিয়ে সুশোভনের দিন ভালই কাটছিল। এমন সময় হঠাৎ—ঠিক হঠাৎ না—কমরেড্ অনীতার সঙ্গে আলাপ অনেক দিন আগেই হয়েছিল—তবে অভিনব অনুভূতিটা হঠাতই উথলে উঠল একদিন এবং শেষ পর্য্যন্ত সামলানো

গেল না। বিয়েই করতে হল। অনীতার মা শ্রীযুক্তা স্বয়ম্প্রভা সরকারের ঘোর আপত্তি ছিল বিয়েতে। কিন্তু উভয়েই যখন কমরেড্, তখন আটকাল না কিছু।

শ্রীযুক্তা স্বয়ম্প্রভা সরকারকে বরবর্ণিনী বললে ব্যাকরণ ভুল তো হবেই না, অত্যুক্তিও হবে না। কিন্তু একটু বিস্তৃততর পরিচয় না দিলে সাধারণ পাঠক-পাঠিকারা তাঁর স্বরূপটি ঠিক ধরতে পারবেন না হয়তো। আপাতদৃষ্টিতে প্রতীয়-মান না হলেও স্বয়ম্প্রভা সরকার সত্যিই অসাধারণ মহিলা। ঘাড়ে-গর্দ্দানে বেঁটে মোটা বলিষ্ঠ-চোয়াল, ছোট-চুল, ঘন-ভুরু তীক্ষ্ণ-দৃষ্টি যে রমণীটি বর্ত্তমানে পাড়ার সকলের অন্তরে অবিমিশ্র ভীতি ছাড়া অন্য কোন ভাব উৎপাদন করতে ইচ্ছুক নন তিনিই যে চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে কুমারী স্বয়ম্প্রভা মিত্র ছিলেন এবং বেণী দুলিয়ে জিতু সরকারের হৃদয়-হরণ করতে সমর্থ হয়েছিলেন তা অকুণ্ঠিত-চিত্তে না পারলেও জিতু সরকারকে স্বীকার করতে হবে বই কি। স্বয়ম্প্রভা মিত্রের বাবা যখন ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করেছিলেন—তখন তা নিয়ে খুবই হৈ চৈ হয়েছিল, কিন্তু তার কিছুদিন পরেই যখন তাঁর মাইনার-পাস আলোক-প্রাপ্ত দুহিতাটি গোঁড়া হিন্দু পরিবারের নিরীহ যুবক জিতেন্দ্রনাথকে কবলস্থ করলেন তখন যে আন্দোলন, হট্টগোল, দলাদলি, চীৎকার প্রভৃতির সৃষ্টি হয়েছিল সংযুক্তা-পৃথ্বীরাজ সম্পর্কেও ঠিক ততটা হয়েছিল কিনা সন্দেহ। বলা বাহুল্য জিতেন্দ্রনাথের বাবা তাঁকে ত্যাজ্যপুত্র করলেন। পিতৃবিত্ত বঞ্চিত জিতেন্দ্রনাথ স্বকীয় পুরুষকার বলে কি করে' অকূল সমুদ্রে পাড়ি জমাতে পেরেছিলেন তা এ কাহিনীর অন্তর্ভুক্ত নয়। প্রসঙ্গতঃ একটি কথা শুধু বলা যেতে পারে। যে আলোক-প্রাপ্ত সমাজে স্থান পাবেন আশা করে' স্বয়ম্প্রভা বেণী দুলিয়েছিলেন এবং জিতু সরকার সমাজ ত্যাগ করেছিলেন সে আলোক-প্রাপ্ত সমাজে তাঁরা ঢুকতেই পারেন নি। কারণ প্রথম জীবনে সে সমাজে ঢোকবার চাবিই সংগ্রহ করতে পারেন নি তাঁরা। জিতু সরকার টাকা রোজগার করেছিলেন শেষ বয়সে। সুতরাং প্রায় সারাজীবন

হয়েছে। এবং তার ফলে যা হয়েছে তা মনস্তাত্ত্বিকদের মর্ম্মরোচক হলেও জিতু সরকারের পক্ষে হয়েছিল মর্ম্মান্তিক। অনীতা ও সুশোভনের পক্ষেও তা সুখকর হয় নি।

আর একটি ব্রাহ্ম দম্পতীও এই কাহিনীটিকে অলঙ্কৃত করেছেন। তাঁদেরও কিঞ্চিৎ পরিচয় আগে থাকতে জেনে রাখা ভাল। শ্রীযুক্ত দিগ্বিজয় সিংহরায় অভিজাতবংশীয় জমিদার। তাঁর পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সমবয়সী না হলেও সমসাময়িক ছিলেন। এখনকার শিক্ষিত সমাজে আধুনিক হতে হলে যেমন 'কমরেড্' হতে হয় তখনকার শিক্ষিত সমাজে তেমনি ব্রাহ্ম হতে হত। মদ খাওয়াটাও আধুনিকতার আর একটা লক্ষণ ছিল। দিগ্বিজয়ের পিতা জগদ্বিজয় নিজের ইয়ার-বক্শি মহলে ছিলেন অত্যাধুনিক। সুতরাং তিনি ব্রাহ্মও হয়েছিলেন, মদও খেতেন। তাঁর কীর্ত্তিকলাপ তাঁর বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল। তাঁর বন্ধু-বান্ধবেরা অনেকেই এখন গতাসু হয়েছেন, সে কীর্ত্তিকাহিনীও এখন অবলুপ্ত-প্রায়। তবু এখনও কিছু কিছু শোনা যায় মাঝে মাঝে। তিনি যেদিন বাগান বাড়ি করতেন সেদিন না কি—যাক্, সে সব কথা অবান্তর এ গল্পের পক্ষে। বাধ্য পুত্রের মত দিগ্বিজয় পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করবার চেষ্টা করেছিলেন কিছুদিন। কিন্তু পারলেন না। তিনি ছিলেন অন্য চরিত্রের লোক। হাল্লা হুল্লোড় বরদাস্তই করতে পারতেন না। কোলকাতা শহরের কোলাহলই অতিষ্ঠ করে' তুলল তাঁকে শেষ পর্য্যন্ত। বিশেষতঃ যখন অলিগলিতে ট্যাক্সির দৌরাত্ম্য সুরু হল তখন তিনি পত্নী সুরেশ্বরীকে নিয়ে সরে' পড়লেন দেহাতে নিজেদের জমিদারিতে। কোলকাতায় ক্বচিৎ আসতেন। খবরের কাগজের মারফত কোল-কাতার যে সব খবর পেতেন তাতে আসবার প্রবৃত্তিও আর হত না। সুরেশ্বরী দেবীও অভিজাত-বংশীয় আলোক-প্রাপ্ত মহিলা। তবে আলোকটা সেকেলে আলোক। হাব-ভাব-পোষাকে তখনকার দিনের ঠাকুর বাড়ির মেয়েরাই তাঁর আদর্শ ছিল। হঠাৎ দেখলে স্বর্ণলতা দেবী বলে' ভুল হত। এই নিঃসন্তান দম্পতী পরস্পরকে নিয়ে দেহাতে নিজেদের জমিদারিতে সুখেই থাকতেন।

এক-ঘেয়ে স্থখও বেশী দিন ভাল লাগে না। স্থরেশ্বরীর আগ্রহাতিশয্যে দিগ্বিজয়কে তাই বাইরের জগতের সঙ্গে যোগ-স্থাপন করতে হত মাঝে মাঝে। আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবকে নিমন্ত্রণ করতেন স্থযোগ পেলেই। দিগ্বিজয় মোটরকার পছন্দ করতেন না, কিন্তু স্থরেশ্বরীর জন্যে কিনতে হয়েছিল একটা। বাইরের সঙ্গে যোগাযোগ রাখবার জন্যে সেটা চড়ে শাল গায়ে দিয়ে বেরুতেনও তিনি মাঝে মাঝে। কিন্তু তা কদাচিৎ।

আর একটি অসাধারণ ব্যক্তির পরিচয়ও আগে থাকতে করা উচিত। স্বয়ম্প্রভা দেবীর দূর সম্পর্কের আত্মীয় সদারঙ্গবিহারীলালের নামটি শুধু নয় প্রকৃতিও অসাধারণ। বিবাহ করেন নি ভদ্রলোক। তিন কুলে কেউ নেইও। সামান্য কিছু জমিজমা আছে, তার থেকেই গ্রাসাচ্ছাদন চলে যায়। গ্রাসাচ্ছাদনের বেশী ইনি কামনাও করেন না কিছু। অত্যুৎসাহী আদর্শবাদী এই লোকটি পরোপকারকেই জীবনের ব্রত বলে' গ্রহণ করেছেন। বাড়িতে স্থবিরা পাঁচির মা এবং রাস্তায় ভাঙা একটি মোটর বাইক এঁর ভার বহন করে। অহোরাত্র ইনি পরোপকার করে' বেড়ান। কারণ-অকারণ স্থযোগ-দুর্যোগ ভাল-মন্দ উচ্চ-নীচ কোন কিছুরই তোয়াক্কা করেন না ইনি। সকলেই এঁর পরিচিত, সকলের সঙ্গেই আত্মীয়তা, সকলের উপকার করবার জন্য ইনি সর্ব্বদা প্রস্তুত। কোন বাছবিচার নেই। মাঝে মাঝে জটিলতার সৃষ্টি হয়। কিন্তু সদারঙ্গবিহারীলাল অকুতোভয় অদম্য ব্যক্তি, তাঁর গতি-রোধ করবার সাধ্য তাঁর নিজেরই নেই বোধ হয়, অন্যে পরে কা কথা।

(২)

স্থশোভনের যা স্বভাব, চা ঠাণ্ডা হচ্ছিল সেদিকে খেয়াল নেই, সদ্য-আগত ডাক নিয়েই ব্যস্ত হয়ে পড়ল সে। অনীতারও চিঠিও এসেছিল একখানা। মায়ের চিঠি। স্বয়ম্প্রভা দেবীর মেজাজে আর যা-ই থাক, রসোচ্ছলতা নেই। চিঠিতে তিনি যে ধরণের কাটা কাটা ভাষা ব্যবহার করেন তাতে কারও চিত্ত

প্রফুল্লিত হয় না। অনীতারও হচ্ছিল না। সুশোভন একখানা খামের চিঠি খুলে পড়ছিল, আর হাসছিল মুচকি মুচকি।

"কার চিঠি ওটা"

"দিগ্বিজয় সিংহরায়ের"

"সে আবার কে"

"রায় বাহাদুর দিগ্বিজয় সিংহরায়"

"সিংহরায়? বিয়ের সময় কে একজন সিংহরায় আমাকে ঝকমকে বেনারসী শাড়ি দিয়েছিল একখানা। তাঁরাই না কি?"

সুশোভন পড়তে পড়তে জবাব দিল—"হ্যাঁ, তাঁরাই"

"খুব বড় লোক, নয়?"

"হ্যাঁ, কিন্তু কি মুশকিল, ছি ছি—। ঠিক এই সময় মোটরটা বিগড়ে বসে' আছে"

"কেন, কি লিখেছেন"

"নিমন্ত্রণ করেছেন"

"হঠাৎ?"

"কি জানি। এই শোন না"

সুশোভন পড়তে লাগল।

কল্যাণীয়েষু,—

তোমার পিতার সহিত আমাদের এত আত্মীয়তা ছিল অথচ তোমার সহিত আমাদের কোন সম্পর্ক নাই ইহা বড়ই পরিতাপের বিষয়। তোমাকে সেই একবার ছেলেবেলায় দেখিয়াছিলাম। তোমার বিবাহে আমরা সস্ত্রীক যাইব মনস্থ করিয়াছিলাম, কিন্তু তোমার কাকীমাতার গ্রন্থি-বাত প্রবল হওয়াতে সে সঙ্কল্প ত্যাগ করিতে হইল। আমাদের মতো মফঃস্বলবাসী ব্যক্তিদের পক্ষে কলিকাতা যাওয়াই বিপদ। পথে অজস্র ভীড়, তাহার উপর গাড়ি ঘোড়া ট্রাম ট্যাক্সি চীৎকার গোলমালে খেহি হারাইয়া যায়। খেহি—Sic—"

"খেহি সিক্ মানে ?"

"মানে খেহিই লিখেছেন। ভদ্রলোকের ধারণা বোধ হয় খেই শব্দের শুর্দ্ধ হচ্ছে 'খেহি'। বেচারা! শোন তারপর—"

"তোমার বিবাহের পর তোমাকে নিমন্ত্রণ করিব ভাবিয়াছিলাম। কিন্তু এমন বর্ষা নামিল যে ফাঁক পাইলাম না। এখন শীত পড়িয়াছে, পথ ঘাট শুকাইয়াছে। শিকার করিবার জন্য দুই একজনকে আসিতে বলিয়াছি। তুমিও যদি বধূমাতাকে লইয়া আসিতে পার সুখী হইব। শুনিয়াছি বধূমাতা একজন আধুনিকা। যাঁহারা আসিতেছেন তাঁহারাও হাল-ফ্যাশানের, কোনও অসুবিধা হইবে না। আগামী বৃহস্পতিবার অর্থাৎ ১৮ই মাঘ শিকার পার্টির আয়োজন করিয়াছি। শুনিয়াছি তুমি একজন ভাল শিকারী। তোমার বাবাও খুব ভাল শিকার করিতেন। যদি আসিতে পার আমরা খুবই আনন্দিত হইব। আমার স্নেহাশীর্ব্বাদ লও। ইতি আশীর্ব্বাদক শ্রীদিগ্বিজয় সিংহরায়।"

অনীতা 'কমরেড্' হলেও মনে মনে রায়বাহাদুর জাতীয় লোকদের সম্বন্ধে তার কিঞ্চিৎ সম্ভ্রমই ছিল। মুখে সে যতই শ্রমিকদের দুঃখে বিগলিত হোক, বেনারসী শাড়িখানার ঝলকে সেদিন তার চোখ ঝলসে গিয়েছিল। যে রায়বাহাদুর সেই শাড়ি তাকে দিতে পারেন তাঁকে ক্যাপিটালিস্ট বলে' তাচ্ছিল্য করবার মতো মনের জোর তার নেই—মুখে যতই সে সাম্যবাদ নিয়ে আস্ফালন করুক।

"বেশ তো, চল না যাওয়া যাক্, কতদূর এখান থেকে"

"প্রায় দেড়শ' মাইল"

"হাসছ যে"

"খেহিটা ভুলতে পারছি না"

সুশোভন হো হো করে' হেসে উঠল।

"একে গ্রন্থি-বাত—তার উপর খেহি! যেতেই হবে সেখানে। কিন্তু গাড়ি যে গ্যারেজে, ব্যাটারা বলেছে একমাসের আগে হবে না। কি মুশকিল বল তো"

"মোটর নিয়ে যাবে! ট্রেণে যাওয়া যায় না ?"

"যায়। কিন্তু তার চেয়ে হেঁটে যাওয়া ভাল। একে প্যাসেঞ্জার গাড়ি, তার উপর চেঞ্জ আছে। অবশ্য ট্যাক্সি একটা নেওয়া যেতে পারে অনায়াসে"

"দেড়শ' মাইল ট্যাক্সি করে' যাবে!"

অনীতা বিস্ফারিত চক্ষে অবাক হয়ে চেয়ে রইল সুশোভনের দিকে। বলে কি লোকটা! সে ট্রামে বাসে ঝুলে ঝুলে শিক্ষয়িত্রীগিরি করে' কাটিয়েছে কিছুকাল আগে পর্য্যন্ত। এ ধরনের অমিতব্যয়িতা তার কল্পনাতীত।

"ট্রেণে ঢিকিস্ ঢিকিস্ করে' যাওয়ার চাইতে—"

"বেশ তাই যেও। চা-টা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে খেয়ে নাও আগে"

চেয়ার ঠেলে অনীতা উঠে দাঁড়াল। ট্যাক্সিতে ধাবমান সুশোভনের কিছুদিন আগেকার একটা চিত্র চকিতে ফুটে উঠল মানসপটে। লিলুয়ার একটা শ্রমিক সভায় যাচ্ছিল সবাই। সুশোভনের একপাশে ছিল কমরেড্ মণিকা, আর এক পাশে সে নিজে। সেদিন সুশোভনের সঙ্গে মণিকার প্রগলভ আলাপ—কমিউনিজম নিয়েই আলাপ—সর্ব্বাঙ্গে তার জ্বালা ধরিয়ে দিয়েছিল যেন। রাত্রে বাড়ি ফিরে এসে কেঁদেছিল সে।

ঠাণ্ডা চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে অনীতার দিকে আড়চোখে চেয়ে সুশোভন বললে—"তুমি যাবে না? দিগ্বিজয় নাম শুনে ভয় পেও না, শুনেছি লিক-লিকে রোগা লোকটা—"

অনীতা কোন উত্তর না দিয়ে আর এক পেয়ালা চা ঢালতে লাগল টি-পট থেকে। ভয় যে তার হয় নি তা নয়, কিন্তু তার কারণ দিগ্বিজয় নামটা নয়। অন্য আর এক কারণে এই রায়বাহাদুর জমিদারের নিমন্ত্রণ তাকে যুগপৎ প্রলুব্ধ ও ভীত করে' তুলেছিল। যাঁর কোলকাতা শহরে পদে পদে 'খেই' হারিয়ে যায় তাঁর চোখের সামনে সর্ব্বদা নিজেকে প্রকট রেখে সম্ভাব্য সমালোচনার খোরাক জোগানো একটু ভীতিকর তো বটেই। আধুনিক যুগের আপটুডেট 'কমরেড্' হলেও সমালোচনা সম্বন্ধে ঔদাসীন্য অর্জ্জন করতে পারে নি সে এখনও। অথচ যেতে লোভও হচ্ছিল বেশ। হঠাৎ তার মনে হল কিসের এত ভয়। যত

বড় লোকই হোক, অসঙ্কোচে গিয়ে দাঁড়াতে পারবে সে! শাড়ি সেমিজ সায়া ব্লাউস কি তার নেই। রূপও আছে যৎকিঞ্চিৎ। বুদ্ধিও। মা যদি শোনেন যে অত বড় একটা রায়বাহাদুর জমিদার নিমন্ত্রণ করে' নিয়ে গেছেন খুশিই হবেন।

"দু'জনেই যাই চল, বুঝলে—"

"বেশ চল, ছাড়বে না যখন। ট্রেণে যাব কিন্তু।"

"ওই অতগুলো চেঞ্জ করে'! খানিকটা বাসেও যেতে হয় শুনেছি—"

অনীতা কোন উত্তর না দিয়ে পাশের ঘরে চলে গেল।

সুশোভন বুঝলে ট্রেণেই যেতে হবে।

মাত্র তিন মাস বিয়ে হয়েছে তার। এর মধ্যেই 'প্রেমের নিগড়', 'প্রেমের ফাঁস', 'প্রেমের ফাঁদ' প্রভৃতি প্রচলিত বাক্যগুলির রূপক-বর্জ্জিত প্রকৃত অর্থ হৃদয়ঙ্গম করতে হচ্ছে তাকে বার বার। প্রেমে পড়ে' অনীতাকে বিয়ে করে' সে যে ভুল করেছে, একথা কারও কাছে স্বীকার করে নি সে—এমন কি নিজের কাছেও না। কিন্তু কেমন যেন প্রতিপদেই খটকা লাগছে। তার যা ভাল লাগে অনীতার ঠিক তাতেই যেন আপত্তি। বাধা-হীন স্বাধীনতা-চর্চ্চার সুযোগ আছে বলেই সে কমিউনিষ্ট, অনীতাও সেই জাতের লোক এই তার ধারণা ছিল। কিন্তু বিয়ের পর দেখা যাচ্ছে অনীতার ভাবগতিক ঘোরতর ইম্‌পিরিয়ালিষ্টিক গোছের! একাধিপত্য চায়! সুশোভনকে সর্ব্বপ্রকারে নিজের শাসনাধীন রাখাই তার একমাত্র লক্ষ্য। আর সব চেয়ে আশ্চর্য্যের বিষয় যে তার শাসনাধীন থাকতে মন্দ লাগে না! বিদ্রোহ করতে ইচ্ছে হয়, কিন্তু তা পুনরায় শাসিত হয়ে আনন্দলাভের জন্য। ভারী আশ্চর্য্য কাণ্ড! একদিন কিন্তু সত্যই দুঃখ হয়েছিল তার। যে অনীতার আর্টের প্রতি এত অনুরাগ, তার কাছে এ ব্যবহার মোটেই প্রত্যাশা করে নি সে।

সেদিন ধীরেনের সঙ্গে রাস্তায় দেখা হয়ে গিয়েছিল হঠাৎ। বিয়ের পর বন্ধুরা তাকে এক রকম ত্যাগ করেছে বললেই হয়। নাগালই পায় না। তবু

আনাচে-কানাচে ঘুরে বেড়ায় এখনও কেউ কেউ। নাগাল পেলেই ছোঁ মেরে ধরে নিয়ে যায়।

ধীরেন বললে—"তোর কাছেই যাচ্ছিলাম। বিশু আজ নগেনকে চা খাওয়াচ্ছে প্লাজাতে"

"সত্যি ?"

"তোকে নিয়ে যেতে বলেছে। চল"

সিনেমা-গগনের উদীয়মান জ্যোতিষ্কটিকে সামান্য একটু সঙ্গদান করে' অভিনন্দিত করা এমন কিছু নিন্দনীয় কাজ নয়। কিন্তু বাড়ি ফিরতে দেরি হয়ে গেল। ফিরেও জমল না।

"কোথা ছিলে এতক্ষণ ?"

সুশোভন সোচ্ছ্বাসে বর্ণনা করে গেল।

"নগেন আবার কে! যত সব বাজে লোকের সঙ্গে আড্ডা দিতে ভালও লাগে তোমার—"

"নগেন মানে নগেন্দ্রমোহিনী। শ্রমিক থিয়েটারে 'ঝি'য়ের পার্টে প্রথম নাম করলে যে, মনে নেই ?"

অনীতার মুখ অন্ধকার হয়ে গেল।

বাঁকা হাসি হেসে বললে, "তোমার যে নগেন্দ্রমোহিনীর সঙ্গে এত ভাব ছিল তাতো জানতুম না"

"কোন কালে ভাব ছিল না। আজই প্রথম আলাপ"

অনীতা স্মেলিং সল্টের শিশিটা বার দুই শুঁকে একটা অ্যাসপিরিনের বড়ি খেয়ে ফেললে।

"সন্ধ্যে থেকে মাথার যন্ত্রণায় মরে যাচ্ছি—"

সুশোভন এটা প্রত্যাশা করে নি। এই অনীতাই বিয়ের আগে এই নগেন্দ্রমোহিনীর সম্বন্ধে কি উচ্ছ্বাসই না প্রকাশ করেছিল! সেইদিন রাত্রেই প্রতিজ্ঞা করতে হল যে ওই জাতীয় স্ত্রীলোকের আর ছায়া মাড়াবে না সে।

প্রতিজ্ঞা করবার পর কেমন একটা অদ্ভুত ধরনের আনন্দও অনুভব করতে লাগল। আশ্চর্য্য! অনীতার মোহিনীশক্তি প্রভুত্বশক্তিসহযোগে খাদসংযুক্ত স্বর্ণের মতো আরও বেশী যেন মুগ্ধ করে।

সত্যিই পরস্পরকে ভালবেসেছিল তারা। অনেকেই অনীতাকে বিয়ে করবার জন্যে ক্ষেপেছিল। কিন্তু অনীতা এক সুশোভনকে ছাড়া আর কাউকে আমোল দেয় নি। সুশোভনকে সাধ্যসাধনাও করতে হয়নি বেশী। সুশোভনের প্রাগবিবাহ প্রণয়লীলাকে সংক্ষিপ্ত বললে কিছুই বলা হয় না। 'সংক্ষিপ্র' বললে তবু খানিকটা বোঝান যায়। স্বয়ম্প্রভা দেবীর অনিচ্ছা-ব্যূহ ভেদ করে' ঝড়ের বেগে অনীতাকে উড়িয়ে এনেছিল সুশোভন।

স্বয়ম্প্রভা সরকার তাঁর একমাত্র সন্তানটির জন্যে ঠিক কি জাতীয় রাজপুত্র যে কামনা করেছিলেন তা খুলে বলেন নি কাউকে কোনদিন। সুশোভন সোমও পাত্র হিসেবে নিন্দনীয় নয়। প্রথম প্রথম তার দামী মোটরখানা দেখে বিচলিতও হয়েছিলেন তিনি। কিন্তু কিছুদিন মেলামেশার পর তিনি বুঝলেন সুশোভন 'আজকালকার' ছেলে। চটে গেলেন। কিন্তু অনীতাও আজকালকার মেয়ে এবং ওই মায়েরই মেয়ে। সে-ও জিদ ধরে' বসল সুশোভন ছাড়া আর কাউকে বিয়ে করবে না। অনীতার বাবার যদিও বিশেষ কিছু কর্তৃত্ব ছিল না মেয়ের উপর, কিন্তু যতটুকু ছিল তাও তিনি ব্যবহার করলেন না। অনীতারই জয় হল শেষ পর্য্যন্ত। জিতুবাবু মনে মনে খুশিই হলেন। যদিও বাইরে আনন্দ প্রকাশ করবার মতো বুকের পাটা ছিল না ভদ্রলোকের। তাছাড়া জীবনে নানারকম ঘা খেয়ে এইটুকু তিনি সার বুঝেছিলেন যে অদৃষ্ট ছাড়া পথ নেই। যা হবার তা হবেই। পাঁচজনের কাছে খামখা আনন্দ বা উত্তেজনা প্রকাশ করলে অকারণ জটিলতা সৃষ্টি করা হয় মাত্র। কোন লাভ হয় না।

বাপ যখন ত্যাজ্যপুত্র করেছিলেন তখন গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য তাঁকে বাল্যবন্ধু ইয়াসিন মিঞার শরণাপন্ন হতে হয়েছিল। বড়বাজারের এক গলির মধ্যে ইয়াসিন মিঞার লোহা-লক্কড়ের ছোট একখানা দোকান ছিল। তাতেই ক্রমশঃ

নিজেকে সংশ্লিষ্ট করেছিলেন জিতুবাবু। ইয়াসিন বললে একদিন, কি হবে পাঁচ-জায়গায় ঘোরাঘুরি করে'। তিনি আর আপত্তি করলেন না। বিনা আয়াসে যা পাওয়া যাচ্ছে তাই ভাল এ বাজারে। কোন রকম অসন্তোষ প্রকাশ করলেন না, নীরবে লেগে রইলেন কেবল। স্বয়ম্প্রভা দেবী অবশ্য তাঁকে আলোক-প্রাপ্ত সমাজের উপযোগী ভদ্রতর একটা চাকরি নেওয়ার জন্য উৎসাহিত করতে কসুর করেন নি। এই প্রসঙ্গে যে সব বাক্যাবলী তিনি ব্যবহার করেছিলেন তা সাধারণ-ধৈর্য্য-বিশিষ্ট যে কোন লোককে পাগল করে' দিত। কিন্তু জিতুবাবুর কিচ্ছু হয় নি। তিনি অদৃষ্টকে মেনে নিয়ে লোহা-লক্কড়ের দোকানে লেগে রইলেন। আত্মরক্ষার দু'টি উপায় তিনি আবিষ্কার করেছিলেন। সাধ্যপক্ষে বাড়ি আসতেন না এবং যখন আসতেন পারতপক্ষে স্বয়ম্প্রভার কোনও কথার প্রত্যুত্তর দিতেন না। শেষ বয়সে অদৃষ্ট হঠাৎ সুপ্রসন্ন হল তাঁর উপর। যুদ্ধ বাধল। লোহার দাম হুহু করে' বাড়তে লাগল। স্বয়ম্প্রভা তো ওৎ পেতে ছিলেনই অনীতাও দেখতে দেখতে নৃত্য-গীত-পটীয়সী 'কমরেড্' হয়ে পড়ল। আলোক-প্রাপ্ত সমাজের যে দ্বার এতদিন রুদ্ধ ছিল তা হঠাৎ যেন খুলে গেল খানিকটা। তারপর এল সুশোভন। জিতুবাবু ইয়াসিন মিঞাকে যেমন মেনে নিয়েছিলেন সুশোভনকেও তেমনি মেনে নিলেন। সুশোভনের ডিগ্রি, চেহারা, মোটর, কোলকাতায় বাড়ি প্রভৃতি দেখে স্বয়ম্প্রভাও পুলকিত হয়েছিলেন প্রথমটা। যে সভ্য সমাজে তিনি মিশতে চেয়েছিলেন কিন্তু মেশবার সুযোগ পান নি, সুশোভনের হাতে সেই কাম্যলোকে ঢোকবার চাবিকাঠিটি দেখে বড় আশায় আশান্বিত হয়েছিলেন তিনি! সুশোভনের মোটর আছে, পয়সা আছে, অনেক বড় বড় পরিবারের সঙ্গে হৃদ্যতাও আছে। ইচ্ছে করলে অনায়াসে পারত সে। কিন্তু কিছুতেই নিয়ে গেল না তাঁকে। সাজিয়ে গুছিয়ে অনীতাকে নিয়ে গেল বারবার, তাঁকে একবার ডাকলেও না। আর না ডাকলে নিজে সেধে তার মোটরে যাবেনই বা কেন তিনি। সুশোভনের না নিয়ে যাবার সঙ্গত কারণ ছিল একটা অবশ্য। সুশোভনের পরিচিত মহলের কেউ প্রত্যাশাই

করতে পারে নি যে সুশোভনের মতো ছেলে জিতু সরকারের মেয়েকে বিয়ে করে বসবে। অনীতা যে স্ত্রী-রত্ন তাতে কারও সন্দেহ ছিল না কিন্তু একালে দুষ্কুলাদপি তা আহরণ করাটা ভব্য সমাজে সুরুচিসঙ্গত নয়—অন্ততঃ সুশোভন যে সমাজে ঘোরা-ফেরা করে সে সমাজে নয়—সকলেরই মানসিক নাসা ঈষৎ কুঞ্চিত হয়েছিল। সুশোভন তাই নানা কৌশলে স্বয়ম্প্রভা দেবীকে এড়িয়ে চলত। স্বয়ম্প্রভাও বেশ বুঝতে পারলেন সুশোভন তাঁকে এড়িয়ে চলছে। ক্রমশঃ তাঁর সমস্ত মনটা বিতৃষ্ণায় ভরে' উঠল। এতদিন যা তিনি সন্দেহ করতেন ক্রমশঃ তা বিশ্বাস করতে লাগলেন। স্বার্থপর ছোটলোক চরিত্রহীন সব! ওদের পার্টি, সিনেমা, সভা সমিতি সম্মিলন সব যথেচ্ছাচারের নামান্তর মাত্র। কোন ভদ্রমহিলাকে তাই নিয়ে যেতে সাহস করে না ওরা। কোনও ভদ্রমহিলার যাওয়াও উচিত নয় ওদের সঙ্গে। জিতুবাবুকে এসব কথা বললেনও একদিন তিনি সালঙ্কারে। জিতুবাবু টুঁ শব্দটি করলেন না। চুপ করে' রইলেন। জিতুবাবুকে কিন্তু সুশোভন নিমন্ত্রণ করে' নিয়ে গিয়েছিল একদিন। নিমন্ত্রণ সেরে রাত্রে ফিরে এসে জিতুবাবু এমন অস্বাভাবিক রকম উচ্ছ্বাস প্রকাশ করতে লাগলেন যে স্বয়ম্প্রভার কেমন যেন সন্দেহ হল। খানিকক্ষণ ভ্রূকুঞ্চিত করে' চেয়ে রইলেন। লোহার দালাল এই নিরীহ ভদ্রলোকটিকে এত উচ্ছ্বসিত হতে তিনি ইতিপূর্ব্বে দেখেছেন বলে মনে পড়ল না। মদটদ খাইয়ে দেয় নি তো! সব পারে ওরা। সুশোভনের উপর রাগ আরও বেড়ে গেল। কিন্তু কন্যারও অনুরাগ বাড়ছিল এবং সে 'কমরেড্', সুতরাং বিয়ে আটকাল না।

(৩)

গার্ড হুইস্‌ল দিয়ে সবুজ নিশান নাড়তে লাগলেন।

"উঠে এসে বস না। কি যে তোমাদের প্ল্যাটফর্মে দাড়িয়ে থাকা ফ্যাশান। ট্রেণ ছাড়ছে যে—"

প্রথম শ্রেণীর কামরা থেকে গলা বাড়িয়ে অনীতা বললে।

"এই যে যাচ্ছি"

বেশ কায়দা করে' সিগারেটটি ধরিয়ে দেশলাই কাঠিটি নেড়ে নেড়ে নিবিয়ে এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে হাসিমুখে চেয়ে রইল স্থশোভন। কমরেড্ অনীতার এই ভীতু-ভাবটা বেশ উপভোগ করছিল সে। আর একবার হুইস্‌ল পড়ল। গার্ডের দিকে চাইতে গিয়েই কিন্তু অঘটন ঘটে গেল।

"আরে—আরে—আহা—এ কি—"

ছুটল স্থশোভন সেদিকে।

নিঃশব্দ গতিতে ট্রেণটি ছেড়ে দিলে। প্রথমটা মনে হল ছাড়েই নি। অনীতা বুঝতেই পারে নি প্রথম। কিন্তু বুঝতে পারামাত্রই দাঁড়িয়ে উঠল এবং জানলা দিয়ে গলা বাড়িয়ে অঙ্গভঙ্গীসহকারে যা করতে লাগল তাতে একটি ফল হল শুধু, প্ল্যাটফর্মে দণ্ডায়মান স্থূলকায় একটি মাড়োয়ারি বণিকের প্রাণে রস-সঞ্চার হল! গদগদ হয়ে হলদে রঙের একঝুড়ি দাঁত বার করে' হেসেই ফেললে সে। অনীতা ভীড়ের মধ্যে আবছাভাবে স্থশোভনকে দেখতে পেলে একবার। একটি মেয়ের দু'হাত ধরে' দাঁড়িয়ে আছে সে। মনে হল মেয়েটির রং ধপধপে ফরসা।...

ট্রেণের গতি-বেগ বাড়ল।

মেয়েটিকে তুলেই স্থশোভন পুলকিত হয়ে উঠল। কমরেড্ সান্ত্বনা! খুব মাথামাথি ছিল কিছুদিন আগে।

"আরে, সান্ত্বনা যে! হঠাৎ পড়ে' গেলে কি করে—"

"কলার খোলা বোধহয়। অনেক ধন্যবাদ"

সান্ত্বনা ঘাড় ফিরিয়ে দেখতে লাগল পিছন দিকের শাড়িটা নষ্ট হয়েছে কিনা।

"না, শাড়ির কিছু হয় নি, ঠিক আছে। আরে, মাথায় সিঁদুর দেখছি যে—বিয়ে হল কবে"

"মাস তিনেক"—মুচকি হেসে জবাব দিলে সান্ত্বনা।

"কোথায়"

"বরিশালে। তবে উনি এখন কোলকাতাতেই আছেন"

"কি করেন"

"প্রফেসারি। আপনারও বিয়ে হয়েছে শুনেছি। আপনার স্ত্রী কোথায় এখন"

"এস না, আলাপ করিয়ে দিই—ওই যে বসে আছে—"

ঘাড় ফিরিয়েই সুশোভন থেমে গেল এবং অপসৃয়মান গার্ড গাড়িটার দিকে চেয়ে হাঁ করে' দাঁড়িয়ে রইল।

"যাচ্চলে"

"কি হল।"

"আমার স্ত্রী ওই গাড়িতে চলে গেল"

"আপনারা এই গাড়িতেই যাচ্ছিলেন নাকি"

"হ্যাঁ"

"কোথায়"

"দিগ্বিজয়বাবুর নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে"

"ওমা আমিও যে সেইখানেই যাচ্ছি—আমাদেরও নিমন্ত্রণ আছে—"

"একমাত্র ট্রেণটিতো চলে গেল। এখন উপায়"

পরস্পর পরস্পরের দিকে চেয়ে রইল।

"মাসীমা ভাববেন খুব"—ক্ষুণ্নকণ্ঠে সান্ত্বনা বললে।

"তোমার মাসীমা সেখানে আছেন নাকি"

"দিগ্বিজয়বাবুর স্ত্রীকে আমি মাসীমা বলি। মায়ের খুব বন্ধু উনি। আমার ছেলেবেলাটা তো ওঁর কাছেই কেটেছে"

বাক্স বিছানা সুটকেস ট্রাঙ্ক কুঁজো পুঁটুলি এবং একটি কুকুর বাচ্ছা বহন করে' কুলীর সারি এসে দাঁড়াল।

"সব তোমার জিনিস নাকি"

"হ্যাঁ, কি করি বলুন তো এখন। কালকের আগে তো আর ট্রেণ নেই"

"না। সত্যিই কি করা যায়। অনীতা আবার তাদের কাউকে চেনে না। আজ রাত্রেই আমার যেমন করে হোক পৌছতে পারলে ভাল হত"

"কিন্তু তা আর কি করে সম্ভব বলুন"

"একেবারে যে অসম্ভব তা নয়, থাম—একটা আইডিয়া মাথায় এসেছে। এখন কটা বেজেছে? একটা—একটা ট্যাক্সি নিলে হয়। ভাল একটা ট্যাক্সিতে যেতে কত সময় লাগবে। শার্দ্দূল সিংয়ের সঙ্গে আমার খুব জানা-শোনা আছে। ফোন করলে ভাল গাড়ি দেবে, অনেক গাড়ি তার। কতক্ষণ লাগবে দেড়শো মাইল যেতে—দেড়শো ডিভাইডেড্ বাই টয়েনটি—সাত ঘণ্টা, আট ঘণ্টাই ধর —নটার মধ্যে নির্ঘাত পৌছে যেতে পারি। তুমি কি এখন বাসায় ফিরবে? অধ্যাপক মশায় কোথায় এখন"

"তিনি এখানে নেই। তিনি থাকলে তো ভাবনাই ছিল না, একসঙ্গে যেতাম। তিনি এক কংগ্রেস সভায় গেছেন রংপুরে। আজ রাত্রে ফেরার কথা। ফিরে তিনি যাবেন সেখানে। তাই অন্ততঃ কথা আছে। আমরা একসঙ্গেই যেতাম, কিন্তু তিনি আসবেন কি না ঠিক নেই, কেউ না গেলে মাসীমা দুঃখিত হবেন খুব, তাই আমি একাই যাচ্ছিলাম, উনি যদি আসেন পরে আসবেন"

"আমি ট্যাক্সি করেই যাচ্ছি। তুমি যদি যেতে চাও আসতে পার আমার সঙ্গে। আপত্তি আছে?"

"না, আপত্তি আর কি"

সুশোভন সহসা উৎসাহিত হয়ে উঠল খুব। কুলীদের দিকে ফিরে বললে —"এই—মাইজিকো চীজ একঠো ট্যাক্সিমে চড়াও—জলদি—"

তারপর সান্ত্বনার দিকে ফিরে বললে—"আগে আমার বাসায় ফেরা যাক চল। ষ্টেশন থেকেই শার্দ্দূল সিংকে ফোন করে দিচ্ছি আমার বাড়িতে একখানা

ভাল ট্যাক্সি পাঠাতে। বাসায় গিয়ে চা খেতে খেতেই গাড়ি এসে পড়বে, তারপরই—বাস্।”

মুচকি হেসে সান্ত্বনা বললে, “আপনার স্ত্রী কি—”

“আমার স্ত্রীর সম্ভাব্য মানসিক প্রতিক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করবার সময় নয় এখন সান্ত্বনা। যদি কিছু হয় দেখা যাবে পরে তখন—”

“না আমি জিগ্যেস করছিলাম, আপনার স্ত্রী কি সোজা দিগ্বিজয়বাবুর ওখানেই যাবেন”

“সোজা দিগ্বিজয়বাবুর ওখানে যাওয়া যায় না কি। তবে শেষ পর্য্যন্ত সেইখানেই যাব বলে বেরিয়েছিলাম তো। টাইম টেবেলখানাও তার কাছে। আমার বাক্স বিছানা সবই তার সঙ্গে। চটছে খুব নিশ্চয়”

“আজ রাত্রেই পৌঁছাচ্ছেন তো! রাগ আর কতক্ষণ থাকবে”

“তা বটে। অনীতা লোক ভাল—আলাপ হলে দেখবে—ওয়াণ্ডারফুল”

সান্ত্বনা কিছু না বলে’ মুচকি হাসলে একটু।

সুশোভনের বাসায় যে চাকরানিটি ছিল সে শত্রুপক্ষীয় লোক। স্বয়ম্প্রভা দেবীরও চাকরানি ছিল সে কিছুদিন আগে। জামাইবাবু লোকটি যে ডুবে ডুবে জল খান এ সন্দেহ স্বয়ম্প্রভাই তার মনে সঞ্চারিত করেছিলেন তখন। নিজের মুখে তাকে বলেন নি কিছু যদিও, কিন্তু স্বামীর সঙ্গে এ নিয়ে যে আলাপ করতেন তিনি, তা নিম্নকণ্ঠে করতেন না। সুতরাং চাকরানিটি সুশোভনের সম্বন্ধে যে ধারণা করেছিল তা স্বায়ম্প্রভিক। সেই সুশোভন যখন হঠাৎ একটি রূপসী যুবতীকে নিয়ে ট্যাক্সি চড়ে’ এসে হাজির হল তখন সন্দেহের আর অবকাশ রইল না। সান্ত্বনার দিকে দু’চারবার যে দৃষ্টি সে নিক্ষেপ করলে তার অর্থ পরিষ্কার। সান্ত্বনা অবশ্য বেশী বিচলিত হল না! এ জাতীয় দৃষ্টির সম্মুখীন সে বহুবার হয়েছে জীবনে। ফিটফাট রূপসী মেয়েদের ভাগ্যই এই—বিশেষতঃ তার যদি দামী গয়না শাড়ি থাকে এবং সে যদি একটু পুরুষ-ঘেঁসা হয়। বিপদেও পড়তে হয় বেচারাদের। সমালোচনা তারা অগ্রাহ্য করতে

পারে, কিন্তু বিপদকে এড়াতে পারে না সব সময়ে। সান্ত্বনাকে বিপদেই পড়তে হয়েছিল একবার। জনৈক লেখকের প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে নিছক সাহিত্য-প্রীতি-বশতঃই সে উক্ত বিবাহিত ভদ্রলোকের সঙ্গে কিঞ্চিৎ ঘনিষ্ঠতা করেছিল। সমাজহিতৈষীদের টনক নড়ে উঠল অমনি। ওঠাটাই স্বাভাবিক। প্রথমতঃ সে সুন্দরী, দ্বিতীয়তঃ শিক্ষিতা, তৃতীয়তঃ কমরেড্, চতুর্থতঃ কাউকে কেয়ার করে না, পঞ্চমতঃ এক নাইট স্কুলে পড়াবার ছুতোয় রোজ সন্ধ্যেবেলা বেরিয়ে যায়, ফেরে অনেক রাত্রে, ষষ্ঠতঃ ওই লেখক ভদ্রলোকের সঙ্গে মাখামাখি করে' তার পারিবারিক অশান্তি সৃষ্টি করেছে। তুমুল তুফান উঠল। সান্ত্বনা কিন্তু গ্রাহ্য করলে না কিছু। সমস্ত সমালোচনা তুচ্ছ করে' নিবিষ্ট চিত্তে লেগে রইল সে তার নাইট স্কুলে। যুবকদের মধ্যে জনকয়েক ভক্তও জুটে গেল তার এজন্যে। সে কিন্তু কাউকে আমোল দিলে না। দুর্ভেদ্য গাম্ভীর্য্যের অন্তরালে আত্মগোপন করে' সে তার নাইট স্কুলেই লেগে রইল। দু' একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু ছাড়া আর কারও সঙ্গে মিশত না। কথা পর্য্যন্ত বলত না কারও সঙ্গে। লেখকটির সংস্রব আগেই ত্যাগ করেছিল। এই সময়েই সুশোভনের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয় তার। বিরাট কোলকাতা শহর! সে-ও সুশোভনের খবর রাখেনি, সুশোভনও তার খবর পায় নি। সান্ত্বনার আপন বলতে ছিলেন এক বিধবা মা। কিন্তু তিনি থেকেও ছিলেন না। বুড়ো বয়সে টি. বি. হয়ে ধরমপুর স্যানাটোরিয়ম্ আশ্রয় করেছিলেন তিনি। সান্ত্বনা থাকত মামার বাড়িতে। কিন্তু মামা যখন দেখলেন ভাগ্নী 'কমরেড্' হয়ে উঠেছে, তখন স্পষ্ট ভাষায় নিজের সেকেলে অভিমত ব্যক্ত করলেন তিনি একদিন। ফলে, সান্ত্বনা গিয়ে এক হোটেলে উঠল। হোটেলেই হয়তো থাকতে হত তাকে, যদি না সুরেশ্বরী দেবী সে সময় কোলকাতায় এসে পড়তেন। সুরেশ্বরী দেবী এসেই সান্ত্বনার কলঙ্ককাহিনীর সালঙ্কার বর্ণনা শুনলেন। শুনেই চটে গেলেন তিনি। সান্ত্বনার মা তাঁর বাল্যসখী, সান্ত্বনাকে এতটুকু বয়স থেকে দেখেছেন তিনি, সান্ত্বনার সম্বন্ধে এসব কথা বিশ্বাসযোগ্যই মনে হল না তাঁর! সান্ত্বনা ওরকম কিছু করতেই পারে না। বাজে

কথা সব। সান্ত্বনাকে নিয়ে চলে গেলেন তিনি দেহাতে নিজেদের জমিদারিতে। সান্ত্বনা ফিরে এল অবশ্য কিছুদিন পরে। তখন ঝড়টা থেমে গেছে। তার কিছুদিন পরেই অধ্যাপক ব্রজেশ্বরের সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেল। বিয়ের পর মুচুকুন্দ-কুণ্ডলেশ্বরীতে আর যায় নি সে। মুচুকুন্দ-কুণ্ডলেশ্বরীই দিগ্বিজয়বাবুর জমিদারি। সুরেশ্বরী ব্রজেশ্বরকে দেখেন নি, তাই নিমন্ত্রণ করেছিলেন যাবার জন্যে।

শার্দ্দূল সিংহ প্রেরিত বিরাট ট্যাক্সিখানা সুশোভনের বাড়ির সামনে এসে হর্ন দিয়ে দাঁড়াল। ড্রাইভারটি বাঙালী কিন্তু বলিষ্ঠ। কাইজারি ছাঁদের গোঁফ। হর্ন শুনে চাকরানিটি কপাট খুলে মুখ বাড়াল।

"সুশোভনবাবুর কি এই বাড়ি"

"হ্যাঁ"

"খবর দাও যে শার্দ্দূল সিং গাড়ি পাঠিয়েছেন"

"ট্যাক্সি করে' কোথা যাবে আবার এখন। এই তো এল"

"অনেক দূর যেতে হবে, তুমি খবর দাও না"

"তোমাকে ডাকলে কে"

"ফোনে খবর দিয়েছিলেন বাবু"

"ফোনে ? কোথা থেকে ?"

"আরে খবর দাও না তুমি"

মুক্ত দ্বারপথে সান্ত্বনার জিনিসপত্র ড্রাইভারের নয়নগোচর হল।

"ওই সব মাল যাবে নাকি"

"ওঁরা যদি যান, মালও যাবে বই কি"

ড্রাইভার নেমে এসে মালগুলি পর্য্যবেক্ষণ করতে লাগল।

"শ্বশুরবাড়ি যাচ্ছেন নাকি"

"কোথা যাবেন তা কেমন করে' বলব"

চাকরানি খবর দিতে উপরে চলে গেল। ড্রাইভার জিনিসপত্র তুলতে লাগল ট্যাক্সিতে। একটু পরেই স্বশোভন নেবে এল সান্ত্বনাকে নিয়ে। ড্রাইভারের দিকে চেয়ে স্বশোভন বললে, "তোমাকে চিনি বলে' তো মনে হচ্ছে না। শার্দ্দূল সিংয়ের প্রায় সব ড্রাইভারের সঙ্গেই আলাপ আছে আমার"

"আমি নতুন বাহাল হয়েছি সার"

"তোমার নাম কি"

"গণেশ সরকার"

"জোর হাঁকাতে পারবে তো"

"পারব না কেন সার। কিন্তু ধরুন যদি কোন অ্যাকৃসিডেণ্ট হয়ে যায় তার খেসারত দেবে কে"

"সে ঝুঁকি আমার"

গণেশ গোঁফজোড়া একবার চুমরে নিয়ে বললে "বেশ! পৌছবার পর গরীবকে ভুলে যাবেন না যেন সার"

"শার্দ্দূল সিংহের পুরোনো কোন ড্রাইভার এলে একথা ব'লতো না। তারা চেনে আমাকে"

"বেশ"

স্বশোভন সান্ত্বনা উঠে বসল।

গণেশ আর একবার গোঁফ চুমরে গাড়িতে স্টার্ট দিলে।

(৪)

বিবেকানুমোদিত সৎকর্ম্ম স্বসম্পন্ন করবার পর যে জাতীয় স্বনিদ্রা হওয়া উচিত সদারঙ্গবিহারীলালের নিদ্রা তার চেয়েও গাঢ়তর এবং দীর্ঘতরই হয়েছিল, কারণ বেচারাকে পরিশ্রমও করতে হয়েছিল যথেষ্ট। সমস্ত দিন মোটরবাইকে টো টো করে' ঘুরে বেড়ানো কম ক্লান্তিজনক নয়। কিন্তু কোন কাজ ক্লান্তিজনক বলেই তার থেকে নিবৃত্ত হবেন এমন লোক সদারঙ্গবিহারীলাল নন। উমেশ চৌবে যেই

তাঁকে এসে ধরলেন যে তাঁর হয়ে ভোট ক্যানভাস করতে হবে—অমনি রাজি হয়ে গেলেন তিনি।

...পাঁচির মায়ের ঠেলাঠেলিতে নিদ্রাভঙ্গ হল।

"জনার্দ্দনবাবু ডাকছেন যে তোমাকে। কতক্ষণ আর ঘুমুবে, রোদে কাঠ ফাটছে যে চারিদিকে—"

"ও! রোদ উঠে গেছে নাকি! অ্যাঁ—ছি—ছি—"

অপ্রস্তুতমুখে সদারঙ্গবিহারীলাল বিছানায় উঠে বসলেন এবং বালিশের তলা থেকে চশমাটি বার করে' পরিধান করলেন।

"বড্ড বেলা হয়ে গেছে—অ্যাঁ—ছি—ছি—"

হাসিমুখে পাঁচির মায়ের দিকে চাইলেন একবার। চশমার পুরু লেন্স থেকে আলো ঠিকরে পড়ল।

"জনার্দ্দনবাবু বাইরে অনেকক্ষণ থেকে ডাকাডাকি করছেন"

"জনার্দ্দনবাবু? অনেকক্ষণ থেকে? ও—"

তাড়াতাড়ি চটিটা পরে' সদারঙ্গবিহারীলাল বাইরে যেতে উদ্যত হলেন চোখে মুখে জল না দিয়েই।

"কালকের মতো না খেয়ে বেরিও নি যেন। চায়ের জল চড়িয়েছি, বেশী দেরি কোরো নি যেন বাইরে"

"চায়ের জল? ও—হ্যাঁ—না—আসছি এখুনি"

বেরিয়ে গেলেন সদারঙ্গবিহারীলাল।

"জনার্দ্দনবাবু যে! বাঃ—চা খাবেন তো নিশ্চয়ই—সিঙাড়া—"

হঠাৎ থেমে যেতে হল তাঁকে। জনার্দ্দনের মুখ ভ্রূকুটি-কুটিল, চক্ষু অগ্নিবর্ষী। অদম্য সদারঙ্গবিহারীলালও দমে' গেলেন ক্ষণকালের জন্য। এ কি হল!

"উমেশলালের জন্যে ক্যানভাস করে' বেড়িয়েছেন শুনলাম"

প্রত্যেকটি কথা ছর্‌রার মতো নির্গত হল জনার্দ্দনের মুখ থেকে।

"হ্যাঁ—"

"লজ্জা করে না আপনার"

"লজ্জা ? লজ্জা করবার কিছু আছে নাকি, জানি না তো, ভদ্রলোক ধরলেন এসে"

"উমেশলাল ভদ্রলোক ? ভদ্রলোক কি পরের খাসি চুরি করে' খায় ?"

"খাসি ? না—না—কি যে বলেন আপনি—বি.এ বি.এল.—গড্ !"

"গ্রামের প্রত্যেকটি খাসি ওর পেটে গেছে। তাছাড়া মিউনিসিপাল কাউন্সিলার হবার কি যোগ্যতা দেখলেন ওর। যার নিজের বিষয় দেনার দায়ে বিকিয়ে যাচ্ছে সে মিউনিসিপালিটি সামলাবে !"

জনার্দ্দন চক্ষু দু'টি অত্যন্ত ছোট করে' নির্নিমেষে চেয়ে রইলেন তাঁর চোখের দিকে। সদারঙ্গবিহারীলাল অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন। চোখের দৃষ্টি অন্যদিকে ফিরিয়ে নিলেন, কানে কড়ে' আঙুল ঢুকিয়ে সজোরে কানটা চুলকুলেন, কাসলেন একবার। কিন্তু নাঃ—কোনও লাভ হল না। জনার্দ্দন নির্নিমেষ।

"ভদ্রলোক ধরলেন এসে সকালবেলা—"

"ওই হনুমানটা যদি ধরে এসে আপনাকে, ক্যানভাস করবেন তার হয়ে ?

নিকটবর্ত্তী বৃক্ষে উপবিষ্ট হনুমানটিকে দেখিয়ে জনার্দ্দন পুনরায় প্রশ্ন করলেন। সদারঙ্গবিহারীলাল আড়চোখে হনুমানটির দিকে চাইলেন একবার।

"বলুন—"

"হনুমানের কথা বলছেন ? আরে নাঃ—কি যে বলেন—ছি ছি—"

নিজের ক্ষুদ্রায়িত চক্ষুকে স্বাভাবিক আকৃতি দান করে' জনার্দ্দন বললেন—"শুনুন, যা করবার তা তো করেইছেন। এখন ভুল সংশোধন করতে হবে।

"তার মানে ? ভুল—মানে—"

"মানে প্রত্যেক লোককে গিয়ে আবার বলে' আসতে হবে যে আমি আসল খবর জানতাম না—তাই উমেশ চৌবের হয়ে ক্যানভাস করেছি। এখন তাঁর কীর্ত্তিকলাপ শোনবার পর তোমাদের আবার মানা করতে এসেছি তাকে একটি ভোট দিও না কেউ। সমস্ত ভোট বৈজুপ্রসাদকে দেবে"

"বৈজুপ্রসাদ ? ঘিয়ে সাপের চর্ব্বি অনর্গল মেশায় শুনেছি লোকটা"

"তা মেশাক। কিন্তু ওকে যদি তোমরা কমিশনার করে' দিতে পার ও একটা গার্লস্কুল করে' দেবে বলেছে নিজের খরচে। উমেশ চৌবে পারবে ?"

"দেবে বলেছে নাকি"

সদারঙ্গবিহারীলালের মুখ প্রদীপ্ত হয়ে উঠল।

"না বললে অমনি আপনার কাছে এসেছি"

"এত বড় ভাল কাজ যদি একটা হয় তাহলে আমি—"

"করতেই হবে"

"বেশ"

সদারঙ্গবিহারীলাল চিরকালই স্ত্রী-শিক্ষা-বিস্তারের পক্ষপাতী।

আলো ঠিকরে পড়ল তাঁর চশমার লেন্স থেকে।

(৫)

ফাৎনাফিরিঙ্গিপুরের নাম বাইরের লোকের কাছে অজ্ঞাত হলেও স্থানটি নগণ্য নয়। অন্য কোন কারণে না হোক, গোঁসাইজির হরিমটর নিরামিষ হিন্দু পান্থ-নিবাসের জন্যই ও অঞ্চলে ফাৎনাফিরিঙ্গিপুর বিখ্যাত। হোটেলের নামের সঙ্গে হরিমটর শব্দটি যে অশোভন সে জ্ঞান যে গোঁসাইজির নেই তা নয়। কিন্তু হরিহর গোস্বামী ধর্ম্মবুদ্ধি-সম্পন্ন লোক। প্রিয়বন্ধু মটর বৈরাগীর টাকা নিয়ে তিনি হোটেলটি স্থরু করেছিলেন। তখন হোটেলটির নাম ছিল 'নিরামিষ হিন্দু পান্থনিবাস'। এখন মটর বৈরাগী গত হয়েছেন। বিশেষ করে' সেইজন্যেই বন্ধুর স্মৃতি-রক্ষাকল্পে হোটেলটির নূতন নামকরণ করেছেন তিনি। নিজের নামটিও অবশ্য সঙ্গে জুড়ে দিয়েছেন। টাকা মটর বৈরাগীর, কিন্তু পান্থনিবাসের আসল স্রষ্টা তো তিনিই। হরিমটর শব্দটির এই ইতিহাস। নামটি লিখে প্রকাণ্ড একটি সাইনবোর্ড টাঙিয়ে দিয়েছেন সামনেই। কারও দৃষ্টি এড়িয়ে যাবার উপায় নেই।

অর্থ উপার্জ্জন করবার জন্য গোঁসাইজি হোটেল খুলে অন্ন-বিক্রয় করেছেন এ কথা যাঁরা মনে করেন তাঁরা শ্রীযুক্ত হরিহর গোস্বামীকে ঠিক চেনেন না। অতিশয় নিষ্ঠাবান আস্তিক্য-বুদ্ধি-সম্পন্ন শ্লীলমনা নিষ্কাম ব্যক্তি ইনি। গীতার উপদেশ অনুসারেই কর্ম্মযোগ অবলম্বন করেছেন কেবল। পয়সার চেয়ে নীতির দিকেই এঁর লক্ষ্য বেশী। মাছ মাংস ডিম পেঁয়াজ হোটেলের ত্রিসীমানায় ঢুকতে পায় না। হোটেলে রাত্রিবাস করবার জন্যে যদি কেউ আসে, তাহলে পয়সা ফেললেই রাত্রিবাস করবার অধিকার লাভ করে না সে। তার চালচলন কথাবার্ত্তায় গোস্বামী মশায় ঘুণাক্ষরে যদি সন্দেহজনক কিছু আবিষ্কার করেন, তাহলে আর স্থান হয় না তার হোটেলে। রাত্রিবাস করবার জন্যে দ্বিতলে দু'খানি ঘর আছে। ত্রিতলের ঘরটিতে গোঁসাইজি নিজে শয়ন করেন। বর্ত্তমানে দ্বিতলের দু'খানি ঘরই অধিকৃত। একটিতে শয্যাশায়ী বৈষ্ণবী রোগিণী আছেন একজন। ইনি গোস্বামী মহাশয়ের গুরুভগ্নী। গুরুভ্রাতার সঙ্গে দেখা করতে এসে গুরুতর অসুখে পড়ে গেছেন। দ্বিতীয় ঘরখানিতে আছেন এক শিক্ষক-দম্পতি। ফাৎনাফিরিঙ্গিপুরের মাইনর স্কুলের হেডমাষ্টার যোগজীবন বণিকও সজ্জন ব্যক্তি। উপর্য্যুপরি দু'টি ঘটনা যুগপৎ ঘটায় ভদ্রলোক বিপন্ন হয়েছেন সম্প্রতি। তাঁর বাসাটি ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের। তার বার্ষিক জীর্ণ-সংস্কার সুরু হয়েছে। একটি ঘরের খাপরা নামানো হয়েছে, দ্বিতীয় ঘরটি তিনি ব্যবহার করছিলেন। দিন দুই আগে তাঁর মা হঠাৎ এসে পড়েছেন কোনও খবর না দিয়ে। যোগজীবনবাবু সজ্জন লোক। মায়ের সঙ্গে এক ঘরে স-স্ত্রীক শুতে পারেন না তিনি। এই শীতে বারান্দায় শোওয়াও অসম্ভব। মুস্কিলে পড়েছিলেন। গোস্বামী মশায় আশ্রয় দিয়েছেন তাঁকে দ্বিতীয় ঘরটিতে।

রাস্তার ধারে হোটেলটির একটি আপিসও আছে। গোঁসাইজি খুঁত রাখেন নি কিছু। আপিসে আপিসোচিত সমস্ত কিছুই বর্ত্তমান। পাঁজি, ক্যালেণ্ডার, হিসাবের খাতা, লেখবার সরঞ্জাম, লাল-কালো দুরকম কালি এবং কলম, হাতবাক্স একটি, টেবিল চেয়ার কোনও জিনিসের ত্রুটি ছিল না। কিছুদিন থেকে গোঁসাইজি নূতন একটি খাতা খুলেছেন। অ্যাডমিশন রেজিস্টার। ইংরেজি নাম দেবার ইচ্ছা

ছিল না। কেবল 'অ্যাডমিশন' শব্দটির লোভে ম্লেচ্ছ ভাষার শরণাপন্ন হতে হল তাঁকে। 'অ্যাডমিশন' শব্দটি দ্ব্যর্থক। 'স্বীকৃতি' এবং 'প্রবেশ' দুই অর্থ ই করা যায় এর। এক-ঢিলে-দু-পাখী-মারা-যায় এ রকম বাংলা বা সংস্কৃত শব্দ গোঁসাইজির জানা ছিল না। তাঁর হোটেলের উক্ত ঘর দু'টিতে প্রবেশকারীকে স্বহস্তে নিজের পূর্ণ পরিচয় এই খাতায় লিখতে হয়। কিছুদিন পূর্ব্বে গোঁসাইজি এক নিরীহ-আকৃতির ছোকরাকে আশ্রয় দিয়ে বিপদে পড়েছিলেন। ছোকরা চলে' যাবার সঙ্গে সঙ্গেই পুলিশ এসে হাজির। ছোকরা নাকি এক ফেরারি অ্যানার্কিষ্ট! ভাগ্যে দারোগার সঙ্গে জানাশোনা ছিল তাই রক্ষা পেয়ে গেলেন। তারপর থেকেই গোঁসাইজি সতর্কতা অবলম্বন করেছেন।

গোঁসাইজি আপিসের জানলা কাচ-দেওয়া। কিন্তু ধূলায় ধোঁয়ায় কাচের স্বচ্ছতা নষ্ট হয়ে গেছে। রাস্তার দিকের ঘর বলে' সেটিকে মনোহর করবার চেষ্টা করেছিলেন গোঁসাইজি যথাসাধ্য। কাচ দিয়েছিলেন, চৌকাটের ফ্রেমে সবুজ রঙও লাগিয়েছিলেন। কিন্তু দেশের জলহাওয়া এমন বদ যে সবুজ ক্রমশঃ ধূসর হয়ে অবশেষে এমন একটি রঙে পরিণত হয়েছে যা বর্ণনা করা কঠিন। শুধু তাই নয়, জানলার কপাটগুলো এমন 'যাম্' হয়ে গেছে যে খোলেই না সহজে। খোলবার বিশেষ চেষ্টাও করেন না গোঁসাইজি। যা ধূলো, বন্ধ থাকাই ভাল।

...সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। শীতের কনকনে বাতাস উঠেছে একটা। নিজের আপিস ঘরে মঙ্কিক্যাপ পরে' হ্যারিকেন লণ্ঠন জেলে গোঁসাইজি তন্ময়চিত্তে দৈনিক হিসাব লিখছিলেন। জানলাটি বন্ধ। সুতরাং সুশোভন-সান্ত্বনার আগমন বা কথোপকথন টের পেলেন না তিনি।

"যাক্"—

সুশোভন বলে উঠল। আর পারছিল না বেচারা। দুহাতে সান্ত্বনার দুটো ভারী স্যুটকেশ। অপেক্ষাকৃত ছোটটি রাস্তায় নামিয়ে রেখে সে উর্দ্ধ-মুখে সাইন-বোর্ডটা পড়তে লাগল।

"বলি নি তোমাকে, কাছে-পিঠে ঠিক একটা হোটেল আছে? এই দেখ—

হরিমটর নিরামিষ হিন্দু পান্থনিবাস। স্বত্বাধিকারী বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীহরিহর গোস্বামী—"

"এর নাম কাছে-পিঠে? অন্ততঃ চার মাইল হেঁটেছি"

"যাক্ এসে তো পড়া গেছে! নিরামিষ হিন্দু-হোটেল—তা হোক্"

"হরিমটর কথাটার তাৎপর্য্য কি"

"কি জানি"

"যাই হোক্ চলুন, ঢোকা তো যাক্"

সান্ত্বনা এগিয়ে গিয়ে কপাটটা ঠেলতেই খুলে গেল সেটা। সুশোভন রাস্তা থেকে স্যুটকেশ দুটো তুলে নিলে আবার। বেশ ভারী! কি এনেছে সান্ত্বনা! আপিসের জানলার অস্বচ্ছ কাচের ভিতর দিয়ে যৎসামান্য আলো প্রবেশ করছিল বাইরের ঘরটিতে।

"যাক্ শেষ পর্য্যন্ত—" কথা অসমাপ্ত রেখে সুশোভন স্যুটকেশ দু'টি মেজেতে নামিয়ে ফেললে।

"উফ্—সর্ব্বাঙ্গ ধূলোয় ভরে' গেছে একেবারে। কথা বলছ না যে"

"বড় ক্লান্ত লাগছে"

"ক্ষিদে পায় নি?"

"খুব পেয়েছে। আপনার?"

"আমার! ফাৎনাফিরিঙ্গিপুরের এই হোটেলের খবর না জানলে তোমার ঝুনুকেই গিলে ফেলতাম রাস্তায় আমি। যাক্, আর কোন চিন্তা নেই। এসে যখন পড়া গেছে, তখন রাত্রের মতন আহার বাসস্থান জুটে যাবেই যা হোক্ করে'। সকাল নাগাদ গণেশ এসে পড়বে—কি বল—অ্যাঁ—"

চেষ্টা সত্ত্বেও সুশোভনের কণ্ঠস্বরে আশার সুর ঠিক বাজল না যেন। চার মাইল দু'দুটো ভারী স্যুটকেশ বয়ে কেমন যেন দমে' গিয়েছিল বেচারা। উঁচু-নীচু মেঠো রাস্তা, সূচীভেদ্য অন্ধকার, তার উপর কনকনে পূবে হাওয়া। সান্ত্বনা বেচারাও বেশ কাবু হয়ে পড়েছিল। যে সপ্রতিভতা তার চোখে মুখে সর্ব্বদা দেদীপ্যমান

থাকে তা নিবে গিয়েছিল যেন। যাবারই কথা। শখ করে' মেঠো রাস্তায় হেঁটে বেড়ানো এক, আর হঠাৎ পথের মাঝখানে মোটর বিগড়ে হাঁটতে বাধ্য হওয়া—আকাশপাতাল তফাত যে। আর এ কি যে সে মাঠ। তেপান্তর ছেলেমানুষ এর কাছে। সুশোভন প্রথমটা দমে নি। "এতে আর কি হয়েছে, মোটরে অমন হয়েই থাকে, এক্ষুণি ঠিক হয়ে যাবে সব" গোছের একটা ভাব দেখিয়ে হালকা হাসি হেসে হাঁটতে সুরু করেছিল সে। কিন্তু ক্রমেই গম্ভীর হয়ে পড়তে লাগল। বেশ ভারী স্যুটকেশ দুটো। সান্ত্বনা ঝুনুকে বুকে করে' নিয়েছিল।

খানিকক্ষণ হেঁটে সে বলল—"চলুন, ওই মোটরেই ফেরা যাক্। অন্ধকারে কোথা যাচ্ছেন"।

সুশোভন বললে, "শুনলে না, ফাৎনাফিরিঙ্গিপুরে গোঁসাইজির ভাল হোটেল আছে। রাত্রে মাঠের মাঝখানে থাকা ঠিক নয়"

হোটেল যে আছে হরিমটর নিরামিষ পান্থনিবাসে প্রবেশ করবার পর তা আর অস্বীকার করা যায় না, কিন্তু সেজন্য সুশোভনকে ধন্যবাদ দেওয়ার প্রবৃত্তি হল না সান্ত্বনার।

তরকারি রান্নার গন্ধ ভেসে আসছিল একটা। কলের তেলের দুর্গন্ধ! নিশ্চয় গোয়াল কিম্বা আস্তাবলও আছে কাছে কোথাও। তেলে গোবরের গন্ধ ছাড়বে কি করে'। সান্ত্বনা বসে' পড়ল একটা স্যুটকেশের উপর।

"দাঁড়িয়ে আছেন কেন, যাহোক্ একটা ঠিক করে' ফেলুন এবার। চারিটি খেয়ে শুতে পারলে বাঁচি"

"যা বলেছ"

সুশোভন এগিয়ে গিয়ে একটু ঝুঁকে জানলার কাচের ভিতর দিয়ে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে।

"কিছু দেখতে পাচ্ছেন"

"কালো মতন কি যেন একটা"

"ডাকুন"

বাঁ হাতটি মুখের উপর রেখে ছোট্ট একটি হাই তুললে সান্ত্বনা। সুশোভন বার দুই ডেকে কোন সাড়া না পেয়ে ধাক্কা দিলে জানলায় শেষে।

"কে—"

বেরিয়ে এলেন গোঁসাইজি।

"আপনিই কি গোঁসাইজি—"

মস্কি-ক্যাম্প দেখে সুশোভনের সন্দেহ হচ্ছিল একটু।

"হ্যাঁ"

"নমস্কার। রাত্রের জন্য আমরা দু'জন—"

"ক্ষমা করবেন। আপনাদের সৎকার করতে অক্ষম আমি আপাতত"

গোঁসাইজি যথাসাধ্য শুদ্ধ কথা ব্যবহার করে' থাকেন।

"অক্ষম! কেন?"

"স্থানাভাব। আমার দু'টি ঘরেই অতিথি রয়েছেন"

"একটু জায়গা হবে না কোথাও?"

"না"

গোঁসাইজি গম্ভীরভাবে মাথা নাড়লেন।

"কচু খেলে যা—" অর্দ্ধস্বগত উক্তিটা বেরিয়ে পড়ল সুশোভনের মুখ থেকে।

"খাবার কিছু পাওয়া যাবে অন্ততঃ আশা করি"

গোঁসাইজি কটমট দৃষ্টিতে সুশোভনের দিকে চেয়েছিলেন।

"ওই ধরনের অশ্লীল কথা ফের যদি উচ্চারণ করেন, তাহলে খাবারও পাওয়া যাবে না"

"মাপ করবেন, আপনাকে শুনিয়ে কথাটা বলি নি—মানে—"

"ভগবান্ কিন্তু শুনেছেন"

"কি করে' জানলেন আপনি?"

মেজাজ আর ঠিক রাখতে পারছিল না সুশোভন।

গোঁসাইজি সান্ত্বনার দিকে ফিরে বলিলেন—"ভদ্রলোকের মুখ থেকে আমি এ রকম কুৎসিত ভাষা প্রত্যাশা করি নি"

"খুব অন্যায় হয়েছে ওঁর। খাবার কি পাওয়া যাবে"—সান্ত্বনা জবাব দিলে।

গোঁসাইজি স্থশোভনের দিকে চেয়ে বললেন, "কিছুই তাঁর দৃষ্টি এড়ায় না। খাতায় ঠিক ঠিক টোকা থাকে সব"

"কিছু খাবার কি পাওয়া যাবে"

পুনরায় বললে সান্ত্বনা।

"দেখি। সাধারণতঃ বাড়তি খাবার থাকে না আমার। আর তাছাড়া আর একটি কথা শুনে রাখুন গোড়াতেই। হোটেল আমার, মনোমত লোক ছাড়া ঢুকতে দিই না আমি কাউকে এখানে"

স্থশোভন বলে ফেললে—"তবু এখানে স্থানাভাব! আশ্চর্য্য কাণ্ড!"

গোঁসাইজির ভ্রূ কুঞ্চিত হল। সান্ত্বনারও হল।

"বড় ক্লান্ত আমরা, ক্ষিদেও পেয়েছে, কিছু খাবার যদি থাকে……শোবার জায়গা কোথায় যে আবার জোগাড় হবে এতরাত্রে"

একটু কাতর কণ্ঠেই বললে সান্ত্বনা।

"এখানে টেলিফোন করবার ব্যবস্থা আছে কোন"—স্থশোভন জিগ্যেস করলে।

"না"

"কাছাকাছি কোথা থেকে টেলিফোন করা সম্ভব"

"কোথাও থেকে নয়। হ্যাঁ হতে পারে—পাঁচ মাইল দূরে একটা পোষ্টাপিস আছে, সেখান থেকে হতে পারে"

"পাঁচ মাইল! রামচন্দ্র!"—বলেই সামলে নিলে স্থশোভন।

"রামচন্দ্র বলে আমার চেনা শোনা লোক আছে একজন, তাকে টেলিফোন করব ভাবছিলাম। কিন্তু তার তো কোনও উপায় নেই আপাতত। গাড়িটাড়ি পাওয়া যেতে পারে?"

"না"

"এখানে ঘোড়ারগাড়ি গরুরগাড়ি কিছু পাওয়া যায় না?"

"না"

"লে্ হালুয়া—ও মানে—হালুয়াগঞ্জে যাবার কোনও উপায় নেই তাহলে"

গোঁসাইজির জ্রর কুঞ্চন ভয়াবহ হয়ে উঠছিল ক্রমশঃ।

"হালুয়াগঞ্জ বলে' কোন স্থানের নাম তো শুনি নি"

"আপনি শোনেন নি হয় তো, কিন্তু আছে"

সান্ত্বনা অধীর হয়ে উঠল।

"ওসব বাজে কথা থাক এখন। আমাদের খাবার ব্যবস্থাটা করে' দিন দয়া করে"

গোঁসাইজি সান্ত্বনার দিকে ফিরে চাইলেন। ছোঁড়াটা যদিও অসভ্য, মেয়েটি কিন্তু শ্রীমতী। দ্বারের দিকে চেয়ে উচ্চকণ্ঠে ডাক দিলেন—"ফদ্‌কা—"

তারপর সান্ত্বনার দিকে ফিরে বললেন—"আপনার মুখ চেয়েই আমি খাবারের ব্যবস্থা করে দিচ্ছি" তারপর সুশোভনের দিকে চেয়ে বললেন—"আপনার স্বামী যদি একা আসতেন, খেতে পেতেন না আমার হোটেলে। যেন তেন প্রকারেণ পয়সা লোটাই আমার জীবনের উদ্দেশ্য নয়"

"শুনুন এই মহিলাটি"—সংশোধন করতে গিয়ে সুশোভন থেমে গেল। সান্ত্বনা চোখের ইঙ্গিতে বারণ করলে তাকে।

"এই মহিলাটি কি—"

"এই মহিলাটি আজ রাত্রে আর হাঁটতে পারবেন না। রাত্রের মতো কোনও ব্যবস্থা কি—"

দ্বার খুলে গোঁসাইজির ভৃত্য ফদকা প্রবেশ করল। তাকে দেখবামাত্রই গোঁসাইজি তেড়ে গেলেন।

"'হলে' আলো জ্বালিস নি কেন এখনও? বাঁদর কোথাকার"

"আলো জ্বালছিলাম। আন্‌ছি—"

ফদকা বেরিয়ে যাচ্ছিল গোঁসাইজি বললেন—"আর শোন, ঠাকুরকে বলে দে আরও দু'জন খাবে। চাল ডাল বার করে' নিয়ে যাক্—তরকারি যা আছে ওতেই হবে—"

ফদকা চলে গেল। স্ত্রীকে 'মহিলা' বলে উল্লেখ করাতে গোঁসাইজি আরও চটেছিলেন। সুশোভনের দিকে ফিরে বললেন "মহিলাটির কষ্ট হবে বুঝতে পারছি। কিন্তু কি করি বলুন, যাঁরা রয়েছেন তাঁদের তো তাড়িয়ে দিতে পারি না"

ফদকা একটা ভাঙা হ্যারিকেন নিয়ে প্রবেশ করল।

গোঁসাইজিও আর অধিক বাঙ্‌নিষ্পত্তি না ক'রে বেরিয়ে গেলেন।

(৬)

কলাইয়ের ডাল এবং চচ্চড়ি সহযোগে খানিকটা কড়কড়ে ভাত গলাধঃকরণ করার পর সান্ত্বনার প্রসন্নতা অনেকটা ফিরে এল যেন। সুশোভনের দিকে ফিরে সে বললে—"হয়তো রূঢ় ব্যবহার করেছি ক্ষমা করবেন। সত্যিই বড্ড ক্ষিদে পেয়েছিল। কিছু মনে করেন নি তো"

"এতে মনে করাকরির কি আছে। ক্ষিদে কি আমারই কম পেয়েছিল? তুমি আবার রূঢ় ব্যবহার করলে কখন, মনে পড়ছে না তো! বরং বেফাঁস কথাবার্ত্তা বলে আমিই সব মাটি করেছিলাম আর একটু হলে"

"বিশেষ করে' আপনি যখন বলতে যাচ্ছিলেন যে মহিলাটি আমার স্ত্রী নয়। উনি যদি ঘুণাক্ষরে জানতে পারতেন যে আমরা স্বামী-স্ত্রী নই, তাহলে আস্তাবলে শোয়ার অনুমতিও বোধ হয় দিতেন না"

"যাক্ সে কথা। এখন শোয়ার কি করা যায় বলতো। তোমার পরামর্শ অনুসারে আমরা এখন যদি চলে যাই এখান থেকে, গণেশ আমাদের খুঁজে পাবে না সকালে—"

"কিন্তু পোষ্টাপিস থেকে আমরা ফোন করতে পারতাম মাসীমাকে"

"মাসীমার ফোন আছে ?"

"আছে। মাসীমার অসুখের সময় অনেক খরচ করে ফোন কানেকশন্ করা হয়েছিল"

"কিন্তু এখন পাঁচ মাইল হাঁটতে পারবে তুমি? পুঁইশাকের চচ্চড়ির সাংঘাতিক ক্ষমতা দেখছি"

চারটি ভাত পেটে পড়ার পর সান্ত্বনার স্ফূর্তি সত্যিই ফিরে এসেছিল যেন। সত্যিই তার মনে হচ্ছিল এত দমে' যাবার কি হেতু ঘটেছে। 'আউটিং' করতে গেলে এমন মটোর-অ্যাক্সিডেণ্ট তো হয়েই থাকে। তারা জলেও পড়ে নি। না হয় দু'জন গল্প করেই কাটিয়ে দেবে রাতটা। না হয় হাঁটবে। চিন্তার কি আছে……। হঠাৎ সুশোভনের দিকে ফিরে সে বললে—"সত্যি ভারী স্বার্থপর আমি। আমার চিন্তার কোন কারণই নেই, কিন্তু আপনার আছে"

"কি"

"আপনার স্ত্রী"

সুশোভন গম্ভীরভাবে বললে—"সত্যি, ভয়ানক চিন্তা হচ্ছে"

বলেই হেসে ফেললে।

"এখন হাসছেন, কিন্তু আজ রাত্রে পৌঁছবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে নিজেই তো ট্যাক্সি করলেন—তা নাহলে কাল ট্রেণে এলেই চলত"

"বড় বিপজ্জনক প্রসঙ্গ আরম্ভ করেছ। চুপ চুপ, ঠাকুর আসছে বোধ হয়"

মৈথিল ঠাকুরটি আরও চারটি করে' ভাত এবং আর একটু তরকারি দিয়ে গেল।

সান্ত্বনা হেসে বললে, "ভয় নেই, আমি সাক্ষী দেব যে আপনি মহদুদ্দেশ্যেই ট্যাক্সি নিয়েছিলেন"

"এ আলোচনা থাক্ এখন। যদি শুনতে পেয়ে যায় তাহলে—"

দু'জনে নীরবে খেতে লাগল। অনীতার কথা উঠে পড়াতে সুশোভন একটু দমে গিয়েছিল। সান্ত্বনা সহাস্যদৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে বললে "আচ্ছা সত্যি করে' বলুন তো, বিবাহিত জীবনটি কেমন লাগছে"

গোঁফের প্রান্ত বাঁ হাত দিয়ে পাকাতে পাকাতে সুশোভন বললে "অনেকটা যেন ধৌতি গোছের"

"ধৌতি? সে আবার কি!"

"বিশুদ্ধীকরণ"

"মানে?"

"মানে বিশুদ্ধ হওয়া। অর্থাৎ বিয়ের আগে যে সব জিনিষ মস্ত বড় বলে' মনে হয়, বিয়ের পর দিব্যদৃষ্টি লাভ করে' দেখা যায় যে সমস্তই বাজে। বিবাহ করবার পর মানুষ খাঁটি হয়, খাঁটি চেনে। বিয়ের আগে যা সোনা ছিল বিয়ের পর দেখা যায় সমস্তই ভ্রম—তা তামাও নয়, পাঁক—সেরেফ খাদ! কেমন কবিত্বপূর্ণ হল না জবাবটা?"

মৃদু হেসে সান্ত্বনা বললে—"খুব"

"অনীতার মনন শক্তি (চিৎশক্তিও বলতে পার) আমার চেয়ে বেশী। এখন আমাকে যা করতে হচ্ছে, বিয়ের আগে যদি জানতাম যে তা করতে হবে—তাহলে বিয়েই করতাম না বোধ হয়। কিন্তু ওর মধ্যে একটু মজা আছে; এখন যা করছি তা যে বাধ্য হয়ে করছি তা-ও নয়, তা করতে ইচ্ছেও হচ্ছে! ধরতে পারলে কথাটা"

"খুব পেরেছি। যে বিয়ে করেছে সেই পারবে"

"বিয়ের আগে যা ভাল লাগত তাই করতাম, এখন যা করি তাই ভাল লাগে"

"আপনার স্ত্রীরও লাগে?"

"লাগা উচিত। অনীতার ভাবগতিক ঠিক বোঝা যায় না যদিও। তোমার কিন্তু যায়। তোমাকে দেখলেই মনে হয় যে তুমি সুখী। তোমার চোখে মুখে সে কথা লেখা রয়েছে"

"বহু ধন্যবাদ—"

ঠাট্টার স্বরে বললেও অকৃত্রিম আনন্দে সান্ত্বনার মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল।

"অনীতাও সুখী হয়েছে আশা করি"—একটু ইতস্ততঃ করে' বলেই লজ্জিত হয়ে পড়ল যেন সুশোভন।

সান্ত্বনা হেসে বলল—"সুখী না হবার কোন কারণ তো নেই—"

"চুপ চুপ, পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে। মৈথিল আসছে"

"খট্টা লিবেন ?"

"নিশ্চয় লিব। চারটি ভাতও আন"

"আমার আর ভাত চাই না—" সান্ত্বনা বললে।

বড়ির টক দিয়ে সুশোভন আর এক প্রস্থ সুরু করতে যাচ্ছিল, সান্ত্বনা হঠাৎ সচকিত হয়ে উঠল।

"শুনতে পাচ্ছেন ?"

"হ্যা। ঘোড়ার গাড়ি"

"যান, থামান ওটাকে"

"এখানেই থামবে হয়তো"

"আর 'হয়তো'র দরকার নেই—যান যেমন করে' পারেন থামান ওটাকে"

"বেশ"

উঠতে হল সুশোভনকে। দ্বার পর্য্যন্ত গিয়ে বললে—"কিন্তু এঁটো হাতে একটা ঘোড়ার গাড়ির পিছনে পিছনে দৌড়নোটা কি একটু—"

"যান যান শিগগির যান—চলে গেল। না, থামল বোধ হয়"

"বাঁচা গেল ! ভগবান আছেন"

"ও কি, আবার বসলেন যে এসে"

"অম্বলটুকু শেষ করে নি"

"ছি, ছি, কি আপনি !"

অম্বল শেষ করে' সুশোভন বেরিয়ে গেল। মিনিট পাঁচেক পরে ফিরে এসে বললে—"ভগবান আছেন সত্যিই"

"ঠিক করে' ফেললেন গাড়িটা ?"

"তার আর দরকার হবে না। আর একটু অম্বল আনতে বলি বরং। বেড়ে হয়েছে টকটা"

"কি হল বলুন না"

"ওপরের একটা ঘর খালি হয়ে যাচ্ছে এক্ষুণি"

"কি করে ?"

"ওপরে কে একজন হেডমাস্টার আছেন, তাঁর মায়ের ভয়ানক হাঁপানি উঠেছে। তাঁকে নিতেই এসেছে গাড়ি"

"হেডমাস্টার এখানে ছিলেন ?"

"হ্যাঁ, স-স্ত্রীক"

"কি রকম ?"

"কি রকম আবার! স-স্ত্রীক ছিলেন, চলে যাচ্ছেন। এই খবরটুকুই যথেষ্ট আনন্দজনক আপাতত, আর অধিক জানবার প্রয়োজন কি ? অম্বলটা ফেলে রাখছ কেন, খাও, ভাল হয়েছে"

অম্বলের দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে' সান্ত্বনা বললে—"কিন্তু তাতে আমাদের কি সুবিধে হল"

"সুবিধে হল না ? তিন মিনিটের মধ্যে একটা ঘর খালি হয়ে যাচ্ছে এক্ষুণি"

"কিন্তু মাত্র একটা ঘর খালি হলে কি সুবিধে হবে তাতে"

ব্যাপারটা এতক্ষণে স্পষ্ট হল সুশোভনের কাছে।

"ও, আচ্ছা বেশ, আমার ঘর চাই না, আমি বাইরে কাটিয়ে দেব কোথাও রাতটা। এই গুরু-ভোজনের পর স্যুটকেস হাতে ঝুলিয়ে যে পাঁচ মাইল হাঁটতে হল না, তাই যথেষ্ট আমার পক্ষে"

মৃদু হেসে সান্ত্বনা বললে, "আমার স্যুটকেস দুটো বয়ে আনতে আপনার

খুবই কষ্ট হয়েছে বুঝতে পারছি, কিন্তু কি করি বলুন। অত গয়না কাপড় মোটরে ফেলে রেখে আসাটা কি ঠিক হত"

"কিছুমাত্র কষ্ট হয় নি আমার। তোমার কষ্টের কথাই ভাবছি। তোমার একটা শোবার ব্যবস্থা হয়ে গেল বাঁচলুম"

"বাইরে আপনার অসুবিধে হবে খুব"

"কিছুমাত্র না। এরা চলে গেলে গোঁসাইজির সঙ্গে দেখা করে সব ঠিক করে ফেলছি দেখ না"

বলেই সুশোভন থেমে গেল। পরস্পরের দৃষ্টিবিনিময় হয়ে গেল একটা।

"গোঁসাইজির সঙ্গে কিন্তু সাবধানে কথাবার্ত্তা কইতে হবে"

"নিশ্চয়, উনি যদি কোনক্রমে টের পেয়ে যান যে আমরা স্বামী-স্ত্রী নই, তাহলে—"

"তাহলে আর এখানে স্থান হবে না রাত্রে"

"উপায় ?"

খানিকক্ষণ ভেবে সুশোভন বললে—"ভাই বোন বলে' পরিচয় দিলে ক্ষতি কি—"

"গোড়ায় ওঁকে সে কথা তো বলা হয় নি, উনি ধারণা করে' নিয়েছেন যে আমরা স্বামী-স্ত্রী। এখন যদি আবার—"

"বেশ দেখা যাক্, কি হয়"

"না না, ঠিক করে' ভেবে দেখুন। আমরা যদি স্বামী-স্ত্রী হই, আপনি বাইরে শোবেন কি ওজুহাতে"

"বেশ, ওজুহাত যদি না খাড়া করতে পারা যায় এক ঘরেই শোয়া যাবে। কি হয়েছে তাতে। তোমার আপত্তি না থাকলেই হল। কিম্বা তোমার যদি আপত্তি থাকে, গোঁসাইজির সামনে আমরা দু'জনে ঘরটায় একসঙ্গে ঢুকব—গোঁসাইজি আমাদের সমস্ত রাত পাহারা দেবেন না নিশ্চয়ই—তার পর উনি গিয়ে শুলেই আমি বেরিয়ে আসব। তার পর তুমি শুয়ে পোড়ো—আমি বারান্দায় থাকব"

"তার পর সকালে ?"

"সকালে আবার কি। ভোরে তোমাকে উঠিয়ে দু'জনে একসঙ্গে নেবে আসব। তার পরই তো গণেশ এসে পড়বে"

সান্ত্বনা চুপ করে' রইল। বিয়ের আগে সেই লেখক ভদ্রলোকের সঙ্গে মিছিমিছি তার নাম জড়িয়ে সবাই যে কলঙ্ক রটিয়েছিল তার গ্লানিকর স্মৃতি আজও তার মন থেকে মোছে নি। আবার না কিছু হয়। হঠাৎ সে মন-স্থির করে' ফেললে—"বেশ তাই হবে। এ ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই যখন। কিন্তু একথা গল্পচ্ছলেও কাউকে বলবেন না যেন কখনও"

"পাগল নাকি !"

শিক্ষক-দম্পতির ট্রাঙ্ক, স্যুটকেস, বিছানা প্রভৃতি নামতে লাগল উপর থেকে। তাঁরাও নামলেন এবং অযথা বিলম্ব না করে' চলে গেলেন। তাঁদের বিদায় দেবার জন্য গোঁসাইজিও নির্গত হলেন নিজের ঘর থেকে। তাঁরা চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে আবার গিয়ে ঢুকলেন অবশ্য।

সুশোভন সান্ত্বনাকে বললে "এবার যাও, বুঝলে, গোঁসাইজিকে একটু চোমরাও গিয়ে"

"আপনি যাবেন না ?"

"আমার চেয়ে তুমি গেলে বেশী কাজ হবে।"

একটু মুচকি হেসে সান্ত্বনা বেরিয়ে গেল।

মঙ্কি-ক্যাপটি খুলে ফেলে গোঁসাইজি তাঁর আপিস ঘরের চেয়ারে বসে' ক্যালেণ্ডারে অঙ্কিত ওঁ-বিজড়িত রাধাকৃষ্ণের যুগল-মূর্ত্তিকে প্রণাম করছিলেন। প্রতিদিন শয়নের পূর্ব্বে তিনি এই পুণ্য কাজটি করে থাকেন। প্রণামান্তে মুখ তুলে দেখতে পেলেন সান্ত্বনা শ্রদ্ধা-গদগদ মুখে তাঁর দিকে চেয়ে আছে।

"কি চমৎকার যে খেলাম আপনার এখানে। এমন চমৎকার রান্না অনেক দিন খাই নি"

"গোড়াতেই তো বলেছি, পয়সা রোজকার করবার জন্যে আমি হোটেল খুলি নি"

স্নেহভরে সান্ত্বনার মুখের দিকে চাইলেন তিনি।

"আপনাদের ওপরের একটা ঘর খালি হয়ে গেল নাকি এখুনি"

"হ্যাঁ, ইচ্ছে করেন তো নিতে পারেন ঘরখানা"

এত সহজে হয়ে যাবে সান্ত্বনা আশা করে নি।

গোঁসাইজি সান্ত্বনার মুখের দিকে চেয়েই ছিলেন। বেশ একটা লক্ষ্মী-শ্রী আছে মেয়েটির, অথচ পড়েছে একটা অসভ্যের হাতে। অদৃষ্ট!

সহসা প্রশ্ন করলেন—"বিয়ে কতদিন হয়েছে"

"তিনমাস"

"ও। আচ্ছা, বেশ ওপরের ঘরটা নিন আপনারা। আমি ফদকাকে বলে' দিচ্ছি—"

ঘর থেকে বেরিয়েই 'হল' ঘরে সুশোভনকে দেখতে পেলেন। ভ্রূ কুঞ্চিত করে' একটা অগ্নিদৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন তার দিকে। তারপর বললেন "অ্যাডমিশন খাতায় আপনাদের পরিচয় লিখে দিতে হবে"

অত্যন্ত সপ্রতিভভাবে সুশোভন বলল "বেশ তো, দেব, চলুন"

"ভিতরে আসতে পারি"

বাইরে থেকে অপরিচিত কার কণ্ঠস্বর শোনা গেল। বেশ পরুষ কণ্ঠস্বর। দ্বার খুলতেই সদারঙ্গবিহারীলাল প্রবেশ করলেন।

"আশা করি বিরক্ত করলাম না। একটু মোবিল হবে কি আপনাদের কাছে"

সদারঙ্গবিহারীলালের আপাদমস্তক ধূলোয় পরিপূর্ণ। কিন্তু সেদিকে তাঁর মোটে ভ্রূক্ষেপ নেই। আবেগে উৎসাহে চোখের দৃষ্টি জলজ্বল করছে।

"একটু তেল হবে—সামান্য একটু—"

"না"

ভ্রূ কুঞ্চিত করে' গোঁসাইজি সংক্ষেপে উত্তর দিলেন। আপিস ঘর থেকে সান্ত্বনা বেরিয়ে এল।

"আরে সান্ত্বনা দেবী যে—অ্যাঁ—একেবারে অপ্রত্যাশিত—ছি ছি—বাঃ! বিয়ের খবর পেয়েছিলাম, কিন্তু যেতে পারলাম না কিছুতে। অধ্যাপক মশায়ের নামটি কি যেন, দেবী চৌধুরাণীতে আছে—হ্যাঁ, গট ইট—ব্রজেশ্বর—ব্রজেশ্বর দে। প্রবন্ধ পড়লাম তাঁর একটা সেদিন—খাসা লেখা। ভারী খুশি হলাম আপনাকে দেখে। চমৎকার চমৎকার—বাঃ—"

তাঁর পুরু লেন্সের চশমা থেকে অজস্র রশ্মি-রেখা বিচ্ছুরিত হতে লাগল। বিরক্তিকে বিস্ময়ে রূপান্তরিত করে' সান্ত্বনা বললে—"আপনার সঙ্গে যে এখানে দেখা হয়ে যাবে তা ভাবি নি সত্যি। এখানে কোথায় এসেছেন—"

"বৈজুপ্রসাদের জন্য ভোট ক্যানভাস করছি—লোকটি ডিজার্ভিং ক্যাণ্ডিডেট—আমি প্রথমটা ধরতে পারি নি, উমেশ চৌবের জন্যে প্রথমটা—ছি ছি—যাক সে লম্বা কাহিনী—আপনি এখানে কি করে' এলেন"

"এসে পড়া গেছে এ অঞ্চলে। রাতটা কাটাচ্ছি এখানে"

"আমার কাছে মোবিল নেই"—গোঁসাইজি আবার বললেন। কিন্তু তাঁর কথা শুনবে কে। সদারঙ্গবিহারীলাল সান্ত্বনার দিকে চেয়ে বলে' চলেছেন—"এ অঞ্চলে এসে পড়েছেন যখন রাউতপুরের হিস্টরিক্যাল রিমেন্‌স্‌গুলো দেখে যাবেন, যদি না দেখে থাকেন। দু' একদিনের মধ্যে আমারও যাবার কথা আছে। একাই এসেছেন? ও—আই সি—সো সরি"

"আমার এখানে তেল নেই মশাই, শুনছেন"

সদারঙ্গবিহারীলালের তখন শোনবার মতো অবস্থা নয়। উচ্ছ্বাস অনুতাপ আনন্দ বিস্ময় প্রভৃতি বিবিধভাবে তাঁর চিত্ত আলোড়িত হয়ে উঠেছিল সুশোভনকে দেখে। চশমায় আলোর ফুলঝুরি কাটছিল।

"আরে রাম রাম—আমার ভাবাই উচিত ছিল—মানে—বাঃ যাক্। খুব খুশি হলাম—খুব। নামই শুনেছিলাম শুধু—লেখাও পড়েছি একটা—চমৎকার—

রাউতপুরে যান যদি—যাওয়া উচিত—মানে ওঁরাও-দের সম্বন্ধে নতুন ক্লু পাওয়া যেতে পারে—আপনি আমার চেয়ে ভাল বুঝবেন অবশ্য। মোবিল অয়েলের খোঁজে এসে—হঠাৎ এখানে—অ্যাঁ—ছি ছি—দেখুন দিকি—বাঃ—বাঃ—”

(৭)

অনীতা প্রথমটা বিব্রত হয়ে পড়লেও শেষ পর্য্যন্ত মাথা ঠিক রাখতে পেরেছিল। চেন টানবার কথা একবার মনে হয়েছিল অবশ্য, কিন্তু পঞ্চাশ টাকা জরিমানার কথাটা চোখে পড়াতে সে চেষ্টা আর করে নি সে। তাছাড়া ট্রেণ থামিয়েই বা কি হবে। সুশোভনকে তুলে নেবার জন্যে গার্ড ট্রেণ ব্যাক করে' নিয়ে যাবে না নিশ্চয়। তাছাড়া সুশোভনই কি ষ্টেশনে থাকবে? বিশেষতঃ একটা মেয়ের সঙ্গ পেয়েছে যখন। সমস্ত ছাপিয়ে ওই একটা কথাই মনে কাঁটার মতো খচখচ করছিল। আঃ—।

ট্রেণ চলতে লাগল। বাইরের দিকে চেয়ে চুপ করে' বসে' রইল অনীতা। কঠিন সংযম-সহকারে বসে' রইল, বসে' বসে' তেজ সংগ্রহ করতে লাগল। সাধারণ যে কোনও মেয়ে হয় চেন টানত, না হয় চলন্ত ট্রেণ থেকে লাফিয়ে নামবার চেষ্টা করত, কিন্তু স্বয়ম্প্রভার কন্যা কোন রকম আত্মসম্মান-হানিকর ইৎরামির মধ্যে গেল না। নীরবে বসে' বসে' শক্তি সংগ্রহ করতে লাগল কেবল। যদিও সে এই কিছুদিন আগে পর্য্যন্ত একজন উৎসাহী ‘কমরেড্’ ছিল, সোভিয়েট রাশিয়ার বন্ধন-বিদ্রোহী বিবাহের যুক্তিগুলো এখনও কণ্ঠস্থ আছে তার, কিন্তু বিবাহের তিনমাস পরেই তার স্বামী যে আর একজনের পাল্লায় পড়ে' বেহাত হয়ে যাবে স্বাধীনতা-নামধেয় এ যথেচ্ছাচারিতার প্রশ্রয় দেবে না সে কিছুতেই। অতটা আল্‌ট্রা মডার্ণ হবার প্রবৃত্তি নেই তার। পরের ষ্টেশনে নেমেই সুশোভনকে টেলিগ্রাম করতে হবে যে সে ফিরে যাচ্ছে। টেলিগ্রামটা পেয়ে আর কিছু না করুক—মেয়েটাকে অন্ততঃ সরিয়ে রাখবে সে। বাড়ি ফিরে গিয়ে যদি দেখতে হয় যে আর একটি সুন্দরী মেয়ে তার টেবিলে বসে' চা খাচ্ছে, আর সুশোভন হেসে

হেসে গল্প করছে তার সঙ্গে—উঃ, তার চেয়ে মরণ ভাল। তাছাড়া সুশোভনকে একলা নিজের এক্তিয়ারের মধ্যে পেলেই যা খুশি করা সম্ভব। আর একজনের সামনে কি বলবে সে! সুশোভনের বক্তব্যটা ধীরভাবে শুনবে সে প্রথমে, তারপর যথাকর্ত্তব্য করবে। দরকার হলে মা-কেও খবর দিতে হবে। হ্যাঁ, মাকে খবর দিতে হবে বই কি। নিজের শক্তি-সম্বন্ধে সচেতন হয়ে সোজা হয়ে বসল সে।

পরদিন সন্ধ্যায় ট্যাক্সি থেকে নেমে অনীতা দেখলে বাড়িতে কেউ নেই। এমন কি চাকরানিটা পর্য্যন্ত অনুপস্থিত। ড্রাইভারের সাহায্যে জিনিষপত্রগুলো নামিয়ে রাত্রি এগারোটা পর্য্যন্ত ঠায় বসে' রইল সে সিঁড়ির উপর। ঘরে তালা বন্ধ। চাবি চাকরানির কাছে। ঘরদ্বার পরিষ্কার করবে বলে' চাবিটা তার কাছে রেখে যেতে হয়েছিল। মায়ের কাছে গেল না, কারণ সুশোভনের মুখ থেকে সব কথা শোনবার আগে মাকে সে কিছু জানাবে না। সুশোভনের উপর কোনও অবিচার করবে না সে। খুব ক্ষিধে পেয়েছিল, খুব ক্লান্ত লাগছিল, সমস্ত দেহমন ভেঙে পড়েছিল তার যেন। একটুও ভালবাসে না সুশোভন তাকে—একটুও না। এই তো সবে তিনমাস বিয়ে হয়েছে···এর মধ্যেই সে···। ক্ষুধা তৃষ্ণা ক্লান্তি অভিমান সত্ত্বেও সে বারবার আবৃত্তি করছিল মনে মনে—না, না, আমারই ভুল হচ্ছে হয় তো, সুশোভনের দেখা পেলেই বোঝা যাবে কেন সে অমন করে' ছুটে চলে গেল—মেয়েটি কে···এখনও আসছে না কেন—সুশোভন···কোথা গেল। পরিচিত পদশব্দের আশায় উৎকর্ণ হয়ে বসে রইল সে। গাল বেয়ে এক ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল। মশা ছেঁকে ধরল। অন্ধকার ঘনিয়ে এল চতুর্দ্দিকে।

···সুশোভন কিন্তু এল না। অশ্রু শুষ্ক হল। হৃদয়ও শুষ্ক হতে লাগল ক্রমশঃ। সে যা সন্দেহ করেছে তাহলে তাই ঠিক। চাকরানিটা ফিরে এল এগারোটার সময় এবং দিদিমণিকে তদবস্থ দেখে অবাক হয়ে গেল।

নিম্নলিখিতরূপ কথোপকথন হল।

"উনি কখন গেলেন ?"

"বেলা আড়াইটের সময়"

"একাই গেছেন ?"

হাসি গোপন করে' চাকরানি বললে, "না সঙ্গে আর একজন ছিলেন"

"একটি মেয়ে কি ?"

"হ্যাঁ"

"ফরসা গোছের ?"

"হ্যাঁ। একটা কুকুরও ছিল তার সঙ্গে। আমি কুকুরটাকে ভেতরে ঢুকতে দিতে চাই নি, কিন্তু জামাইবাবু মানলেন না—সব একাক্কার করেছে"

"মেয়েটির সঙ্গে জিনিসপত্র ছিল ?"

"অনেক। সব বোঝাই করে' নিয়ে গেছে মোটরে"

"নিজেদের মোটর ?"

"না, ট্যাক্সি। শার্দ্দূল সিং না কে পাঠিয়েছিল বললে"

"কপাট খোল। আমার টেলিগ্রামটা লেটার বক্সে রয়েছে দেখছি"

"একটু চা কর দিকি। মীট সেফে কয়েকটা ডিম ছিল, ভাজ সেগুলো। বিস্কুটগুলো বার কর। বড্ড ক্ষিধে পেয়েছে"

"ঘরে কিছু নেই। সব ওনারা খেয়ে গেছেন।"

অনীতার সমস্ত মুখ অন্ধকার হয়ে গেল।

"বাজার থেকে কিছু খাবার আন তাহলে। এত রাত্রে পাওয়া যাবে কি কিছু"

"মোড়ের দোকানটা খোলা আছে"

চাকরানি কপাট খুলে' খাবার আনতে গেল। অনীতার মনে সন্দেহের আর কোন অবকাশ রইল না। মেয়েটাকে নিয়ে এইখানে এসেছিল! আমার শোবার ঘরে! লজ্জা করল না একটু।···তিনকাপ চা, গোটা চারেক রসগোল্লা, ছ'টা সিঙাড়া এবং গোটা পাঁচেক হিংয়ের কচুরি খাবার পর অনীতার ম্রিয়মাণ হৃদয় কথঞ্চিৎ সঞ্জীবিত হল। মনে হল আর কালবিলম্ব করা উচিত নয়। অবিলম্বে কার্য্যে অগ্রসর হওয়া উচিত।

মাকে ফোন করল সে।

অনেকক্ষণ বকবক করে' স্বয়ম্প্রভা দেবী সবে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। জিতুবাবু তাঁর পাশে চোখ বুজে পড়েছিলেন এবং আশা করছিলেন যে এইবার ঘুমুল বোধ হয়! তাঁরও একটু তন্দ্রা আসছিল। কিন্তু হঠাৎ পেটে কনুইয়ের গুঁতো খেয়ে তড়াক করে' উঠে বসতে হল আবার তাঁকে।

"কি"

"ফোন শুনতে পাচ্ছ না ?"

"ফোন ?"

আবার বেজে উঠল ফোনটা। বিছানা ছেড়ে উঠলেন জিতুবাবু। ফোন নীচের ঘরে।

"ফোনে তোমাকে ডাকছে"

জিতুবাবু ফিরে এসে বললেন। প্রতিহিংসার একটা চাপা হাসি তাঁর চোখে মুখে ফুটে উঠেছে মনে হল।

"আমাকে ? এত রাত্রে কে ডাকছে আমাকে"

"অনীতা"

"অনীতা! সে তো দ্বিগ্বিজয়বাবুর ওখানে গেছে"

"হয় তো সেখান থেকেই ফোন করছে"

"তাই বললে ?"

"না, জিগ্যেস করি নি"

"যাও জিগ্যেস করে' এস। আমি ততক্ষণ গায়ে একটা জড়িয়ে নি কিছু"

"তুমিই যা জিগ্যেস করবার কর না গিয়ে। তোমাকেই চাইছে সে"

"বেশ, আমিই যাচ্ছি। কিন্তু তুমি শুয়ো না যেন"

"আমি কি করব দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে"

"তোমাকেও দরকার হতে পারে হয় তো"

"আমাকে এত রাত্রে কি দরকার হতে পারে"

"কেন ফোন করছে জানি না তো। নিশ্চয়ই বিপদে পড়েছে। তা না হলে এত রাত্রে ফোন করবে কেন! শুয়ো না তুমি"

"ছি ছি কাপড়টা ভাল করে' পর। চাকররা দেখতে পেলে ভাববে কি"

"চাকররা ঘুমিয়েছে। আমি ফিরে না আসা পর্য্যন্ত শুয়ো না"

স্বয়ম্প্রভা দেবী চলে গেলেন। ফিরলেন বেশ কিছুক্ষণ পরে এবং জিতুবাবুর দিকে একটা অগ্নিদৃষ্টি নিক্ষেপ করে' বললেন, "আমি জানতাম"

"এই শীতে মেজেতে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকা যায় নাকি" বিছানার ভিতর থেকে করুণ কণ্ঠে বললেন জিতুবাবু।

"সে কথা বলছি না। এ আমি গোড়া থেকেই জানতাম। যাও তাড়াতাড়ি কাপড়জামা পরে নাও, আর এক মুহূর্ত্ত দেরি করা চলবে না। করছ কি তুমি, ওঠ না। এ রকমটা যে হবে, গোড়া থেকেই বুঝেছিলাম আমি"

"কি বুঝেছিলে? কি হবে? কাপড়জামা পরব, মানে! ব্যাপারটা কি খুলেই বল না"

স্বয়ম্প্রভা গায়ের র‍্যাপারটা বিছানায় ছুঁড়ে দিয়ে আলনা থেকে একটা গরম ব্লাউস তুলে নিলেন এবং তার সরু লম্বা হাতায় নিজের বলিষ্ঠ বাহুটি প্রবেশ করাতে করাতে বলিলেন—"অনীতাকে হাওড়া ষ্টেশনে ফেলে তার স্বামী পালিয়েছে। আগেই আমি জানতাম। উঠছ না এখনও? এ শুনেও শুয়ে আছ কি করে' তুমি? উঠে তাড়াতাড়ি ওভার কোটটা পরে' নাও, বেশী কিছু পরবার দরকার নেই এখন। সময়ও নেই। ওঠ, ওঠ, ওঠ না—শুয়ে থাকতে পারছও তো এসব শোনবার পর"

"কবে পালিয়েছে"

"আজ। উঠবে, না শুয়েই থাকবে লেপের তলায়"

"কোথায় পালিয়েছে"

"বললাম না, হাওড়া ষ্টেশনে। আমার হয়ে গেছে—নাও তুমি"

"অনীতা কোথায় ? দিগ্বিজয়বাবুর ওখানে ?"

"রসিকতা করছ নাকি"

নিজেই তিনি জিতুবাবুর ওভারকোটটা এনে দিলেন।

রাত্রি দ্বিপ্রহরে যে অবস্থায় তাঁরা গিয়ে কন্যাকে দেখলেন তাতে অতি-আধুনিকতার কোন চিহ্নই ছিল না। সেই সনাতন আলুলায়িত কেশ, দর-বিগলিত অশ্রু, বুক-ফাটা হা-হুতাশ। হৃদয়বিদারক লজ্জাকর কাহিনীটা বিবৃত করতে করতে কণ্ঠস্বরও অবরুদ্ধ হয়ে আসছিল অনীতার মাঝে মাঝে। ওষ্ঠাধর দৃঢ় নিবদ্ধ করে' স্বয়ম্প্রভা দেবী নীরবে সব শুনে যাচ্ছিলেন এবং মাঝে মাঝে ঘাড় নেড়ে যা প্রকাশ করতে চাইছিলেন তার সরল অর্থ—ঠিক এই আমি ভেবেছিলাম।

"কুসুম আর কি কি বললে"

কুসুম চাকরানিটার নাম।

রুমাল দিয়ে চোখ মুছে অনীতা বললে, "সবই তো বললুম"

"ট্যাক্সির নম্বরটা দেখেছিলে ?"

"না। শার্দ্দূল সিং ট্যাক্সি দিয়েছিল শুনলাম"

"শার্দ্দূল সিং ? সে তো আমাদের চেনা লোক। দিন সাতেক আগে মনে হচ্ছে তারই একটা ভাঙা মোটরের লোহাগুলো আমরা কিনলাম। শার্দ্দূল সিংই তার নাম, না ?"

স্বয়ম্প্রভা দেবী জিতুবাবুর দিকে চাইতেই সম্মতিসূচক মাথা নাড়লেন তিনি। নেড়েই অন্যমনস্ক হবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু স্বয়ম্প্রভা রেহাই দিলেন না।

"কি করছ এখন"

"কি"

"হ্যাঁ—কি—কি"

"কি মুসকিল ! আমি কি—"

"এক কথা বার বার আউড়ে লাভ হবে না কোন। অনীতা যা বললে শুনলে তো। এখন কি করতে চাও"

"চাইব? চেয়েই তো আছি"

সত্যি জিতুবাবুর ঘুমের ঘোর কাটে নি তখনও।

"তুমি মানুষ না পাথর? এ সব শুনেও কিছু করবে না?"

হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলেন স্বয়ম্প্রভা দেবী।

"কি করব বল। তাই তো জানতে চাইছি—কি করব"

"পুলিশে খবর দাও"

"পুলিশে! মাথা খারাপ নাকি। এই রাত্রে পুলিশ! পুলিশ কি বস্তু তা চেন?"

"যেমন করে' হোক ওকে ধরতে হবে। যেমন করে' হোক। এ অপমান কিছুতেই সহ্য করব না আমি"

জিতুবাবু তাঁর কেশবিরল মস্তকে ধীরে ধীরে হস্তসঞ্চালন করছিলেন। ঈষৎ কেসে তিনি বললেন; "কিন্তু তার অপরাধের অকাট্য কোনও প্রমাণ দেখতে পাচ্ছি না আমি এখনও"

মাতা-পুত্রী উভয়েই সমস্বরে বলে উঠল, "এখনও প্রমাণ দেখতে পাচ্ছ না!"

আর একটু কেসে জিতুবাবু উত্তর দিলেন, "ট্রেণ ধরতে না পেরে সে বাড়ি ফিরে এসেছিল, ফিরে এসে একটা ট্যাক্সি নিয়ে বেরিয়ে গেছে। সাধারণ বুদ্ধিতে তো মনে হয় অনীতার উদ্দেশ্যেই গেছে"

অনীতা ক্রোধভরে ঘাড়টা ফিরিয়ে নিলে। বাবার সরলতা সীমা অতিক্রম করছে যেন!

স্বয়ম্প্রভা দেবী জিতুবাবুর মুখের কাছে মুখ নিয়ে এসে হাত নেড়ে বললেন, "আহা, কি বুদ্ধি! মরি মরি"

"আর একটি মেয়ের কথা যা বলছ, তারও হয়তো ওই পথে যাওয়ার দরকার ছিল, হঠাৎ দেখা হয়ে গেছে হয়তো ষ্টেশনে—কিম্বা—"

"তুমি থাম বাবা"—অভিমান-অনুযোগ-ভরা কণ্ঠে অনীতা বললে।

স্বয়ম্প্রভা বললেন, "লোহার কারবার ছেড়ে ব্যারিস্টারি কর গে যাও তুমি। সেই তোমার মানাবে ভাল"

"আমি বাজি রাখতে পারি"—হঠাৎ চটে গিয়ে জিতুবাবু বলে উঠলেন—"আমি বাজি রাখতে পারি, সুশোভন এতক্ষণে দিগিন্দ্র না দিকপাল সেই ভদ্র-লোকের ওখানে পৌঁছে গেছে, আর অনীতাকে সেখানে দেখতে না পেয়ে আকাশ-পাতাল ভাবছে। সকালেই আমি টেলিগ্রাম করব সেখানে"

স্বয়ম্প্রভা বললেন, "তাহলে তো সোনায় সোহাগা হবে। ঢি ঢি পড়ে যাবে চারদিকে"

"যাই হোক্ সমস্ত রাত এখানে দাঁড়িয়ে থেকে কোনো লাভ হবে না এখন। বাড়ি চল। আমি পা-জামা পরেই চলে এসেছি। আমার বিশ্বাস সকাল নাগাদ সব পরিষ্কার হয়ে যাবে। আর এখন করবারই বা কি আছে"

"আমি অনীতার কাছে থাকব"

"বেশ থাক। ভালই তো"

"না, মা তুমি যাও। আমার কোনও কষ্ট হবে না"

"কেন, থাকি না"

"না"

জিতুবাবু অধীর হয়ে উঠলেন।

"আঃ, যা হয় ঠিক করে' ফেল একটা। ঘুম পাচ্ছে আমার"—তারপর অনীতার দিকে ফিরে বললেন, "মিছি মিছি ভাবছিস, কিছু হয় নি। তাছাড়া আর একটা কথাও মনে রাখা উচিত আমাদের। সুশোভন ঠিক আমাদের মতো নয় তো, সে যে সমাজে মানুষ সে সমাজে স্ত্রীলোক নিয়ে অত শুচিবাই নেই, কারও সঙ্গে একবার ট্যাক্সিতে উঠলেই যে চারিদিকে ঢি ঢি পড়ে যাবে এ কথা ভাবতেই পারে না সে হয়তো"

"এই ঘুমের জন্যে অস্থির হচ্ছিলে, আবার বক্তৃতা সুরু করলে কেন। কত রঙ্গই যে জান—"

"কাল সকালেই টেলিগ্রাম করব আমি। রায় বাহাদুর দিগিন্দ্রমোহন ?"

"দিগ্বিজয় সিংহ রায়—মুচুকন্দ-কুণ্ডলেশ্বরী"

"আচ্ছা। টুকে দে আমায় একটা কাগজে, ভুলে যেতে পারি"

উভয়ে বাড়ি ফিরে এলেন। ফিরে এসেই স্বয়ম্প্রভা দেবী ফোন ডাইরেক্টারী খুঁজে শার্দ্দূল সিংকে ফোন করলেন। কোন জবাব পেলেন না। সকাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করতে হল তাঁকে। না, সে ট্যাক্সি এখনও ফেরে নি। কোনও খবরও আসে নি এখনও। না, কোথায় গেছে তা জানেন না তাঁরা ঠিক। সুশোভনবাবু শুধু বলেছিলেন অনেক দূর যেতে হবে, সুশোভনবাবু চেনাশোনা লোক, তাই তাঁরা নির্ভয়ে তাঁর হাতে ট্যাক্সি ছেড়ে দিয়েছিলেন—বিশেষ খোঁজ খবর করেন নি। ড্রাইভারের নাম গণেশ, যদিও নূতন লোক কিন্তু নির্ভরযোগ্য। গণেশ ফিরে এলে তাকে মিসেস সোমের কাছে পাঠিয়ে দেবে তারা।

জিতুবাবু আপিসে পৌঁছে টেলিগ্রাম করবার ফর্ম চাইলেন এবং বেশ কায়দা করে' চেয়ার টেনে বসলেন। ব্যবসায় সংক্রান্ত চিঠিপত্র লিখতে আটকায় না তাঁর, কিন্তু এ ধরণের সূক্ষ্ম সামাজিক লিপিকুশলতা তাঁর ধাতে নেই। ব্যাপারটা একটু ঘোরালো গোছেরও। টেলিগ্রাফিক ভাষায় সংক্ষেপে লিখতে হবে! উপর্য্যুপরি গোটা ছয়েক ফর্ম নষ্ট করবার পর ভ্রূকুঞ্চিত করে' বসে রইলেন তিনি কিছুক্ষণ। অনুচ্চকণ্ঠে একবার বললেন, "বেশ বেগ দেবে দেখছি।" বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হলেন।

প্রথমতঃ জানা দরকার সুশোভন সেখানে গেছে কিনা। দ্বিতীয়তঃ জানানো দরকার অনীতা কেন যায় নি, তৃতীয়তঃ সমস্ত ব্যাপারটাকে একটা সংক্ষিপ্ত অথচ ভদ্র চেহারা দিতে হবে। ভদ্র চেহারা দিতেই হবে, কারণ ওই দিকপাল ভদ্র-বনেদী ঘরের ছেলে—দারুণ ইয়ে—। সঙ্গে সঙ্গে ইঙ্গিতে এটি জানানও দরকার যে অনীতা সামান্য একটু চিন্তিত হয়েছে বটে কিন্তু আতঙ্কিত হয় নি।

পেন্সিল দিয়ে মাথা চুলকোতে চুলকোতে মুখবিকৃতিসহকারে তিনি মনে মনে ভাঁজতে লাগলেন—ক্যান ইউ কাইণ্ডলি সেন্ড্ নিউজ সুশোভন থিঙ্ক সাম মিস্টেক—ওয়াইফ্ কট্ ট্রেণ হি মিস্ড্ সো রিটার্ণড। পছন্দ হল না। আবার

ভাঁজতে লাগলেন—ইজ স্থশোভন উইথ্ ইউ ওয়াইফ্ মিস্‌ড্ হিম্ ষ্টার্টেড্ টু ক্লাম বাট্ মিস্‌ড্ হিম্ সো রিটার্ণড্ হোম্ বাট্ মিস্‌ড্—

তাঁর আপিস ঘরের বাইরে কয়েকজন কর্ম্মচারী জরুরি ফাইলপত্র নিয়ে দাঁড়িয়েছিল এবং অধীরতাস্থচক যে সব শব্দ করছিল তাতে আরও গোলমাল হয়ে যাচ্ছিল যেন সব। অবশেষে বিরক্তিভরে অর্দ্ধলিখিত আর একগোছা টেলিগ্রাম ফর্ম ছিঁড়ে কুঁচোকুঁচি করে' ওয়েষ্ট পেপার বাস্কেটে ফেলে দিলেন। দুপুর পর্য্যন্ত যদি কোন খবর না আসে তখন দেখা যাবে।

"আস্থন আপনারা—"

(৮)

অত্যুচ্ছ্বসিত সদারঙ্গবিহারীলালের নমস্কারের প্রত্যুত্তরে স্থশোভনকে প্রতিনমস্কার করতে হল, কিন্তু মনে মনে বিব্রত হয়ে পড়ল সে। সদারঙ্গবিহারীলাল? নামটা শোনা-শোনা ঠেকছে। অনীতারই সম্পর্কে কোথায় যেন শুনেছে। ঠিক মনে পড়ল না।

"আপনার বিয়েতে যেতে পারি নি। সেটা আমার দুর্ভাগ্য। আমার 'তার'টা পেয়েছিলেন তো?"

স্থশোভনের আবছাভাবে মনে পড়ল বিয়ের সময় অনীতাদের বাড়ীতেই এ নামটা সে শুনেছিল যেন। কে যেন বলেছিল সদারঙ্গবিহারীলাল আসতে পারবে না।

"হ্যাঁ, আপনার 'তার' পেয়েছিলাম বই কি"—সান্ত্বনা জবাব দিলে।

"হ্যাঁ, পেয়েছিলাম" সায় দিতে হল স্থশোভনকেও। স্থশোভনের দিকে চেয়ে সদারঙ্গবিহারীলাল স্থরু করলেন তখন।

"আপনার কথা অনেক শুনেছি"

"আমার কথা? আমার স্ত্রীর কাছ থেকে বুঝি"

"হ্যাঁ, আপনার স্ত্রীর কাছ থেকে তো বটেই, আরও অনেক জায়গা থেকে। আপনাদের মতো লোক কি লুকিয়ে থাকতে পারে কখনও—হেঁ হেঁ হেঁ—"

এ কথা শুনে বেশ একটু ঘাবড়ে গেল সুশোভন। একটু ইতস্ততঃ করে' চুপ করে' রইল, আড়চোখে সান্ত্বনার দিকে চাইলে একবার।

"আপনাদের বিয়ের আগে আপনার স্ত্রীর সঙ্গে একবার নাইট স্কুলে দেখা হয়েছিল, কেমন না?"

প্রশ্নের ভঙ্গীতে সান্ত্বনার দিকে চেয়ে সোচ্ছ্বাসে ভুরু নাচালেন সদারঙ্গবিহারীলাল।

"ও, নাইটস্কুলে"—ক্ষীণভাবে প্রতিধ্বনি করলে সুশোভন।

"হ্যাঁ, নাইট স্কুলে। আপনারও সেখানে আসবার কথা ছিল, কিন্তু কি একটা ব্যাপারের জন্য আপনার আসা হয় নি। সম্ভবতঃ কোনও জরুরি মিটিংএ আটকে পড়েছিলেন।"

সদারঙ্গবিহারীলাল এমনভাবে চাইলেন সুশোভনের দিকে, যেন কোন দেবদুর্লভ ব্যক্তিকে দর্শন করছেন তিনি।

বিদ্যুৎ-চমক-বৎ সুশোভনের হঠাৎ মনে পড়ল এঁদের চক্ষে সে অধ্যাপক ব্রজেশ্বর দে (যিনি সম্প্রতি উৎসাহী কংগ্রেসকর্ম্মী হয়ে উঠেছেন)—অনীতার সঙ্গে তার বিয়ে হয় নি, হয়েছে সান্ত্বনার সঙ্গে! অপ্রত্যাশিত নেপথ্যলোকে সহসা পরকীয়া লাভ করে' সুশোভনের অবচেতন মানসে বেশ একটু পুলক সঞ্চার হল। মন্দ কি! উৎসাহী কংগ্রেসকর্ম্মী অধ্যাপক ব্রজেশ্বর দে হবার শখ নেই তার, কিন্তু সান্ত্বনার স্বামী হওয়াটা—অদ্ভুতগোছের ঠেকলেও—লোভনীয়। বেশ, অভিনয় যদি করতেই হয় ভালভাবেই করতে হবে। বিব্রতভাবটা ঝেড়ে ফেলে বেশ সপ্রতিভ হয়ে উঠল সুশোভন।

সদারঙ্গবিহারীলাল মিনিট দশেকের বেশী ছিলেন না। কিন্তু সেই দশ মিনিটেই তিনি জটটি বেশ পাকিয়ে গেলেন। গোঁসাইজি বুঝলেন যে তাঁর নবাগত অতিথিটির নাম অধ্যাপক ব্রজেশ্বর দে, কথাবার্ত্তা থেকে এ-ও বুঝলেন যে ইনি একজন কংগ্রেস-

কর্ম্মী। অনেকদিন থেকে সদারঙ্গবিহারীলালের একটি বদ্ধ ধারণা ছিল যে মহাত্মা গান্ধীর পাল্লায় পড়ে যদিও অধিকাংশ কংগ্রেসকর্ম্মী অহিংসাকেই স্বদেশ-উদ্ধারের পন্থা বলে ঘোষণা করে' বেড়াচ্ছেন কিন্তু সত্যি সত্যি কেউ অহিংসায় আস্থাবান নন। সুযোগ পেলেই সবাই আস্তিন গুটিয়ে ঘুঁসি তুলতে প্রস্তুত অর্থাৎ মনে মনে সবাই হিংস্র। তাই যদিও রাত অনেক হয়েছিল এবং তাঁর মোটর বাইকে 'মোবিল' ছিল না তবু এমন একটা সুযোগ ছাড়তে পারলেন না তিনি। এমন একজন নামজাদা কংগ্রেসকর্ম্মীকে এত ঘনিষ্ঠভাবে পাওয়া গেছে যখন, তখন এ সন্দেহের একটা নিরসন না করে' কি ছাড়া যায়? প্রশ্ন সুরু করলেন। প্রশ্নের ধরন থেকেই কি উত্তর তিনি প্রত্যাশা করেন তা বেশ বোঝা যাচ্ছিল অবশ্য। বিশেষ বেগ পেতে হল না সুশোভনকে।

"আচ্ছা, সত্যিই কি আপনি অহিংস-পন্থায় বিশ্বাস করেন নাকি? মানে, রাজনৈতিক অস্ত্র হিসেবে বলছি। কাগজে অবশ্য আপনাদের পোষাকী বক্তৃতা অনেক পড়েছি, কিন্তু কাজ হাঁসিল করার জন্যে বক্তৃতায় অনেক সময় অনেক কথাই বলতে হয়—অ্যাঁ, কি বলেন—কিন্তু সত্যি কি আপনি বিশ্বাস করেন যে নিছক অহিংসাতেই আমাদের দেশ উদ্ধার হয়ে যাবে?"

"মোটেই না"—একটু হেসে সুশোভন উত্তর দিল—"কিন্তু ও কথা বলা ছাড়া আমাদের এখন গত্যন্তর কি আছে বলুন"

"হ্বাট্‌স্ ইট্! আপনাদের অহিংস মুখোসের তলায় তাহলে—কিছু মনে করবেন না উপমাটায়—মানে—"

"না, মনে করবার কি আছে"

"আপনাদের অধিকাংশ দক্ষিণপন্থীদের আসল মনোভাব তাহলে ওই"

"আমার তো তাই বিশ্বাস"

"সত্যি? বা! আমিও বরাবর ঠিক এই কথা ভেবে এসেছি। প্রকাশ্যে আপনারা অবশ্য স্বীকার করবেন না, করতে পারেন না—"

"তা পারি কি"

"চমৎকার, চমৎকার। যাক্ সন্দেহটা মিটে গেল। অবশ্য ব্যাপারটার মধ্যে বেশ খানিকটা ইয়ে আছে, মানে ভণ্ডামিই বলতে হবে—প্লীজ এক্স্‌কিউজ্ মি—ঠিক জুৎসই কথাটা মনে আসছে না। মানে, বুঝতে পেরেছেন আশাকরি আমার মনের ভাবটা"

সুশোভন স্মিতমুখে চুপ করে রইল। কথা বাড়াবার ইচ্ছে আর তার ছিল না।

সদারঙ্গবিহারীলাল গলার স্বর খুব খাটো করে' হঠাৎ প্রশ্ন করলেন, "আচ্ছা, সুভাষবাবুর সম্বন্ধে মহাত্মাজির আসল মনোভাবটা কি বলুন তো"

"আমি—আমি ঠিক জানি না"

"আপনি জানেন না? বিশ্বাস করলাম না। অবশ্য বলতে বাধা থাকতে পারে। আছে নাকি"

"তা আছে একটু, মাপ করবেন আমাকে"

"না, না, তাহলে জোর করতে চাই না। সার্‌টেন্‌লি—"

সদারঙ্গবিহারীলাল উদ্ভাসিত মুখে সান্ত্বনার দিকে চাইলেন—চশমার লেন্স থেকে আনন্দ ঠিকরে পড়ছিল যেন।

"সত্যি ভারী আনন্দ পেলাম আপনার স্বামীর সঙ্গে আলাপ করে'। আমাদের মতো লোকের সঙ্গে এমন সরলভাবে আলাপ করবেন তা কল্পনাতীত ছিল। বাঃ—বাঃ—ভারী আনন্দ হচ্ছে। সব দক্ষিণপন্থীই তাহলে মনে মনে বামপন্থী—বাঃ চমৎকার। রাগ করলেন নাকি?"

"না, রাগ করবার কি আছে এতে—ঠিকই তো বলেছেন"

"বাঃ বাঃ, ভারী খুশি হলাম। অচ্ছা এবার চলা যাক্। গোঁসাইজি সত্যি তেল নেই আপনার? একটু হলেই হবে"

"সর্ষের তেল হলে হবে?"

"সর্ষের? রাম কহো। তা কি হয়? লুব্রিকেটিং অয়েল চাই"

"আজ্ঞে না আমরা গেঁয়ো লোক, ওসব রাখি না"

সান্ত্বনার দিকে চেয়ে করুণকণ্ঠে সদারঙ্গবিহারীলাল বললেন, "বিপদে যে পড়তে হবে তা বুঝেছিলাম, বুঝলেন। কিন্তু বিপদ যে এমন ঘনীভূত হয়ে উঠবে তা ভাবি নি। একটু মোবিল না পেলে মারা যাব যে একেবারে। মাইল খানেক হেঁটে আসছি। বেশ গরম হয়ে উঠেছিল গাড়িটা। দুর্গতি যাকে বলে। পিস্টন থেকে এমন সব অদ্ভুত শব্দ হচ্ছে বুঝলেন, মোটেই সুবিধাজনক নয়—শেষকালে কি—এইখানেই রাতটা—"

"আপনার হাজার অসুবিধা হলেও এখানে তো রাত্রে জায়গা দিতে পারব না আপনাকে"—একটু গলা-খাঁকারি দিয়ে গোঁসাইজি বললেন—"আপনার সৎকার করতে অক্ষম আমি আপাতত। একটিমাত্র ঘর ছিল সেটি ব্রজেশ্বরবাবুরা নিয়েছেন"

সুশোভন অস্বস্তিবোধ করল একটু।

"আপনি যাবেন কোথা"—সান্ত্বনা জিগ্যেস করলে।

"ছিপছররামারি। ছিপছররামারিতেই থাকি আমি। ওই যে বললাম না, ক্যানভাস করতে বেরিয়েছি। উমেশ চৌবে লোকটা সুভাষ বোসের খুব প্রশংসা করত তাই ভেবেছিলাম লোকটা খুব ভাল, তারই হয়ে ক্যানভাস করেছিলাম প্রথমে। তারপর জনার্দ্দনবাবু আমার চোখ খুলে দিলেন—এখন দেখছি যদিও একটু ঘুঁতঘুঁতে ধরনের তবু বৈজুপ্রসাদ লোকটাই ডিজার্ভিং ক্যাণ্ডিডেট। ভুল সংশোধন করতে বেরিয়েছি তাই। অনেক ঘুরতে হল—তা হোক্। ব্রজেশ্বরবাবু আপনারও এ অঞ্চলটা একবার ঘুরে দেখা উচিত—ঐতিহাসিক মানুষ আপনি—এদিকের ইন্টিরিয়ারে চমৎকার চমৎকার পুরোনো মন্দির আছে, কতকগুলি মূর্ত্তিও। এসেছেন কখনও এদিকে আগে? আসা মুস্কিল অবশ্য। কাছে-পিঠে কোনও ষ্টেশন নেই কিনা। আপনারা বাই রোড এসেছেন নিশ্চয়—"

"হ্যাঁ, আমাদের কারটা বিগড়ে পড়ে আছে কয়েক মাইল দূরে, আমরা হেঁটে এসেছি এখানে রাতটা কাটাবার জন্যে"

"আমাকেও আপনাদের সঙ্গী না হতে হয়, কি বিপদ দেখুন তো"

"না আপনি ঠিক পৌছে যাবেন" আশ্বাস দেওয়ার ভঙ্গীতে বলে' উঠল সান্ত্বনা।

"আমিও আপনার সংকার করতে অক্ষম আপাতত"—গোঁসাইজি বললেন।

"তা-ও বটে, ঘর খালি নেই আপনার। যদি থাকতেই হয় বারান্দায় পড়ে থাকতে হবে হয় তো—কিম্বা বাইরে—হা-হা-হা-হা"

"হা-হা-হা-হা"—জোর করে' হেসে উঠল সুশোভন।

লোকটা সত্যি সত্যি থেকে না যায়!

গোঁসাইজি ভ্রূকুটি করলেন।

"পাঁচ মাইল তো মোটে"—সান্ত্বনা বললে।

কণ্ঠ-স্বরে প্রায়-অকৃত্রিম আন্তরিকতার সুর ফুটিয়ে উৎসাহ দিল সুশোভন—"হ্যাঁ, ঠিক পৌছে যাবেন আপনি"

সদারঙ্গবিহারীলাল এর পর যা বললেন তা আশ্বাসজনক।

"হ্যাঁ, মোটে পাঁচ মাইল, পৌছে যাওয়া উচিত তো। তাছাড়া গাড়িখানা এতক্ষণে ঠাণ্ডাও হয়েছে খানিকটা, গর্মে ছিল ভয়ানক। বেরিয়ে পড়া যাক্ তাহলে, কি বলেন"

"হ্যাঁ, রাত হয়েছে, আর দেরী করা উচিত নয়"

"আচ্ছা তাহলে নমস্কার। নমস্কার সান্ত্বনা দেবী। অপ্রত্যাশিত আনন্দ পেলাম। সমস্ত ক্লান্তি দূর হয়ে গেল যেন। ভাগ্যে গাড়িটা খারাপ হয়েছিল তাই দেখা হয়ে গেল আপনাদের সঙ্গে। গাড়িটা কিন্তু ঘাবড়ে দিয়েছিল বেশ। মনে হচ্ছিল ইন্‌লেট্ ভালভের স্প্রিংই গেছে বুঝি একটা। এখন বুঝতে পারছি ওভারহিটেড্ হয়েছিলাম। মিকশ্চারটা আর একটু রেগুলেট করে' নিতে হবে তার মানে। একটু 'রিচ্' হয়ে গেছি সম্ভবতঃ। আচ্ছা, নমস্কার তাহলে নমস্কার—"

ঝুল-কালি-মাখা হাত তুলে সবাইকে নমস্কার করলেন সদারঙ্গবিহারীলাল।

"বড় আনন্দ পেলাম। আবার আলাপ আলোচনার সুযোগ ঘটবে আশা করি শিগগির। আপনাদের মতো লোকের সঙ্গে আলাপ করলে মনের রঙই বদলে যায়। চমৎকার। আচ্ছা চলি, নমস্কার। নমস্কার সান্ত্বনা দেবী"

"নারায়ণের কৃপায় পৌঁছে যান ভালয় ভালয়। আমার এখানে স্থান নেই মোটে"

গলা-খাঁকারি দিয়ে কথাটা মনে করিয়ে দিলেন আবার গোঁসাইজি।

"খানিকটা গিয়ে বাইক যদি ফেল করে তাহলেও দেবেন না"

"আপনার হার্ট যদি ফেল করে তাহলেও দেব না, মানে দিতে পারব না। স্থানাভাব। গোড়া থেকেই বলছি তো সৎকার করতে অক্ষম আমি আপাতত।"

"তাহলে যা থাকে কপালে বলে' বেরিয়ে পড়া যাক্ এইবার। কি বলেন! গাড়িটা ঠাণ্ডাও হয়েছে, আর বেগ দেবে না বোধ হয় আশা করি"

সদারঙ্গবিহারীলাল মরীয়া হয়ে অগ্রসর হলেন দ্বারের দিকে। একটু এগিয়েই ফিরলেন আবার।

"আচ্ছা তাহলে নমস্কার সান্ত্বনা দেবী, নমস্কার ব্রজেশ্বরবাবু। বাঃ বাঃ চমৎকার কুকুরটি তো—খাসা। কি সুন্দর লোম। আপনার কুকুর বুঝি সান্ত্বনা দেবী—বাঃ"

সান্ত্বনা মাথা নেড়ে জানালে যে ঝুনু তারই কুকুর।

"বাঃ—"

সদারঙ্গবিহারীলাল একটু ঝুঁকে ঝুনুকে আদর করলেন। ঝুনু সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাঁর দিকে চেয়ে মনিবের দিকে তাকালে একবার। তারপর হাঁচলে।

"বাঃ, সুন্দর কুকুরটি। আচ্ছা, চলি তাহলে এবার, নমস্কার। ঝুনু, চলি বুঝলে, নমস্কার"

গোঁসাইজি গলা-খাঁকারি দিয়ে দ্রুতপদে এগিয়ে গেলেন এবং দরজাটা খুলে দিলেন ভাল করে'।

"এতক্ষণে গাড়িটা ঠাণ্ডা হয়েছে আশা করি। হওয়া উচিত অন্ততঃ, আচ্ছা চলি এবার, নমস্কার তাহলে"

গোঁসাইজির রগের শিরাগুলো ফুলে উঠেছিল। একটি কথা না বলে নীরবে তিনি তাঁর অনুগমন করলেন। সুশোভন সান্ত্বনার দিকে চেয়ে ম্লান হাসি হাসলে একটু। ভোজকাজের বাড়িতে খাওয়াদাওয়া চুকে যাবার পর বাড়ির গিন্নির যে রকম মুখভাব হয় সান্ত্বনার মুখভাব অনেকটা সেই রকম হয়ে উঠেছিল। দড়াম করে, সদর দরজা বন্ধ হবার শব্দ পাওয়া গেল। গোঁসাইজি ফিরে এলেন। তাঁর দুই ভ্রূর মাঝখানে গভীর দু'টি রেখা ফুটে উঠেছে।

"আপনি তাহলে কংগ্রেসের লোক একজন"

সুশোভন রুমালটা বার করে' নাক ঝাড়তে লাগল। সান্ত্বনাই জবাব দিলে।

"হ্যাঁ, আমার স্বামী একজন কংগ্রেসকর্ম্মী"

"ও, আমি ধরতে পারি নি ঠিক। আপনি কোন দিকে ?"

"কিসের কোন দিকে—মানে আপনি যে দিকে—মানে"

"আপনি অফিস অ্যাক্সেপ্টান্সের স্বপক্ষে না বিপক্ষে"

সুশোভন ভ্রূকুঞ্চিত করে' গোঁসাইজির দিকে চকিতে দৃষ্টিপাত করলে একবার। তার মনে হল গোঁসাইজির মতো লোকের অফিস অ্যাক্সেপ্টান্সের স্বপক্ষে হওয়াটাই স্বাভাবিক।

"আমি স্বপক্ষে"

"ও, স্বপক্ষে! বটে—"

ওষ্ঠ দ্বারা অধরকে নিষ্পিষ্ট করে' গুম হয়ে গেলেন গোঁসাইজি। তাঁর চক্ষুর দৃষ্টি থেকে যা বিচ্ছুরিত হতে লাগল তা ক্রোধ ও ব্যঙ্গের এক অস্বস্তিজনক সমন্বয়।

"সিংহাসনে সবাই বসতে চায়। চাওয়াটাই স্বাভাবিক" এইটুকু বলে' একটু থেমে "হাঃ" বলে' গোঁসাইজি তাঁর বক্তব্য শেষ করলেন। তার পর কি মনে হল

হঠাৎ ঘুরে বললেন—"সিংহাসনে বসছেন বসুন, কিন্তু ঘুস নেওয়াটি বন্ধ করতে পারবেন ? এই যে আপাদমস্তক সবাই চোর, দিনদুপুরে পুকুর চুরি করছে তার হিল্লে করতে পারেন যদি তাহলেও বুঝব কাজ করলেন একটা"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, ঠিক ওই উদ্দেশ্য নিয়েই আমি ঢুকতে চাই"

"ভাল। আমার অ্যাডমিশন রেজিস্টারে যখন নাম লিখবেন তখন নিজের পরিচয়টাও লিখে দেবেন দয়া করে। একজন বিখ্যাত কংগ্রেসকর্ম্মী আমার হোটেলে পদার্পণ করেছিলেন এ নজির পাঁচজনকে দেখাবার মতো"

পুনরায় অধর দিয়ে ওষ্ঠকে চাপলেন। সুশোভন সান্ত্বনার দিকে চেয়ে মুখে একটা প্রশংসা-সঙ্কুচিত হাসি ফুটিয়ে তোলবার চেষ্টা করলে। কিন্তু পারলে না ঠিক।

সান্ত্বনার দিকে চেয়ে গোঁসাইজি বললেন, "আপনারা শোবেন কখন। আমাদের এখানে সকাল সকাল শোওয়াই নিয়ম"

"বেশ তো, বলেন তো এখনি যেতে পারি"

সান্ত্বনা ঝুঁকে ঝুনুকে কোলে তুলে নিলে। গোঁসাইজি শিউরে উঠলেন।

"ও কি, কুকুর নিয়ে যাচ্ছেন কোথা"

"শুতে"

"ও আপনার সঙ্গে শোবে!"

"হ্যাঁ, কেন"

"এক বিছানায় ?"

গোঁসাইজির কণ্ঠস্বরের গ্রাম দ্রুত পরিবর্ত্তিত হচ্ছিল।

"তাই তো শোয় বরাবর"

"আপনি ব্রজেশ্বরবাবু আর কুকুরটা সবাই এক বিছানায় শোয় বরাবর!"

"নিশ্চয়। এ কথা জিজ্ঞাসা করছেন কেন। আপনার আপত্তি আছে নাকি"

"আপত্তি আছে কিনা জিজ্ঞাসা করছেন!"

তার পর সুশোভনের দিকে প্রায় চীৎকার করে' জিজ্ঞাসা করলেন—"এই কুকুরটার সঙ্গে শোন আপনি!"

"আমি—মানে হঁ্যা, তা শুই বই কি। বাচ্চা বেলা থেকে পুষেছি কিনা—"

গোঁসাইজির দৃষ্টি থেকে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছুটে বেরুল। অষ্টধাতু-অঙ্গুরীশোভিত তর্জ্জনী তুলে বললেন—"এখানে শোবার ঘরে কুকুর নিয়ে যাওয়া চলবে না! এ খৃষ্টান হোটেল নয়, হিন্দু পান্থনিবাস। কোন ভদ্রলোক যে কুকুর নিয়ে এক বিছানায় শুতে পারেন তা ধারণারই অতীত ছিল আমার—"

সুশোভনের ধৈর্য্যরক্ষা করা এমনিতেই কঠিন হয়ে উঠেছিল, এ কথা শুনে সে ঈষৎ চটেই উঠল।

বলে উঠল—"আপনার ধারণার সীমা সম্বন্ধে কোনও কৌতূহল নেই আমাদের। আমাদের কুকুর নিয়ে শোয়াই অভ্যাস"

"অভ্যাস? এই ম্লেচ্ছ অভ্যাসের কথা জোর গলায় বলছেন আবার! আপনি একজন কংগ্রেসকর্ম্মী না? ও কথা বলতে লজ্জা করে না আপনার"

"কেন, কংগ্রেসকর্ম্মীর কুকুর নিয়ে শুতে বাধা কি"

"এই কি স্বদেশী আচরণ? যাই হোক আপনার সঙ্গে তর্ক করতে চাই না, আমার ঘরে আমি কুকুর ঢুকতে দেব না, সোজা কথা"

"অদ্ভুত হোটেল আপনার!"

"এটা হোটেল নয়, হিন্দু পান্থনিবাস—দয়া করে' মনে রাখবেন সেটা"

বেগতিক দেখে সান্ত্বনা বলল—"বেশ তো এত আপত্তি যখন, আপনার ঘরে না হয় না-ই নিয়ে গেলাম। কিন্তু ঝুনুসোনার শোবার ব্যবস্থা করে দিন একটু"

"ঝুনুসোনা! ওই কুকুরের নাম নাকি"

"হ্যাঁ। রাত্রে কোথায় রাখি একে"

"পিছনে একটা পোড়ো গোয়াল আছে তাতেই থাকতে পারবে স্বচ্ছন্দে"

"বেচারা!"

ঝুনুর দিকে একটা অগ্নিদৃষ্টি নিক্ষেপ করে' গোঁসাইজি বললেন, "গোয়ালের কোনে খড়ও আছে কিছু। খাসা থাকবে। আপনাদের বিছানায় ঢুকে গুঁতো-গুঁতি করার চেয়ে আরামে থাকবে। কি আপদ"

ঝুনুর লোমে হাত বুলিয়ে একটু আবদারের স্বরে সান্ত্বনা শেষ চেষ্টা করলে আর একবার।

"একা থাকা অভ্যেস নেই, কাঁদবে হয়তো"

"কাঁদুক। গোয়ালঘর থেকে ওর কান্না শোনা যাবে না"

"আমাদের ঘরের মেঝেতে যদি শোয়াই ?"

"না, শোবার ঘরে আমি কুকুর ঢুকতে দেব না। ফদকাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি, সে ওটাকে গোয়ালঘরে রেখে আসুক গিয়ে। আর আপনি অ্যাডমিশন রেজিস্টারে নাম সই করে' তবে শুতে যাবেন"

কমানো বাতিটা উসকে দিয়ে সুশোভনের দিকে চেয়ে গোঁসাইজি ফদকাকে ডাকতে গেলেন।

"দেখ সান্ত্বনা, বড় বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে কিন্তু। তোমার স্বামীর নাম আমি জাল করতে পারব না। সীমা অতিক্রম করছে"

"বেশ, আমিই লিখে দিচ্ছি। অর্দ্ধাঙ্গিনীর আশা করি স্বামীর নামে নিজেকে চালাবার অধিকার আছে, অর্দ্ধেক অধিকার অন্ততঃ থাকা উচিত আইনত"

"নিশ্চয়"

"খাতাটা কোথা—"

"এই যে। তবে আমি আর এক কাজ করলেও পারি। এমনভাবে হিজিবিজি করে' লিখে দিতে পারি যে কাউকে আর তা পড়তে হবে না"

"দরকার নেই, আমিই লিখে দিচ্ছি"

খাতাটা খুলে সান্ত্বনা লিখতে লাগল।

"ব্রজেশ্বর দে। তারিখ ১৮ই সেপ্টেম্বর—বাস্"

"নামের পর উইদিন ব্রাকেট লেখ কংগ্রেসকর্ম্মী। না লিখলে ভয়ানক কাণ্ড করবে"

সান্ত্বনা মুচকি হেসে তাও লিখে দিলে।

"রুম নম্বরের ঘরে কি লিখি ? নম্বর তো জানি না"

"চেপে যাও"

চেপে যাওয়ার কিন্তু উপায় রইল না। কলমটি রাখার সঙ্গে সঙ্গে গোঁসাইজি এসে প্রবেশ করলেন এবং প্রবেশ করেই ঝুঁকে অ্যাডমিশন রেজিস্টারটি পর্য্যবেক্ষণ করলেন। তার পর সুশোভনের দিকে ফিরে বললেন, "এই ঘরে লিখুন—টু। আপনাদের রুম নম্বর টু"

সুশোভন কলমটি তুলে ভালমানুষের মতো 'টু' লিখলে, তারপর সান্ত্বনার দিকে ফিরে সলজ্জভাবে হাসলে একটু।

"ওরে ফদকা, কোথা গেলি আবার, কুকুরটাকে গোয়ালে রেখে আয়। কামড়াবে না তো"

"না, ঝুনু ভারী লক্ষ্মী। আহা বেচারীকে কোথায় পাঠাচ্ছেন নির্ব্বাসনে"

বলা বাহুল্য সান্ত্বনার ঈষৎ অনুনাসিক আবদারমাখা এই অনুযোগে গোঁসাইজি বিন্দুমাত্র বিচলিত হলেন না।

ফঁদকা এসে ঝুনুকে নিয়ে চলে গেল। গোঁসাইজি ধূমাঙ্কিত হ্যারিকেনটি সুশোভনের দিকে তুলে ধরে' বললেন, "এবার তাহলে শুয়ে পড়ুন আপনারা। এটা নিয়ে যান, কমিয়ে রেখে দেবেন, তেল বেশী নেই। আপনারা ওঠেন ক'টায়?"

"আজ বোধহয় দেরি হবে উঠতে। সমস্ত দিন পরিশ্রান্ত আছি কিনা"

"শুয়ে পড়ুন তাহলে, আর দেরি করবেন না"

হরিমটর হিন্দু পান্থনিবাসের রুম নম্বর 'টু'টি গঠনশিল্পের একটি অদ্ভুত নিদর্শন বলে' মনে হল সুশোভনের। দ্বারটি সঙ্কীর্ণ। এত সঙ্কীর্ণ যে দু'জন লোকের পক্ষে পাশাপাশি ঢোকা অসম্ভব। জানালাগুলি চতুষ্কোণ ঘুলঘুলি বিশেষ। কিন্তু কোনও

অজ্ঞাত এবং অদ্ভুত উপায়ে এই ঘরের মধ্যেই বৃহদাকৃতি এত আসবাবপত্র সমাবিষ্ট হয়েছে যে মেজে বলে' কোনও কিছু আর অবশিষ্ট নেই। যা আছে তা খাট, আলমারি, ড্রেসিং-টেবল প্রভৃতির মাঝে মাঝে গলির মতো জায়গা। সম্ভবতঃ আসবাবপত্রগুলি খণ্ডীকৃত অবস্থায় ঘরে ঢুকিয়ে তারপর ফিট করা হয়েছিল। কিন্তু সেগুলির নিরেট চেহারা দেখলে সে সম্ভাবনার কথাও মন থেকে তিরোহিত হয়ে যায়। মেজের অধিকাংশ স্থানই দখল করে' আছে জগদ্দল একটি ছাপ্পর খাট। মজবুত কাঁটাল কাঠের তৈরি। খাটের উপর একটি গদি, গদির উপর একটি পাংশুবর্ণের চাদর। গদিটির প্রকৃত অবস্থা যে কি তা চাদর না তুলেই স্থানে স্থানে উটের পিঠের মতো উঁচুউঁচু ঢিবিগুলি দেখেই বোঝা যাচ্ছিল বেশ। দেওয়ালে ছবি ছিল। ক্যালেণ্ডার থেকে কেটে নেওয়া দেব-দেবী মূর্ত্তি। বিছানার শিয়রের দিকে মজবুত-ফ্রেমে-বাঁধানো অন্য আর একটি বেশ বড় ছবিও ছিল অবশ্য— রুদ্রমূর্ত্তি দুর্ব্বাসা শকুন্তলাকে অভিশাপ দিচ্ছেন।

সুশোভন এবং সান্ত্বনা পরস্পরের দিকে নীরবে চেয়ে রইল খানিকক্ষণ, তারপর একসঙ্গে হেসে উঠল দু'জনেই। সুশোভন ব'লে উঠল—"বাপস্, শুতে এসেও নিস্তার নেই, শিয়রের কাছে ওই দুর্ব্বাসা তর্জ্জনী তুলে দাঁড়িয়ে থাকবে। কি সর্ব্বনাশ"

"শুনুন" সান্ত্বনা বললে, গোঁসাইজি শুয়ে পড়লেই আপনি নেমে যান আস্তে আস্তে। যে ঘরটায় আমরা খেলাম সেই ঘরেই রাতটা কাটিয়ে দিন কোনক্রমে। আশা করি আপনার খুব বেশী কষ্ট হবে না"

"তোমারও হবে না আশা করি। কিন্তু দেখ সান্ত্বনা, আমার খুব ভাল ঠেকছে না। ব্যাপার যদি গড়ায়, অনেক দূর পর্য্যন্ত গড়াবে কিন্তু"

"কি যে বলেন! এই পাণ্ডব-বর্জ্জিত দেশে আসছেই বা কে, আর এলেও এই হোটেলের খাতা উলটে দেখতেই বা যাচ্ছে কে। আর দেখলেই বা কি, আমি আমার স্বামীর সঙ্গে এখানে একরাত্রি কাটিয়ে গেছি এতে আশ্চর্য্য হবার কি আছে"

"কিন্তু ব্রজেশ্বরবাবু জানতে পারলে কি ভাববেন"

"কি আবার ভাববেন, আমাদের কাণ্ড শুনে বড় জোর হাসবেন একটু"

"দেখ ঠিক তো"

"এটা ঠিক যে আপনি যা ভয় করছেন সে রকম কিছু তিনি মনে করবেন না। ব্যাপারটা বুঝবেন"

সান্ত্বনা ঘাড়টা একদিকে হেলিয়ে স্থশোভনের দিকে চকিত দৃষ্টিপাত করে' গম্ভীরকণ্ঠে বললেন, "আশা করি অনীতা দেবীও বুঝবেন"

"অনীতা? হ্যাঁ নিশ্চয়ই, বাঃ নিশ্চয়ই সমস্ত শোনবার পর বুঝবেন বই কি"

"বাস তবে তো মিটেই গেল। ব্যাপার গড়ালেই বা"

স্থশোভন তবু যেন কেমন নিশ্চিন্ত হল না।

"কিন্তু ওই দুর্দ্দমনীয় ব্যক্তিটি—ওই জগঝম্প না কি নাম ভদ্রলোকের—"

"সদারঙ্গবাবু? ওর জন্যে ভাবনা নেই। এর পর দেখা হলে সব খুলে বলব ওঁকে। খুশী হবেন, ভারী আমুদে লোক—"

"আমার কিন্তু দেখে মনে হল, উনি ঠিক সেই জাতীয় বেকুব অথচ মহাপুরুষ লোক যাঁরা অস্থানে অকারণে অকার্য্য করে' অঘটন ঘটিয়ে বেড়ান। অর্থাৎ 'অ' এর অনুপ্রাস আরও অনুসরণ করলে বলতে হয় আস্ত একটি অজ। তাছাড়া আমার আর একটা সন্দেহ হচ্ছে, উনি অনীতা এবং অনীতার বাপের বাড়ীর লোকেদের চেনেন। মনে হচ্ছে…"

"অনীতার বাপের বাড়ীর লোকদের?"

সান্ত্বনার অধরে মৃদু একটা হাসির ঢেউ উঠেই মিলিয়ে গেল।

"তা চিনলেই বা ক্ষতি কি। ওর জন্যে আপনার চিন্তা নেই। সদারঙ্গবাবুকে সব খুলে বললে তিনি কি বুঝবেন না? সে ভার আমার উপর রইল"

"তোমার জন্যেই আমার চিন্তা" স্থশোভন বললে।

"চিন্তা করবার দরকার নেই তাহলে"—হেসে জবাব দিলে সান্ত্বনা—"আপনি বরং আস্তে আস্তে বেরিয়ে দেখুন একটু গোঁসাইজি শুলেন কি না। আমি আর দাঁড়াতে পাচ্ছি না, একটু হাত পা ছড়াতে পারলে বাঁচি"

কেবল স্থশোভন এবং সান্ত্বনাই যে সদারঙ্গবিহারীলালের সম্বন্ধে চিন্তা করছিল তা নয়, গোঁসাইজিও নিশ্চিন্ত ছিলেন না। বাইরের কপাটে তালা লাগিয়ে ভ্রূকুঞ্চিত করে' দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি ক্ষণকাল। কি মনে হওয়াতে তালাটা খুললেন আবার। কপাট খুলে গলা বাড়িয়ে বাইরের অন্ধকারের দিকে উৎকর্ণ হয়ে চেয়ে রইলেন। না, মোটরবাইকের কোনও শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। গোয়ালঘর থেকে ঝুনুর করুণ কণ্ঠস্বর ছাড়া আর কোনও শব্দ কানে এল না। কপাট বন্ধ করে' পুনরায় তালা লাগালেন এবং সম্ভবতঃ সম্পূর্ণ নিরাপদ হবার জন্য বৈঠকখানা ঘরটাতেও তালা লাগিয়ে, তালাটা টেনে দেখে চাবির গোছাটা নিয়ে উপরে উঠে গেলেন নিজের শোবার ঘরে।

(৯)

স্থশোভন সন্তর্পণে বাইরে এসে উৎকর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। খড়মের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। গোঁসাইজি উপরে উঠছেন। ঘরে ঢুকে কপাট বন্ধ করলেন। খিল দেওয়ার শব্দও পাওয়া গেল।

"ভদ্রলোক শুলেন বোধ হয় এবার, বুঝলে"—কপাটের বাইরে দাঁড়িয়ে নিম্নকণ্ঠে এইটুকু জানিয়ে স্থশোভন নীচে নেমে গেল।

সান্ত্বনা ইতিমধ্যে অন্য ব্যাপারে ব্যাপৃত হয়ে পড়েছিল। কাপড় চোপড় না ছেড়ে শুলে ঘুমই হয় না তার। যে স্থটকেসটি স্থশোভন বয়ে এনেছিল সেটি ফদকা দিয়ে গিয়েছিল শোবার ঘরে। তার থেকে কাপড় ব্লাউজ প্রভৃতি বার করে' পরিচ্ছদ-পরিবর্ত্তনের প্রাথমিক প্রক্রিয়াগুলি অর্থাৎ সেমিজের বোতাম-খোলা-জাতীয় কাজগুলি সবে শেষ করেছে, এমন সময় কপাটের কাছে খুট করে শব্দ হল। এক লাফে সে একটা আলমারির কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

"কে, সুশোভনবাবু"

হ্যাঁ। আসব ভিতরে ?"

"না। আসবেন মানে ?"

"গত্যন্তর নেই"

"থামুন একটু তাহলে"

"বেশ"

"গত্যন্তর নেই মানে ? বুঝতে পারলাম না"

"যে ঘরে আমরা খেয়েছিলাম সে ঘরে শোয়া যাবে না"

"কি যে বলেন"...সান্ত্বনার কণ্ঠস্বরে একটু উত্তাপ সঞ্চারিত হল যেন... "এঁর মধ্যেই কি করে' বুঝলেন যে শোয়া যাবে না। মিনিট তিনেকও তো হয় নি এখনও। চেষ্টা করে' দেখুন ঠিক ঘুমুতে পারবেন"

"হয়তো পারতাম। কিন্তু চেষ্টা করবার 'স্কোপ' নেই। গোঁসাইজি সে ঘরটিতে তালা লাগিয়ে চাবিটি নিয়ে শুতে গেছেন। সে চাবি এতক্ষণ বোধ হয় তাঁর বালিশের তলায়"

"ওমা, তাই নাকি ? মুসকিল হল তো। কোথায় শোবেন তাহলে"

"তাই তো ভাবছি"

"করতেই হবে যা হোক্ একটা ব্যবস্থা। এ ঘরে তো আসা চলবে না"

"কপাটটা খুলি একটু ? একটু..."

"না"

"কথা কইবার সুবিধা হত। আর কিছু নয়"

"কথা ক'য়ে কাটাবেন নাকি সারারাত"

"একটু খুলি কি বল। চোখ বুজে থাকছি না হয়। সামান্য একটু। খুলতে আপত্তি কি"

"না না, যতক্ষণ না বলি খুলবেন না। দাঁড়ান না একটু। আমি কাপড় ছাড়ছি"

"উঃ কি যন্ত্রণা"

অস্ফুট কণ্ঠে বললে স্থশোভন।

"সিঁড়ির উপরে গিয়ে একটু বস্থন না, দাঁড়িয়ে থাকতে কষ্ট হয় যদি"

"কতক্ষণ"

"মিনিট পাঁচেক"

"ঠিক করব কি করে", আমার হাতঘড়ি বন্ধ হয়ে গেছে"

"তাহলে এক থেকে পাঁচশ' পর্য্যন্ত গুন্থন বসে বসে"

"বল কি। ছেলেবেলায় উদ্দালকের গল্প শুনেছিলাম, তাই করলে দেখছি শেষ পর্য্যন্ত"

"কি যে ছেলেমান্থষি করছেন। বিপদের সময় মাথা ঠিক রাখুন"

"মাথা আমার ঠিকই আছে, তার জন্যে ভাবনা নেই"

"তাহলে অমন করছেন কেন, সিঁড়িতে বস্থন গিয়ে"

"কন্‌কনে ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে জোরে"

"সিঁড়ির উপরই কাটাতে হবে হয়তো আজ রাতটা। তবে ভিতরে এসে গল্প করতে পারেন একটু। একটু থামুন, আমি কাপড়টা ছেড়ে বিছানায় উঠে পড়ি তারপর আসবেন"

"গোঁসাইজি যদি হঠাৎ বেরিয়ে এসে দেখেন আমি সিঁড়ির উপর গুঁড়ি মেরে বসে' এক দুই গুণে যাচ্ছি, কি ভাববেন তিনি"

"ঢেউ দেখেই নৌকা ডোবাচ্ছেন কেন আগে থাকতে"

"নৌকোডুবির ব্যাপার যাতে না ঘটে, সেই চেষ্টাই তো করছি সকাল থেকে"

বিরক্ত হয়ে স্থশোভন সিঁড়ির উপর গিয়ে বসল। সিঁড়ির উপর বসে' একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে বেচারা। নৈশ-সমীরণ বাহিত হয়ে এই দীর্ঘনিশ্বাসটি যদি পূর্ব্বদিকে ভেসে যেত তাহলে আর একটি দীর্ঘনিশ্বাসের সঙ্গে হয়তো দেখা হত তার। কোলকাতায় তার বাড়ীর সিঁড়িতে বসে' অনীতাও ঠিক এই সময় দীর্ঘনিশ্বাস মোচন করছিল।

······সিঁড়িতে বসে' বসে' সুশোভনের বাঁ পাটায় থাল ধরে' গেল। একটু চটেই উঠে দাঁড়াল সে। এতক্ষণেও শোয়া হয় নি? হোক্ মেয়েমানুষ······ বিছানায় শুতে এত দেরি হবে······আশ্চর্য্য কাণ্ড! উঠে গিয়ে দুয়ারে নখ দিয়ে আঁচড়ালে। কড়া নাড়তে এমন কি টোকা মারতেও ভয় করছিল। গোঁসাইজি যদি উঠে পড়েন। সান্ত্বনার কোনও সাড়াই পাওয়া গেল না। তারপর কপাটটা একটু ফাঁক করতেই···

"থামুন, হয় নি এখনও। বসুন না গিয়ে আর একটু—"

"আমি এইখানেই অপেক্ষা করছি, তোমার যখন হবে বোলো"

"অত শব্দ কিসের"—পরমুহূর্ত্তেই প্রশ্ন করলে সে··· কি হল"

"আমি বিছানায় উঠছি। স্প্রিং দেওয়া গদি, তারই শব্দ"

"বাসন্তী শব্দ? বাবা!"

"বাসন্তী শব্দ মানে"

"বি-এ পাশ করেছ, স্প্রিং মানে বসন্ত জান না!"

"আসুন আপনি"

সান্ত্বনা বিছানার উপর বসে ছিল। চুলটি আঁচড়ে শাদা শান্তিপুরে শাড়িটি পরে' বেশ দেখাচ্ছিল তাকে। একটু সানুকম্প হাসি হেসে ডাগর চোখের দৃষ্টি তুলে সুশোভনের দিকে চেয়ে দেখলে সে। সুশোভনের দৃষ্টি থেকে বিচ্ছুরিত হল শিল্প-সমালোচকের কৌতূহল। বিছানার একপ্রান্তে অনাহূতই বসল গিয়ে সে।

"কাপড় ছেড়ে বেশ দেখাচ্ছে তোমাকে,"

"তা হয় তো দেখাচ্ছে, কিন্তু এই কথা বলতেই আসেন নি আশা করি"

"না, না, কথাটা মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ল। সত্যিই তোমায় মানিয়েছে ভালো। তোমার প্রসাধন-রুচি সরল হলেও শিল্পীজনোচিত—"

"সমস্ত দিনের এত দুর্গতির পরও আপনার রসবোধ অক্লান্ত আছে দেখছি। আমার কিন্তু ঘুম পাচ্ছে"

"বেশ তো ঘুমোও না, মানা করছে কে। সাদা শাড়িটা হঠাৎ ভাল লেগে গেল তাই বললাম। অনীতা কখ্‌খনো শাদা শাড়ি পরে না, ডগমগে রঙ ছাড়া পছন্দই হয় না তার। সেদিন একখানা শাড়ি কিনেছে মেরুন রঙের সোনালি জরির পাড়-বসানো। জমকালো ব্যাপার। বললে বিশ্বাস করবে না, দিগ্বিজয়-বাবুর ওখানে যাবে বলে ছ'খানা শাড়ি নিয়েছে সবগুলোই রঙীন, আর কোনটাই ফিকে রঙ নয়—"

সান্ত্বনা ঈষৎ ভ্রূকুঞ্চিত করে' ঘাড়টা কাত করলে একটু।

"একটা কথা আপনার মনে রাখা উচিত। অনীতা যা করে, আপনাকে খুশি করবার জন্যেই করে। তার এত মাথা-ঘামিয়ে শাড়ি পছন্দ করা যে এমন ভাবে মাঠে মারা গেছে তা বোধহয় বেচারি ঘুণাক্ষরেও জানে না"

সুশোভনের মুখের হাসি মিলিয়ে গেল। উসখুস করে' নড়ে' চড়ে' বসল সে।

"আমাকে কি তাহলে গোয়াল ঘরে গিয়ে ঝুনুর সঙ্গে শুতে হবে?"

"তাই যান তবে। এ ছাড়া আর উপায়ই বা কি আছে—"

সুশোভন নিজের ডান কানটা টানতে টানতে অভিনিবেশ সহকারে সান্ত্বনার মুখের দিকে চেয়ে রইল।

"আচ্ছা, ঘণ্টা খানেক কি ঘণ্টা দুই এই ঘরের মেজেতে যদি একটু গড়িয়ে নি—"

"কি যে বলেন—"

"আচ্ছা, এ কি কুসংস্কার তোমাদের! আমি তোমাকে 'কারে' 'লিফ্‌ট্' দিলে দোষ হয় না, তোমার সঙ্গে এক টেবিলে বসে খেলে দোষ হয় না, তোমার সঙ্গে এক বিছানায় বসতেও দোষ নেই। কেবল এই মেজেতে শুলেই চণ্ডী অশুদ্ধ হয়ে যাবে! আশ্চর্য্য! তোমার খাটের উপর পা তুলব না, সত্যি বলছি খাটের ত্রিসীমানায় যাব না"

"যা হয় না—হতে পারে না—তা নিয়ে কেন বৃথা সময় নষ্ট করছেন"

"কমরেডদের মধ্যেও হয় না? রাশিয়ায় তো হয় শুনেছি"

"এটা রাশিয়া নয়, বাংলা দেশ"

"ও"

সুশোভন নিষ্পলক দৃষ্টিতে চেয়ে রইল সান্ত্বনার দিকে। মাথার কাপড় সরে' গেছে খোঁপাটা এলিয়ে পড়েছে। লণ্ঠনের মৃদু আলোতে অদ্ভুত সুন্দর দেখাচ্ছিল তাকে। মনে হচ্ছিল একটা নিষ্ঠুর আনন্দে চোখ দুটো জলজল করছে তার। সত্যি ভারী সুন্দর দেখাচ্ছিল।

"আচ্ছা, চললাম তাহলে—"

"বিশ্বাস করুন, আপনার জন্যে খুব কষ্ট হচ্ছে আমার—"

"হ্যাঁ, তোমার মুখ দেখে তাই মনে হচ্ছে বটে—"

"কি করব বলুন উপায় নেই। সমাজে বাস করি যখন, লোকাচার মেনে চলতেই হবে"

"এখন এই ঘরে সমাজ কোথায়। ঘণ্টা খানেক বড় জোর ঘণ্টা দুই বিশ্রাম করলেই আমার—"

"না মাপ করুন সুশোভনবাবু। একবার এই করতে গিয়ে কি বিপদে পড়েছিলাম মনে নেই। আপনার তো মনে থাকা উচিত"

"ও হ্যাঁ হ্যাঁ মনে পড়ছে। বুঝেছি। আচ্ছা যাচ্ছি আমি। হ্যাঁ…ঠিক। কি বিপদ—আচ্ছা চলি—"

দ্বার পর্য্যন্ত গিয়ে থমকে দাঁড়াল সে আবার। তারপর হেসে বললে—"তখন আর এখনে কিন্তু তফাত আছে অনেক। এখন আমি তুমি এবং ব্রজেশ্বরবাবু ছাড়া এ নিয়ে মাথা ঘামাবার কারও অধিকার নেই"

"কেন অনীতার ?"

"হ্যাঁ অনীতারও অবশ্য আছে"

"দেখুন যুক্তি দিয়ে এসব ব্যাপারের মীমাংসা হয় না। আপনি যুক্তির অবতারণা করে' স্বচ্ছন্দে বলতে পারেন আমি যদি শুধু সেমিজ পরে হ্যারিসন

রোড দিয়ে হেঁটে যাই কার কি বলবার থাকতে পারে। কিন্তু পাঁচজনের মুখ বন্ধ হবে না তাতে”

“সত্যি যদি সাহস করে’ যাও, আমার মনে হয় না এ নিয়ে খুব একটা আন্দোলন করবে লোকে—”

সান্ত্বনা মুচকি হেসে বললে—“আপনার শোবার কষ্ট হল তার জন্যে খুবই দুঃখিত আমি। আর ওই মেজেতে শুলেই কি আরাম পাবেন আপনি? ওর চেয়ে গোয়াল ঘরে শোয়া ঢের ভাল।”

সুশোভন ঘরের চার দিকে চেয়ে দেখলে একবার।

“আমার বিশ্বাস এখানে শুলে একটু ঘুম হত। একটা ‘রাগ’ আর একটা বালিশ পেলে বেশ একঘুম দিয়ে নিতে পারতাম ওই কোণের দিকটায়”

“ ‘রাগ’ আর বালিশ দিচ্ছি আপনাকে। ওগুলো নিয়ে আপনি গোয়ালেই যান, সেখানেও বেশ ঘুমুতে পারবেন”

“অনেক ধন্যবাদ। কিন্তু শব্দটব্দ শুনে গোঁসাইজি যদি উঠে আসেন, তাহলে বালিশ-বগলে আমাকে ঝুনুর কাছে দেখে ভাববেন কি”

“কি আবার ভাববেন”

“একটা কথা ভুলে যাচ্ছ কেন যে গোঁসাইজির চক্ষে আমরা স্বামী-স্ত্রী। যদি ঘুণাক্ষরে প্রকাশ হয়ে পড়ে যে আমরা তাঁর সঙ্গে চাতুরী খেলছি তাহলে দু’জনকেই এই রাত্রে রাস্তায় গিয়ে দাঁড়াতে হবে। কিছু শুনবে না লোকটা। অ্যাডমিশন রেজিস্টারে আমরা স্বামী-স্ত্রী বলে’ নাম সই করেছি। আর সেই ভদ্রলোক—গুম্ফ গোবিন্দ না কি যেন—”

“সদারঙ্গবিহারীলাল?”

“হ্যাঁ, তিনি আমাদের স্বামী-স্ত্রী বলে’ জেনে গেছেন। জানাজানি হয়ে গেলে তোমার স্বামীর কাছে যে এর কি জবাবদিহি করব জানি না”

“সে আমি করব। আপনাকে করতে হবে অনীতা দেবীর কাছে”

সুশোভনের দীর্ঘনিশ্বাস পড়ল একটা।

"ব্রজেশ্বরবাবু আর অনীতা এ দু'জনের সম্বন্ধে যদি আমাদের চিন্তা না থাকে তাহলে আর কে কি মনে করবে তা নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার কি। আর এতক্ষণ আমরা যা করেছি তাতে ওরা যদি কিছু মনে না করে তাহলে আমার মেজেতে শোয়াটাও ওরা আশা করি অনুমোদন করবে। ওরা অমানুষ নয় তো। নিতান্ত বাধ্য হয়ে যে একাজ করেছি তা বোঝবার মতো সহৃদয়তা ওদের নেই? ওই ড্রেসিং টেবিলের তলায় মাথা গুঁজে আর ছাপ্পর খাটের তলায় পা চালিয়ে শোয়াটা যে আরামের নয় তা কি ওরা বুঝবে না? নিতান্ত বাধ্য হয়েই শুতে হচ্ছে। স্বপ্নের ঘোরে জখমও হয়ে পড়তে পারি; হাসছ কি, খুবই সম্ভব সেটা।"

সান্ত্বনা মুচকি মুচকি হাসছিল।

"উনি অবশ্য কিছু মনে করবেন না।"

"বাস তাহলে তো হয়েই গেল। আমার স্ত্রীর ঝক্কি আমি সামলাব।"

"উনিও মোটেই কানপাতলা লোক নন। তাছাড়া আমার যাতে কষ্ট হতে পারে এমন কোন কাজ মরে গেলেও করবেন না উনি। আড়ালেও আমার সম্বন্ধে কখনও কোন কটু মন্তব্য করেন না।"

"আমিও করি না। অনীতাকে আমি যত ভালবাসি এত বোধহয় কোন স্বামী তার স্ত্রীকে বাসে না। সত্যি বলছি বড্ড ভালবাসি। যাক্ বালিশ আর 'রাগ' দাও তাহলে, চেষ্টা করে' দেখি ঘুম হয় কিনা—"

"কপাটে খিল দিন"

খিল দিতে গিয়ে সুশোভন আবিষ্কার করলে যে খিলটি ভাঙা।

"ভালই হয়েছে এক হিসেবে"

মুচকি হেসে সান্ত্বনা পাশ ফিরে শুল।

* * * * * *

"সুশোভনবাবু"

"অ্যাঁ—কি"

"ঘুমুচ্ছেন ?"

"কেন"

ড্রেসিং টেলিলের তলা থেকে সন্দিগ্ধকণ্ঠে উত্তর দিল স্থশোভন।

"কিছু মনে করবেন না, জানালাটা যদি খুলে দেন দয়া করে'। আমি শোবার সময় খুলতে ভুলে গেছি"

"জানালা খুলে কি হবে! হু হু করে' হিম ঢুকবে যে ঘরে। আমাকে মেরে ফেলতে চাও নাকি"

"সব জানালা বন্ধ। বাইরের হাওয়া একটু ঢোকা দরকার"

"ঘরে যা হাওয়া আছে তাই তো যথেষ্ট মনে হচ্ছে আমার। আবার বাইরের হাওয়া কেন"

"জানালা খুলে না শুলে সকালে মাথা ধরে থাকে আমার। খুলে দিন লক্ষ্মীটি"

"ও। আচ্ছা দিচ্ছি তাহলে। দাঁড়াও উঠি আগে। রীতিমত কসরৎ করতে হবে। এই ড্রেসিং টেবিলের তলা থেকে মাথাটা বার করাই মুস্কিল, তারপর আলমারির তলা থেকে হাতটা—"

জানালা খুলে মিনিট দুই পরে স্থশোভন আবার মেঝের উপর এসে বসল, অস্ফুটস্বরে গজগজ করতে করতে হাত থেকে ধূলা ঝাড়লে, তারপর নিজের ওভারকোটটি গায়ে দিয়ে ড্রেসিং টেবিলের তলায় মাথা গলিয়ে শুয়ে পড়ল আবার। মনে হল সান্ত্বনা নিদ্রাজড়িতকণ্ঠে 'ধন্যবাদ' না কি একটা বললে। তারপর নীরবতা ঘনিয়ে এল আবার, সান্ত্বনার মৃদু নিশ্বাসের শব্দ ছাড়া আর কোনও শব্দ নেই। হঠাৎ নৈশ নীরবতা বিদীর্ণ করে' ঝুনুর করুণ আর্ত্তনাদ শোনা গেল। ওই আবার! থামছে না—চলেইছে একটানা—।

"স্থশোভনবাবু"

"কি"

"শুনতে পাচ্ছেন? মরে যাই মাণিক আমার"

"আমাকে বলছ ?"

"ঝুনুর ডাক শুনতে পাচ্ছেন না ? আহা বেচারি"

"কই না"

"পাচ্ছেন না ? ওই যে"

"ও প্যাচা ডাকছে"

"কি যে বলেন। ঝুনু কাঁদছে। আহা, কি যে করি"

"জানালাটা বন্ধ করে' দেওয়া ছাড়া আর কি করা যেতে পারে"

"না, না। বেচারী সমস্ত রাত ওই রকম করে' কাঁদবে, আর আমরা চুপচাপ শুয়ে থাকব এখানে—"

সুশোভন উঠে বসল।

"ওর কান্না বন্ধ করবে কি করে' বল। ও চেঁচাবেই। কুকুরের স্বভাবই ওই"

তারপর অস্ফুটকণ্ঠে বললে "লক্ষ্মীছাড়া কুকুর"

"উনি হলে ঠিক উঠে গিয়ে নিয়ে অসেতেন"

"আমি 'উনি' হলে এই ঠাণ্ডা মেঝেতে শুয়ে আমার শিরদাঁড়া এমন জখম হত না"

"সুশোভনবাবু, উঠুন, যান লক্ষ্মীটি"

"যেতাম। কিন্তু যাবার উপায় নেই"

"কেন, এই একটু আগেই তো আপনি ওখানে শুতে যেতে চাইছিলেন"

"চাইছিলাম কিন্তু পারতাম না। আমি হলপ করে' বলতে পারি এখন ওই খিড়কি দুয়ার পেরিয়ে গোয়ালঘরে যাওয়া যাদুকর পি. সি. সরকারের পক্ষেও অসম্ভব"

"কেন, বড়জোর খিল দেওয়া আছে—"

"দেখ যে লোক বৈঠকখানায় ডবল তালা লাগাতে পারে সে নিশ্চয় খিড়কিতে এলার্ম লাগিয়েছে"

"শুনুন, আহা কি কান্নাটাই কাঁদছে বেচারি। ছি, ছি, এত নিষ্ঠুর আপনি। বোবা জানোয়ারের প্রতি দয়া হচ্ছে না একটু—"

"ওর নাম বোবা জানোয়ার!"

"আপনি যদি না যান আমাকে উঠতে হবে। ওর কান্না শুনে স্থির থাকতে পারব না"

সুশোভনকে উঠতে হল। জুতো পরে জামা গায়ে দিয়ে বারান্দা থেকে কমানো লণ্ঠনটি তুলে নিয়ে নেবে গেল সে। নাবতে নাবতে তার মনে হল—অনীতার কুকুরের শখ নেই, আর যাই থাক! উঃ—!

(১০)

খিড়কির দরজার সামনে সুশোভন এসে দাঁড়াল। লণ্ঠন তুলে দেখলে একটা নয় দুটো ছিটকিনি। উপরে একটা, নীচে একটা। লোহার ছিটকিনি। নীচেরটা হল-হলে গোছের, একটা আঙুল দিয়েই তোলা গেল। কিন্তু এত বেশী হল-হলে যে একটুতেই পড়ে যাচ্ছে, আর এমন একটা খড়-খড় আওয়াজ করছে যে বিরক্তিকর। শুধু বিরক্তিকর নয়, আশঙ্কাজনকও। গোঁসাইজির ঘুম ভেঙে যেতে পারে। উপরের ছিটকিনিটি আবার ঠিক বিপরীত, এমন আঁট যে মনে হচ্ছে রিপিট করা আছে। সুশোভনের বাঁ হাতে লণ্ঠন ছিল, ডান হাত দিয়ে প্রাণপণে চেষ্টা করেও সে ছিটকিনিটিকে এক চুলও সরাতে পারলে না। তখন লণ্ঠনটা মাটিতে রেখে এক হাত দিয়ে কপাটটা চেপে ধরে' দাঁতে দাঁত দিয়ে খুব জোরে হ্যাঁচকা টান মারলে একটা। ক্যাঁ…চ্ করে' বিরাট একটা আওয়াজ হল কিন্তু খুলল না। অর্দ্ধেকটা খুলে থেকে গেল। আলোটাও নিবে গেল দপদপ করে'। সুশোভন আলেটা তুলে নেড়ে দেখলে তেল নেই। তারপর উপরে তেতালার দিকে চেয়ে দেখলে কারও ঘুম ভেঙেছে কিনা। না, ভাঙে নি। পকেটে দেশলাই ছিল তাই বার করে জাললে। বাঁ হাতে জলন্ত কাঠিটা নিয়ে আর একবার টান দিলে ছিটকিনিটাতে। নড়বার কোনও লক্ষণ নেই, মনে হল 'জাম' হয়ে এঁটে বসেছে আরও। বাঁ হাতের আঙুলে ছ্যাঁকা লাগতেই ফেলে দিতে

হল দেশলাই কাঠিটা। আঙুলে ফুঁ দিতে দিতে ভাবতে লাগল কি করা যায়। কুকুরের একটা হিল্লে না করে' সান্ত্বনার কাছে ফেরা যাবে না। ছিটকিনি খুলতেই হবে যেমন করে' হোক্। হঠাৎ মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল। পকেট থেকে রুমাল বার করে' রুমালটা ছিটকিনিতে বেঁধে ঝুলে পড়ল সেটা ধরে' সে। ক্যাঁ…চ্ খটাৎ…ভীষণ শব্দ করে' খুলে গেল। যাক্ উপরের দিকে আবার চেয়ে দেখলে। না, গোঁসাইজির নিদ্রাভঙ্গ হয় নি। কপাটটা খুলে বেরিয়েই স্থশোভনের পা পড়ল ন্যাতার মতো একটা জিনিসের উপর। দেশলাই জেলে দেখলে জায়গাটা আঁস্তাকুড় গোছের। ভাঙা টিন, তরকারির খোসা, কাগজের টুকরো, গোবর ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত। রান্নাঘরের জলও বোধহয় পড়ে এইখানে। স্যাঁৎস্যাঁৎ করছে চতুর্দ্দিক। আবার একটা দেশলাই কাঠি জেলে সেটা তুলে ধরে' স্থশোভন দেখলে…সর্ব্বনাশ, সামনে আর একটা দেওয়াল এবং তাতে আর একটা কপাট। মনে হল এইটেই বোধহয় আসল খিড়কি। এটা পার হতে পারলে তবে গোয়ালঘরে পৌছনো যাবে। ভাগ্যক্রমে এ কপাটের ছিটকিনি সহজে খোলা গেল। বিশেষ বেগ পেতে হল না। কপাট খুলে বেরিয়েই গোয়ালটা পেলে। ঝুনুর আওয়াজ স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে। বৃষ্টি স্থরু হল ঝির ঝির করে'। কনকনে হাওয়া তো ছিলই। রুমালটা মাথায় দিয়ে দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালতে জ্বালতে গোয়ালটার দিকে অগ্রসর হল স্থশোভন। ছাপ্পর-খাট-শায়িতা কম্বলাবৃতা সান্ত্বনার ছবিটা অনিবার্য্যভাবে ফুটে উঠল মনের উপর। কি অদ্ভুত মেয়ে। একটু আগে তার শয্যাপ্রান্তে বসে' তার ছিমছাম ঘরোয়া মূর্ত্তি দেখে একটু অভিভূত সে যে হয় নি তা নয়। বিলাসী, জেদি, 'খর্চে' অনীতার সঙ্গে তুলনা করে' সান্ত্বনার সাদাসিধে ভাবটা ভালই লেগেছিল তার। কিন্তু স্থশোভনের মনে পড়ল সান্ত্বনাও এককালে কম করে নি। সেই লেখক-ঘটিত ঘটনাটা ঘটে যাবার পর থেকেই ও বদলে গেছে এবং তারপর বোধহয় আবিষ্কার করেছে যে সাদাসিধে চাল-চলনই ভাল। একটু আগে—সত্যি কথা বলতে কি—সান্ত্বনার ধীর স্থির শান্ত গার্হস্থ্য লক্ষ্মীশ্রী দেখে এবং অনীতার উদ্দাম

প্রকৃতির সঙ্গে তার তুলনা করে' সুশোভনের মনটা সান্ত্বনার দিকেই ঝুঁকেছিল একটু। কিন্তু এখন সে দ্রুত হৃদয়ঙ্গম করছিল এইসব লক্ষ্মী-শ্রী-মার্কা স্ত্রীদের স্বামী হওয়া কি সঙ্গীন ব্যাপার। তাকে স্বেচ্ছায়, শুধু স্বেচ্ছায় নয়, সানন্দে, এই ঠাণ্ডায় অন্ধকার রাত্রে বৃষ্টি মাথায় করে' লক্ষ্মীছাড়া একটা কুকুরের সন্ধানে বেরুতে হবে! কি রকম দাম্পত্য-জীবন এদের? ভদ্রহাসি-মাখানো শাস্ত্রীয় মাধুর্য্যের একঘেয়ে পুনরাবৃত্তি ছাড়া আর কি! না, তার অনীতা ঢের ভাল এর চেয়ে। উদ্দাম জেদি আবদেরে বদরাগী কিন্তু প্রাণ আছে, বৈচিত্র্য আছে—আর এতটা অবুঝ স্বার্থপরও নয়। অনীতা কখনও তাকে এমনভাবে কুকুর আনতে পাঠাতো না। কখনও না।

কিন্তু সান্ত্বনার সঙ্গে—সেই সেকালের কমরেড সান্ত্বনার সঙ্গে—একরাত্রি কাটানোর অভিজ্ঞতা নিতান্ত মন্দও লাগিল না সুশোভনের। বেচারি! কি বদনামটাই রটিয়েছিল সবাই ওর নামে। তারই চাপে বোধহয় গৃহলক্ষ্মীটি হয়ে গেছে একেবারে। এরকম আরও দেখেছে সে। বিয়ের আগে যে সব মেয়েরা খুব বেশী প্রগতিশীলা থাকে বিয়ের পর আর চেনা যায় না তাদের। একেবারে সটান তুলসীতলা আশ্রয় করে তারা। সান্ত্বনার উপর কেমন যেন একটা সহানুভূতি হচ্ছিল তার।

এইবার ঝুনুর খোঁজ করা যাক্।

ঝুনুর কান্না শোনা যাচ্ছিল, তার কারণ গোয়ালের কপাটটা খোলা ছিল। সুশোভন কপাটের কাছে উঁকি মেরে দেখবার চেষ্টা করলে একটু। কিছু দেখা গেল না। খড়ের খড়-খড় শব্দ আর ঝুনুর আর্ত্তনাদ ছাড়া শোনাও গেল না কিছু। সুশোভন ভিতরে ঢুকে দেশলাই জাললে। সুশোভনকে দেখে ঝুনু হাহাকারের সঙ্গে সম্বর্দ্ধনাসূচক একটা হর্ষোচ্ছ্বাস মিশিয়ে অদ্ভুত ধরনের শব্দ করতে করতে এগিয়ে এল। সুশোভন হাতটা বাড়িয়ে দিতে চাটলে দু' একবার ভয়ে ভয়ে। আহা, আপাদমস্তক থর থর করে' কাঁপছে। লোমগুলো পর্য্যন্ত খাড়া হয়ে উঠেছে। বেঁড়ে ল্যাজের কাছটায় খুব জোরে জোরে অদ্ভুত ধরনে নড়ছে। করুণ দৃষ্টি তুলে

সুশোভনের দিকে একবার চেয়ে তারপর সভয়ে এদিক ওদিক চাইতে লাগল। চীৎকার বন্ধ করেছিল, কিন্তু তার বদলে এমন একটা অনুনাসিক কোঁতানি আরম্ভ করলে যা অতিশয় শ্রুতিকটু।

"চুপ কর"

"কুঁই-কুঁই কুঁক-কুঁক"

ভয়ে ভয়ে চাইতে লাগল এদিক ওদিক। সুশোভনকে বিশ্বাস করতে পারছিল না ঠিক।

"চুপ কর"

সুশোভন ডান হাত দিয়ে আস্তে আস্তে গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল তার। কুকুর যে এ রকম ছিঁচকাঁদুনে হতে পারে তা সুশোভনের ধারণার অতীত ছিল। হঠাৎ ভেউ ভেউ করে' কেঁদে উঠল ঝুনু।

"চুপ কর বলছি, মারব না হলে—"

সুশোভন যে-ই একটু হাত তুলেছে ঝুনু "কেঁউ" করে' বেরিয়ে গেল একছুটে অন্ধকারের মধ্যে।

"আরে, এ কি হল"

কপাটের দিকে তাড়াতাড়ি এগিয়ে এল সুশোভন।

"আঃ আঃ চু চু চু"

টুসকি দিতে লাগল। কোন ফল হল না। বেরুতে হ'ল গোয়াল থেকে। বৃষ্টিও নামল বেশ জোরে।

"আয় আয় ঝুনু—আঃ—আঃ…"

নাতি-উচ্চ কণ্ঠে ডাকতে ডাকতে অন্ধকারে এগুচ্ছিল, হুড়মুড় করে' হোঁচট খেলে। একটা প্রকাণ্ড গামলা গোছের কি ছিল, গরুর জাবখাওয়াবার ডাবা বোধ হয়।

"ঝুনু ঝুনু, আয় বলছি। এস লক্ষীটি। মারব না, কিচ্ছু বলব না, আঃ

আঃ। আয় না—উঃ কি লক্ষ্মীছাড়া কুকুর বাবা—ধরতে পারি যদি একবার। ঝুনু—ঝুনু”

দূরে বহুদূরে সর্ষে-ক্ষেতের ভিতর ছুটতে ছুটতে একটা খেজুর গাছের গুড়িতে ধাক্কা খেয়ে 'কেঁউ' করে' উঠল ঝুনু। সেইদিকে ঘাড় ফিরিয়ে সুশোভন চেয়ে রইল খানিকক্ষণ। আপাদমস্তক রি-রি করে' উঠল রাগে। কিন্তু করবারই বা কি আছে! এগুতে হল। শব্দটা যে দিক থেকে এল সেই দিকেই অগ্রসর হতে লাগল সে হন-হন করে'। আবার হোঁচট খেয়ে পড়ল কিসের উপর একটা। তলপেটে গুঁতো লাগল। টিউব ওয়েলের পাম্প নাকি এটা! আর একটু গিয়ে আবার হোঁচট—আর একটা পিপে। ঝন ঝন শব্দ করে' টিনও পড়ে গেল একটা। সমস্ত জায়গাটা জব জবে ভিজে পা বসে যাচ্ছে। সেখানটা অতিক্রম করতে গিয়ে আর একবার ঠোক্কর খেতে হল, শান-বাঁধানো জায়গা ছিল একটা সামনেই। বোধহয় স্নান করবার জায়গা। একটা ঝাঁটা পায়ে ঠেকল, লাথি মেরে সরিয়ে দিলে সেটাকে। তারপর সে দাঁড়াল একটু। এ কোথায় এসে পড়ল। আর তো কোন শব্দও পাওয়া যাচ্ছে না। চতুর্দ্দিক অন্ধকার। একটা গাছের ডাল থেকে ফোঁটা কয়েক জল পড়ল টপ টপ করে' নাকের ডগায়। সরে' দাঁড়াতে হল।

“উঃ কি ফ্যাসাদে পড়লাম। এর পর যদি কুকুরটাকে ধরতেও পারি, কি যে হবে তা দিব্য চক্ষে দেখতে পাচ্ছি। ওই ভিজে কুকুরকে সান্ত্বনা কিছুতেই বিছানায় উঠতে দেবে না, আমাকেই ওকে নিয়ে মেজেয় শুতে হবে, শুয়ে ঘুম পাড়াতে হবে। ধরতে পারলে হয়, জন্মের মতো ঘুম পাড়িয়ে দেব একেবারে। “ঝুনু—আঃ—আঃ—ঝুনু-ঝুনু-ঝুনু-ঝুনু-ঝুনু-ঝুনু—”

কোনও সাড়াশব্দ নেই। আর একটু এগিয়ে সুশোভন দেখলে একটা বেড়া রয়েছে। তারের বেড়া। এর ওপারেই মাঠ। মাঠে পুঞ্জীভূত অন্ধকার। বেড়াটায় ভর দিয়ে উৎকর্ণ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সে। বৃষ্টির শব্দ ছাড়া আর শব্দ নেই।

বেড়াটায় ঠেস দিয়ে সুশোভনের মনে হল আর পারছে না সে। সীমা অতিক্রম করেছে এবার। এর চেয়ে দুরবস্থা আর হতে পারে না, হওয়া সম্ভবই নয়। ওই গোয়ালে ঢুকেই শুয়ে পড়া যাক। থাকুক গোবরের গন্ধ, ওই খড়ের গাদায় শুয়ে রাতটা কেটে যাবে কোনক্রমে। ভাবলে বটে কিন্তু যেতে পারলে না। দাঁড়িয়ে রইল চুপ করে'। কোলকাতায় তার নিজের বিছানার কথা মনে পড়ল, ধপধপে সাদা চাদর, ঝালর-দেওয়া বালিশ, নেটের মশারিটি ফেলে অনীতা শুয়ে আছে। কল্পনা করেও যেন আরাম হল একটু। কিন্তু একটা কথা সহসা হৃদয়ঙ্গম করে' একটু দমেও গেল সে। এ সমস্তের জন্যে সে ছাড়া আর কেউ দায়ী নয়। রাগ পড়ে' গেল। একটা শূন্য বিমর্ষভাব খাঁ-খাঁ করতে লাগল সারা বুক জুড়ে। ঘুমও পাচ্ছিল খুব···। বেড়াটা পেরিয়ে খুঁজে দেখবে নাকি আর একটু? কিন্তু আর পারছিল না সে। আর এতে লজ্জারই বা কি আছে। ফিরে গিয়ে সত্যি কথাটা বললেই চুকে যাবে। ঘুম না হয় নাই হবে। ঘুম হবেই না বা কেন, নিশ্চয় হবে, সমস্ত শরীর ভেঙে পড়ছে ক্লান্তিতে।

কিন্তু না, তার মনের অন্তরতম প্রদেশে আর একটা কি যেন খচখচ করছিল। কি সেটা? সে এমন কিছুই করেনি এখনও পর্য্যন্ত যা অন্যায়, যাতে অনীতার ন্যায়ত রাগ হতে পারে। ব্যাপারটা বুঝিয়ে বললে অনীতা বুঝবেই নিশ্চয় শেষ পর্য্যন্ত। কিছুই তো করে নি সে। কিন্তু তার মনের এই বিমর্ষভাবের সঙ্গে অনীতাই যে নিগূঢ়ভাবে জড়িত এ ধারণাটাও সে ত্যাগ করতে পারছিল না কিছুতে···।

"ঠিক"—হঠাৎ মনে হল তার—"আসলে অনীতার জন্যে মন কেমন করছে। মানে বিরহ"

"হ্যাঁ, বিরহই। নিজের বান্ধবীদের কাছে যে অনীতার বুদ্ধি সম্বন্ধে নানা সমালোচনায় সে পঞ্চমুখ সেই অনীতাকে বিয়ের পর এক রাত্রিও ছেড়ে থাকে নি সে। নিজের বুদ্ধিতে চলতে গিয়ে তো এই হয়েছে—পরের স্ত্রীর কুকুরের পিছু পিছু ছুটে একটা হতভাগা হোটেলের পিছনে মাঠে দাঁড়িয়ে ভিজতে হচ্ছে

রাত দুপুরে। অনীতার সম্বন্ধে সে আবার সমালোচনা করতে গেছে সান্ত্বনার কাছে!

অনীতার মেজাজটা অবশ্য একটু কড়া। কিন্তু ওই অনীতাকেই তো সে ভালবেসেছিল। ওই অম্লমধুর অনমনীয়াকেই তো সে জয় করেছিল একদিন। আহা, তার এই মুহূর্ত্তের বিগলিত মনোভাবের খবরটা যদি অনীতা পেত কোনক্রমে—একরাত্রি তাকে ছেড়ে কি রকম মন কেমন করেছিল তার—তাহলে তার কড়া মেজাজ নরম হয়ে যেত ঠিক।

সান্ত্বনা বড্ড বেশী নরম—একটা কুকুরের জন্যেই হেদিয়ে মরছে। চুলোয় যাক্ তার কুকুর। হোটেলের দিকে ফিরল সে মরীয়া হয়ে। পত্নী-নিষ্ঠা, স্বামীর নিষ্কলুষ চরিত্র-মাধুর্য্য প্রভৃতি উচ্চাঙ্গের ভাবে তার সমস্ত চিত্ত তখন পরিপূর্ণ। যথাসম্ভব কম শব্দ করে' দু'টি দুয়ারের ছিটকিনি বন্ধ করলে, বলাবাহুল্য প্রথম দুয়ারের উপরের ছিটকিনি স্পর্শ পর্য্যন্ত করলে না। লণ্ঠনটি তুলে নিয়ে অতি সন্তর্পণে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতে লাগল। কাঠের সিঁড়ি—ক্যাঁচ্-কোঁচ্ একটু আধটু শব্দ নিবারণ করা গেল না কিছুতে। উপরে উঠে সিঁড়ির উপর বসে' ভিজে জুতো দুটো খুলে ফেললে সে সর্ব্বাগ্রে। ইস্, জলে কাদায় মাখামাখি হয়ে গেছে একেবারে। জুতো খুলে ঘরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ইতস্ততঃ করতে লাগল সে একটু। এইবারই তো—। উপরের ঘরে (মানে গোঁসাইজির ঘরে) খুটখাট শব্দ শোনা গেল দু', একবার। চকিতে উপরের দিকে একবার চেয়ে নিঃশব্দে কপাট ঠেলে ঢুকে পড়ল সে ভিতরে। সান্ত্বনার কোনও সাড়াশব্দ নেই। দেশলাই জ্বাললে, তবু সান্ত্বনার কোনও সাড়া নেই। হঠাৎ নজরে পড়ল একটা তাকের এককোণে মোমবাতি রয়েছে একটা। হেডমাস্টারের সম্পত্তি, বোধহয় তাড়াতাড়িতে ফেলে গেছেন ভদ্রলোক। চট্ করে' মোমবাতিটা তুলে জ্বেলে ফেললে সে।

বালিশে মাথাটি রেখে সান্ত্বনা ঘুমুচ্ছে—বেশ আরামেই ঘুমুচ্ছে বলে' মনে হল —অধরে শান্ত প্রসন্ন হাসি। মাথাটা একদিকে সামান্য কাত হয়ে থাকাতে গণ্ডের

ও গ্রীবার এমন একটা লোভনীয় ভাব প্রকাশ হয়েছে যা শুধু মনোহর বললেই সবটা বলা হয় না। সুশোভন হাত দিয়ে আলোটা আড়াল করে' ঝুঁকে দেখতে লাগল।

সামান্য একটু নড়ে চড়ে উঠল সান্ত্বনা, বাঁ হাতখানা বুকের উপর ছিল নেমে এল কয়েক ইঞ্চি। অনামিকায় বিয়ের আংটিটা ছিল, আলো পড়াতে চকমক করে উঠল তার পাথরখানা। সুশোভন সোজা হয়ে দাঁড়াল, চোখের দৃষ্টি গম্ভীর হয়ে এল। অনীতার কথা মনে পড়ল তার। সে বেচারীও বোধহয় একা একা শুয়ে ঘুমুচ্ছে এখন। কিম্বা সে হয় তো জেগে আছে, তারই কথা ভাবছে··· বিয়ের পর এই প্রথম বিচ্ছেদ···একটা অভূতপূর্ব্ব বেদনা আকুল করে' তুলেছে হয় তো। সুশোভনের শীত করছিল, জামাটা ভিজে সপসপ করছে। অসহায়ভাবে চারিদিকে তাকাল সে একবার। না, সে শোবে না এখানে। সান্ত্বনা, সান্ত্বনার স্বামী এবং সমস্ত শোনবার পর অনীতাও তার এখানে শোওয়ার সমর্থন করবে সে জানে, কিন্তু তবু তার মনে হল শোয়াটা উচিত নয়, সিঁড়িতে কিম্বা ওই গোয়াল ঘরেই রাতটা কাটিয়ে দেবার চেষ্টা করা উচিত। কেন উচিত তা বিশ্লেষণ করবার ক্ষমতা ছিল না তার। ক্ষমতা হয় তো ছিল, উৎসাহ ছিল না। ঘুমে ক্লান্তিতে চোখ দুটো জড়িয়ে আসছিল। তার কেমন যেন আবছাভাবে মনে হচ্ছিল সান্ত্বনার খাটের নীচে পা ঢুকিয়ে শুলে অনীতার সঙ্গে আত্মিকযোগ ছিন্ন হয়ে যাবে। ঘুমন্ত সান্ত্বনার দিকে আর একবার চেয়ে দেখলে সে। না, রূপসী বটে। সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তখনই মনে হল সেইজন্য আরও চলে হাওয়া উচিত। দীর্ঘনিশ্বাস পড়ল।

"উঃ কি সাংঘাতিক প্যাঁচেই যে পড়েছি। ভিজে জামা, ভিজে কাপড়, ঘুম পাচ্ছে, মন ছুঁকছুঁক করছে, বিবেক দংশন, রাম রাম! কি যে করি এখন ঘোড়ার ডিম"···স্বগতোক্তিটা জোরেই হয়ে গেল একটু।

"কে, ও আপনি, কি বলছেন"—জেগে উঠল সান্ত্বনা।

"বলছি, কি করি এখন"

"কি আবার করবেন, শুয়ে পড়ুন, ঝুনু কই"

"ঝুনু এল না। বাইরে খেলা করছে, কিছুতেই আসতে চাইছে না। থাক্ না বেশ আছে, বাইরে আরামে থাকবে"

"খেলা করছে! না, না, স্থশোভনবাবু নিয়ে আস্থন তাকে; ঠাণ্ডায় অস্থখ করে' যাবে"

"কিচ্ছু হবে না। বেশ খেলা করছে। তাছাড়া বাইরে গিয়ে এখন ধরাই যাবে না তাকে"

"কেন"

"যা অন্ধকার। সূচীভেদ্য বললে কিছুই বলা হয় না। আলকাতরার মতো বললে তবু খানিকটা—"

"ঝুনু কোথায়"

"শেষবার তার যে সাড়া পেয়েছি তার থেকে অনুমান করছি সর্ষে ক্ষেতে ঢুকেছে"

"সর্ষে ক্ষেতে, বলেন কি! ওমা, আপনি যে ভিজে গেছেন একেবারে দেখছি"

সান্ত্বনা বিছানায় উঠে বসল এবং তার সিক্ত কোটের দিকে শুভ্র বাহুটি প্রসারিত করে বলল—"ছি, ছি, জামার দশা কি হয়েছে আপনার"

"তাতে কি হয়েছে"—ঔদাসীন্যভরে স্থশোভন জবাব দিলে—"বেশী ভেজে নি, সামান্য একটু"

"সামান্য একটু কি! ভিজে সপসপ করছেন, এর নাম সামান্য একটু? এত ভিজলেন কি করে? বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে নাকি?"

"আজ্ঞে না। পুকুরে ডুব দিয়ে এলাম"

"কাপড় জামা ছেড়ে ফেলুন এক্ষুনি। অস্থখ করে' যাবে না হলে। কিন্তু ছাড়বেনই বা কি করে'—আপনার স্যুটকেস তো আসে নি—সে তো অনীতার সঙ্গে চলে গেছে। মুশকিল হল দেখছি, কি করা যায়"

সান্ত্বনা তাড়াতাড়ি এলো, খোঁপাটা ঠিক করে' নিলে, তারপর সোৎসাহে বললে, "হয়েছে। এক কাজ করুন। আলোটা নিবিয়ে দিন। তারপর কাপড় জামা ছেড়ে সেগুলো শুকুতে দিন চেয়ারের উপর। আমি একটা কম্বল দিচ্ছি সেইটে জড়িয়ে মড়িয়ে শুয়ে থাকুন—ওগুলো শুকুক ততক্ষণ। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই শুকিয়ে যাবে।"

"যা বলছ তাতে মনে হচ্ছে না যে আমরা ঘুমোবার আয়োজন করছি। মনে হচ্ছে 'মগ্নতরী' বা ওই গোছের কোনও ছায়াচিত্রে অবতীর্ণ হবার আয়োজন করছি"

"যা বলছি শুনুন। কোটটা খুলে ফেলুন আগে। কিন্তু তার আগে মোমবাতিটা নিবিয়ে দিন দয়া করে'। ওটা পেলেন কোথা"

সুশোভন কাতর দৃষ্টিতে বিছানার দিকে চাইলে একবার। তারপর ফুঁ দিয়ে মোমবাতিটা নিবিয়ে দিলে। ঘর অন্ধকার হয়ে গেল। কোটটা খুলে ফেললে। তারপর একটু ঝুঁকে হাত দিয়ে দেখলে মোজাও ভিজেছে, খুলতে হবে। এক পায়ে দাঁড়িয়ে খুলতে গিয়ে টাল সামলাতে পারলে না, পড়ে গেল। হাতের কাছে যা পেল তাই ধরতে গিয়ে ভীষণ কাণ্ড করে বসল একটা। ড্রেসিং টেবিলের উপর চীনে মাটির প্রকাণ্ড ফুলদানি ছিল, সেইটে ঝনঝন করে' পড়ে' চুরমার হয়ে গেল।

"কি করছেন আপনি সুশোভনবাবু"—চাপা কণ্ঠে চীৎকার করে' উঠল সান্ত্বনা।

"কিছু না, কিছু না। হাত লেগে কি যেন পড়ে' গেল। হয় নি কিছু"

"ভীষণ শব্দ হল যে"

"ভীষণ শোনাল। ভীষণ কিছু হয় নি"

"ভেঙে গেছে ?"

"দেখতে পাচ্ছি না। ভাঙলেও একটু আধটু কোণ টোন হয় তো ভেঙেছে"

"যাক যা হবার হয়েছে এবার শুয়ে পড়ুন। কম্বলটা জড়িয়ে নিন। খাটের রেলিংয়ে ঝুলছে কম্বলটা। জড়িয়ে শুয়ে পড়ুন মেজের উপর। আর দেরি করবেন না"

"চুপ চুপ"—সুশোভন রুদ্ধশ্বাসে বলে উঠল—"শুনতে পাচ্ছ ?"

হ্যাঁ, শুনতে পাওয়া যাচ্ছিল বেশ। খড়মের শব্দ। সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছে। দুয়ারের সামনে এসে দাঁড়াল। অজ্ঞাতসারে সুশোভনের মুখ হাঁ হয়ে গিয়েছিল। কপাটের ফাঁক দিয়ে আলো দেখা গেল। রুদ্ধশ্বাসে দাঁড়িয়ে রইল সুশোভন। এই পরিস্থিতিতে এই বেশে এত রাত্রে গোঁসাইজির সম্মুখীন হওয়ার 'তাগত' তার আর ছিল না। সে গুঁড়ি মেরে সন্তর্পণে বিছানার ওপাশে গিয়ে দাঁড়াল। গোঁসাইজি কড়া নাড়লেন। আর দ্বিধা না করে' সুশোভন হুড়মুড় করে' বিছানায় উঠে সটান শুয়ে পড়ল সান্ত্বনার পাশে আপাদমস্তক ঢাকা দিয়ে। সান্ত্বনাও চুপ করে' রইল। টুঁ শব্দটি করলে না। গোঁসাইজি আরও দু'বার কড়া নাড়লেন। কোন সাড়া পেলেন না।

"ঘুমের ভান কর" চুপি চুপি বললে সুশোভন। চতুর্থবার কড়া নেড়েও যখন কোন সাড়া পাওয়া গেল না তখন গোঁসাইজি কপাটটা একটু ঠেলে মুণ্ডটি ঢোকালেন কপাটের ফাঁক দিয়ে। জোরে জোরে নিশ্বাস নেওয়ার শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। কপাট আর একটু ফাঁক করে' আর একটু ভিতরে ঢুকে' লণ্ঠনটি তুলে' দেখলেন। দেখতে পেলেন যে তাঁর অতিথি দু'জন শুয়ে ঘুমুচ্ছে। পাশাপাশি মাথা দুটো বেশ স্পষ্ট দেখা গেল। কংগ্রেসকর্ম্মী ব্রজেশ্বরবাবু আগাগোড়া ঢাকা দিয়েছেন, মুখ দেখা যাচ্ছে না। তাঁর স্ত্রীর মুখটা বেশ দেখা যাচ্ছে। অধরে যেন ঈষৎ হাসির আভাসও দেখতে পেলেন মনে হল।

তাঁর পিছু পিছু ফদকাও উঠে এসেছিল। সে-ও উঁকি দিয়ে দেখলে সব। অত্যধিক আগ্রহবশতঃ নিজেকে স্থির রাখতে পারছিল না সে সম্ভবতঃ, কনুইটা কড়ায় লেগে বেশ শব্দ হল আবার। গোঁসাইজি চাপা-কণ্ঠে তর্জ্জন করে' উঠলেন।

"তুই ফোঁপরদালালি করতে এলি কেন এখানে। শুগে যা। এখানে কিছু হয় নি। ফের যদি আওয়াজ হয় ঠাকুরকে উঠিয়ে নীচেটা দেখতে হবে ভাল করে"

"বোধ হয় বেরাল"

· "বেরাল না হাতী! ফাজিল কোথাকার—"

ফদকা নীচে চলে গেল। গোঁসাইজি কপাটটা সন্তর্পণে বন্ধ করে' দিলেন। তারপর আলোটা একটু তুলে' নীরবে কয়েক মুহূর্ত্ত দাঁড়িয়ে রইলেন বাইরের বারান্দায়। ওধারের যে ঘরটায় তাঁর গুরু-ভগ্নী আছেন সেদিকে চেয়ে রইলেন খানিকক্ষণ। না, ওধারে কিছু হয় নি। বাইরে থেকেই নাক-ডাকার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। স্ত্রীলোকের এত জোরে নাক-ডাকা একটা দুর্লক্ষণ। তাঁর গুরু-ভগ্নী পুণ্যবতী নারী······ভ্রূকুঞ্চিত করে' দাঁড়িয়ে রইলেন গোঁসাইজি চিন্তামগ্ন হয়ে। তারপর তাঁর মনে হল ওটা রোগের জন্য সম্ভবতঃ। আরও আধ মিনিট দাঁড়িয়ে এদিক ওদিক চেয়ে চেয়ে দেখলেন। না, সন্দেহজনক কিছু দেখা গেল না। নিজের শয়নঘরের দিকে অগ্রসর হলেন। সিঁড়িতে ওঠার শব্দ পাওয়া গেল। ঘরে ঢুকে খিল দিলেন তা-ও শোনা গেল স্পষ্ট।

"সুশোভনবাবু নীচে যান। শিগগির যান বলছি—"

"হায় ভগবান! প্রায় ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। যেতেই হবে?"

"কি যে ছেলেমানুষি করেন, উঠুন, কি করছেন, উঠুন না"

"যাচ্ছি, যাচ্ছি, খোঁচা মেরোনা দোহাই তোমার"

"কম্বলটা বেশ করে' জড়িয়ে শুয়ে পড়ুন নীচে"

"বেশ"

"দেরি কচ্ছেন কেন"

"নাবছি তো। অত চেঁচিয়ো না, চেঁচামেচি শুনলে ও ব্যাটা এক্ষুনি নেবে আসবে আবার। আঃ, ঠেলছ কেন, পা ঝুলিয়ে মোজাটা খুঁজছি—ঘুমটা বেশ এসে গিয়েছিল"

"মেজেতেও এক্ষুনি ঘুমিয়ে পড়বেন"

"কাল সকালে কি হবে বল দিকি। ভোর না হতে হতেই ওই ফদকা এসে হাজির হবে ঝাড়ু দিতে। ড্রেসিং টেবিলের নীচে মাথা গলিয়ে আমি কম্বল জড়িয়ে পড়ে' আছি দেখলে কি ভাববে বলতো। কি জবাবদিহি করব তার কাছে"

"করবেন যা হোক্ কিছু। বুদ্ধির তো অভাব নেই আপনার। বলছেন মোজা খুঁজছি ওর তলায়…"

"মোজা তো আমার পায়ে"

"এক পাটি খুলে তাহলে ঢুকিয়ে দিন এখন থেকে"

"কি যে তোমার ইয়ে সান্ত্বনা—মানে এরকম—"

"কথা বলে' সময় নষ্ট করছেন কেন বৃথা। আমাকে চেঁচাতে মানা করে' নিজে তো চেঁচিয়ে চলেছেন দিব্যি। বেশ গুটিয়ে সুটিয়ে আরাম করে' শুয়ে পড়ুন না। হ্যাঁ, দেখুন—"

"কি আবার—দাঁড়াও—দুত্তোর—এক মিনিট—হ্যাঁ কি বল—"

"ওই ফুলদানি ভাঙার উপর শোবেন না যেন, হাত দিয়ে সরিয়ে নিন টুকরোগুলো কেমন ?—"

(১১)

বৃষ্টিটা থেমেছিল কিন্তু মেঘ কাটে নি। মনে হচ্ছিল যে কোনও মুহূর্ত্তে সুরু হতে পারে আবার। প্রকৃতি দেবী কান্নাটা থামিয়েছেন বটে—সম্ভবতঃ মানবজাতির শোচনীয় অধঃপতনে ব্যথিত হয়েই বিগলিত হয়েছিলেন তিনি—কিন্তু সমস্ত মুখ থম থম করছে এখনও। বিশাল বিশাল মেঘ ঘুরে' বেড়াচ্ছে আকাশে। সূর্য্য-কিরণের প্রসন্ন হাসি সুদূরপরাহত মনে হচ্ছে। চতুর্দ্দিকে বেশ ঘন-ঘোর এখনও।

একজন কিন্তু বেশ পুলকিত হয়ে উঠেছেন। জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে উঠলেন "রাত্রে বৃষ্টি হয়ে গেছে দেখছি—বাঃ—চমৎকার। দরকার ছিল, রাস্তায় যা ধূলো। বেশ মেঘলা মেঘলা আছে, রাস্তায় বাইক করতে কোনও কষ্ট হবে না। রোদ নেই—খাসা! আজ হনুমানপুরটা সেরে' ফেলব তাহলে রামতারণবাবু, বুঝলেন। জল খাবার প্রস্তুত বলছেন? এর মধ্যেই? ছোলা গুড়? খুব ভালবাসি। অতি পুষ্টিকর খাদ্য। নারকেল? বলেন কি! নারকেল নাড়ু? তাহলে তো আরও চমৎকার—তোফা! কোথা? পাশের ঘরে—ও চলুন—ঠিক—"

রামতারণ ত্রিবেদী নরসিংহপুর গ্রামের আপার প্রাইমারি স্কুলের পণ্ডিত। সদারঙ্গবিহারীলাল এ অঞ্চলে এলে এঁরই আতিথ্য গ্রহণ করেন। অতিশয় সজ্জন লোক। শুধু তাই নয় খুব নিরীহ। ভদ্রলোকের সদা-সন্তুষ্ট ভাব অথচ ব্যস্তবাগীশ। নিজের চারিদিকে একট স্নিগ্ধ আবহাওয়া বজায় রাখবার জন্য সর্ব্বদাই আগ্রহান্বিত তিনি। কোন কিছু উগ্র অমসৃণ এলোমেলো বরদাস্ত করিতে পারেন না— তাড়াতাড়ি সমস্ত শান্ত না করা পর্য্যন্ত শান্তি পান না কিছুতে। বেঁটে পরিপুষ্ট লোকটি সর্ব্বদা সব সামলাতে ব্যস্ত যেন। ছোট ছোট বেঁটে হাত দু'টি দিয়ে হয় কোঁচকানো বিছানার চাদর ঠিক করছেন, না হয় টেবিলে বই গুছিয়ে রাখছেন। অভাবে নিজের কোটের সম্মুখ ভাগটার উপরই হাত বুলিয়ে বুলিয়ে মসৃণতর করবার চেষ্টায় আছেন সেটা। ভারী মিষ্টি স্বভাব। তাছাড়া নিরপেক্ষ নির্ব্বিবাদী লোক। ঝগড়া তর্কের সীমানায় থাকেন না কখনও।

সদারঙ্গবিহারীলাল ত্রিবেদী মহাশয়ের আহ্বানে সোৎসাহে পাশের ঘরে ঢুকলেন। ত্রিবেদী মশায় সরে' দাঁড়িয়ে পথ দিলেন তাঁকে, তারপর সন্তর্পণে গোঁফে হাত বুলুতে বুলুতে অনুসরণ করলেন। টেবিলের উপর খাবার ছিল। সদারঙ্গবিহারীলাল চেয়ার টেনে বসলেন এবং আনন্দের আতিশয্যে করতালি দিলেন একবার।

"বাঃ—তোফা—"

রামতারণ ধীরকণ্ঠে বললেন—"আপনি কিছু সঙ্গে নিয়ে যাবেন কি, ছোট একটা বিস্কুটের টিনে পুরে যদি দি—ওখানে কতক্ষণ থাকবেন স্থিরতা নেই তো, ওখানে খাদ্যদ্রব্য কি পাওয়া যায় তারও স্থিরতা নেই—যদিই বা যায়, কি মূল্যে পাওয়া যাবে স্থিরতা নেই—"

সদারঙ্গবিহারীলাল অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলেন। তিনবার 'স্থিরতা' শুনে ভাবছিলেন যে পণ্ডিতের শব্দের সঞ্চয় এত কম সে কি করে' ছেলেদের ভাষা শিক্ষা দিতে পারে—ছেলেরাই তো দেশের ভবিষ্যৎ—তাদের যদি ভাষাজ্ঞান ঠিকমতো না হয় তাহলে তো শিক্ষার ভিত্তিই অমজবুত হয়ে যাবে—অথচ লোকটা ভাল—

"কিছু নিয়ে যাওয়াই ভাল, কি বলেন"

"ও—হ্যাঁ—নিশ্চয়ই। এ তো খুবই স্বযুক্তি"—নাড়কেল নাড়ু দাঁতে আটকে গিয়েছিল সেটা ছাড়াতে ছাড়াতে বললেন সদারঙ্গবিহারীলাল।

"বেশ তো, কি দিচ্ছেন সঙ্গে"

"নারকেল নাড়ু"

"আবার নারকেল নাড়ু! বেশী খেলে আবার—মানে—নারকেল অবশ্য খুবই ভালবাসি আমি, ডাক্তাররা বলেন খুবই পুষ্টিকর—কিন্তু আপনাদের সব নাড়ুগুলো আমিই যদি খেয়ে ফেলি—"

"নারকেল নাড়ু প্রচুর আছে। কলাও দিচ্ছি গোটা চারেক"

"কলা? বলেন কি, খাসা হবে"

"একটু মোহনভোগও করিয়ে দিতে পারি যদি বলেন"

ইতিপূর্ব্বে মোহনভোগ খাইয়েছেন তাঁকে রামতারণ ত্রিবেদী। কালো চটচটে আঠার মতো বস্তুটির ছবি মানসপটে ফুটে উঠল সদারঙ্গবিহারীলালের।

"কি দরকার মোহনভোগের। কলাই যথেষ্ট"

"ক'টার সময় আপনি বেরুবেন বলুন না"

"বেরুবো? দাঁড়ান তাহলে—সর্ব্বাগ্রে ওই সাইকেলওয়ালা মিঠ্ঠুর কাছে যাওয়া দরকার। সে একবার গাড়িটা ঠিক করে' দিয়েছিল। বেরুবার আগে ভাল করে' তেল টেল দিয়ে নিতে হবে আজ। কাল একটু লুব্রিকেটিং তেলের অভাবে —উফ্! মিঠ্ঠু কারবুরেটার খুলে সাফ করতে চাইবে নিশ্চয়। প্লাগও বদলাতে পারে। হ্যাঁ দশটাই ধরুন—তার আগে বেরোনো যাবে না"

"মোহনভোগ হয়ে যাবে তার মধ্যে"

কোটের সম্মুখভাগে হাত বুলোতে বুলোতে রামতারণ স্থিরকণ্ঠে বললেন কথা ক'টি। চকিতে রামতারণের দিকে একবার চেয়ে ঈষৎ ভ্রূকুঞ্চিত করে' ছোলাগুলি চিবোতে লাগলেন সদারঙ্গবিহারীলাল।

প্রায় সওয়া দশটা নাগাদ রওনা হয়ে গেলেন তিনি। সাইকেলের পিছনে স-মোহনভোগ বিস্কুটের টিনটি বেঁধে দিয়েছিলেন ত্রিবেদী মশায়। মিঠ্‌ঠুও নিখুঁতভাবে ঠিক করে' দিয়েছিল সাইকেলটি। ফট্‌ ফট্‌ ফট্‌ ফট্‌ শব্দে চতুর্দ্দিক্‌ সচকিত করে' প্রধাবিত হল মোটর-বাইক। যদিও মেঘলা দিন, তবু কোথা থেকে একটু আলো লুকিয়ে এসে ঝিলিক তুলেছিল তাঁর চশমার লেন্সে। হরিমটর পান্থনিবাসের সামনের রাস্তা দিয়েই হনুমানপুরে যেতে হয়। পান্থনিবাসের সামনাসামনি এসে গাড়ির গতিবেগ কমিয়ে হোটেলের দিকে চাইতেই দেখতে পেলেন প্রচুর গলার্থাকারি দিয়ে উপরের জানলা থেকে গোঁসাইজি নিষ্ঠিবন ত্যাগ করছেন। হোটেলের জানলা কপাট সব খোলা, কিন্তু সান্ত্বনা দেবী বা আর কাউকে দেখা গেল না। সদারঙ্গবিহারীলাল ভাবলেন নিশ্চয় তাঁরা চলে গেছেন। গাড়ির বেগ বাড়িয়ে দিলেন আবার। এই সুখী দম্পতীর কথাই ভাবতে ভাবতে ভীমবেগে চলেছিলেন তিনি। যেমন স্বামী তেমনি স্ত্রী। অত বড় অধ্যাপক, অমন নামজাদা কংগ্রেসকর্ম্মী—কিন্তু এতটুকু অহঙ্কার নেই··· সান্ত্বনাও ভারী লক্ষী মেয়ে। মণি-কাঞ্চন। দেখতে দেখতে এক মাইল পার হয়ে গেল···সান্ত্বনার শুধু রূপ নয় গুণও আছে···অনেক গুণ। সামনে রাস্তাটা বেঁকেছে···ঘুরেই কি কাণ্ড!—সজোরে ব্রেকটা চেপে ধরলেন···গাড়িটা টাল খেয়ে পড়েই যেত হয় তো পাশের খানায়—যদি না বাঁ পা-টা রাস্তার পাশের একটা ঝোপে ঢুকিয়ে সামলে নিতেন তিনি কোনক্রমে। ছোঁড়া রাস্তার ঠিক মাঝখানটিতে দাঁড়িয়ে আছে! এখনও দাঁড়িয়ে আছে—দাঁত বার করে' হাসছে আবার।

ঝোপ থেকে পা বার করে' নিলেন তিনি। একটু মচকেছে বোধহয়। পকেট থেকে রুমাল বার করে' কপালটা মুছলেন, চশমাটা ঠিক করে' নিলেন। তারপর ছেলেটার দিকে চেয়ে অনুকম্পা হল একটু—এরা এমনিভাবেই বেঘোরে মারা যায়—আর একটু হলে গেছল। বেঁটে গোছের ছেলেটা। পরণে ময়লা খাকী হাফপ্যাণ্ট, গায়ে ছেঁড়া সোয়েটার, হল্‌দে রঙের দাঁত। হাসছে—হাসি দেখে

মনে হয় বিচ্ছু। শহর থেকে আমদানী সম্ভবতঃ, পাড়াগেঁয়ে ভীতুভাব মোটেই নেই।

"এই ছোকরা, রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছ কেন? এখনি চাপা পড়তে যে—"

ছোঁড়া দাঁত বার করে' হাসল আবার।

"হাসছ কি, সাবধান না হলে মারা যাবে একদিন। আরে—"

ছোঁড়া সরে' পড়বার উপক্রম করছিল। তার ডান হাতে একটা দড়ি ছিল, সেটা আর এক পাক দিয়ে জড়িয়ে নিলে সে ভাল করে'—সঙ্গে সঙ্গে তার পিছন দিক্ থেকে আর্ত্ত কেঁউ কেঁউ ধ্বনিত হয়ে উঠল। কুকুর—হ্যাঁ কুকুরই তো—ছোট কুকুরের বাচ্চা একটা তারস্বরে চেঁচাচ্ছে। ছোঁড়াটা তার গলায় দড়ি বেঁধে হিঁচড়ে টেনে' নিয়ে চলেছে সেটাকে। ভ্রূকুঞ্চিত করে' সদারঙ্গবিহারীলাল দৃশ্যটা নিরীক্ষণ করলেন একটু ঝুঁকে'। বাচ্ছাটা কিছুতে যাবে না, ছোঁড়াও ছাড়বে না, হিঁচড়ে টেনে' নিয়ে যাচ্ছে।

"এই থাম থাম"—আদেশের ভঙ্গিতে বললেন সদারঙ্গবিহারীলাল—"আরে এ কুকুর যে চেনা। এ তো তোমার কুকুর নয়। এ তো চেনা কুকুর"

"চীনা নেই, বিলেইতি"

সদারঙ্গবিহারীলাল অবিলম্বে বুঝলেন ছোঁড়া বিহারী। শুধু তাই নয়, কুকুরের জাতও চেনে।

"চীনা নেই বোলতা, চেনা চেনা"

"নেই বিলেইতি"

ভারী ডেঁপো তো!

"আরে বাবা তাই সই। কুত্তা কাঁহা পায়া"

ছোঁড়া সদারঙ্গবাবুর দিকে আড়চোখে একবার চেয়ে কুকুরটার দিকে চাইলে। ঝন্টু যেন মানুষের মতো এড়িয়ে গেল তার দৃষ্টিকে। ভয়ে কাঁপছিল বেচারি।

"ই কুত্তা কো কাল রাতমেই হাম আদর কিয়া হায়, গায়ে হাত বুলায়া হায়, ইস কো মালিককে সাথ বহুক্ষণ গল্প-সল্প কিয়া হায়। ই কুত্তা কাঁহা মিলা"

"ই কুত্তা নেহি হায়"

"নিশ্চয় কুত্তা হায়। ইসকো ল্যাজ নেহি দেখকে তুম হয়তো ভাবতা হায় ই কুত্তা নেহি হায়। কিন্তু ই কুত্তাই হায়—ল্যাজ কাট দিয়া। কাঁহা পায়া ই কুত্তা—"

"ই কুত্তা নেহি হায়"

"আরে বলে কি! কুত্তা নয় তো কি বিল্লি? বোলো কাঁহা পায়া ই কুত্তা"

"ই কুত্তা নেহি হায়"

"আরে! তুম্ কি হামরা সে বেশী জানতা হায়। বোকাকা মাফিক তর্ক করকে ফল কি। ইস কুত্তাকে হাম চিনতা হায়, ইসকো মালিককো ভি হাম চিনতা হায়, আজ সে নেই, অনেক দিন সে"

"অগর আপ জবরদস্তী ইসকো কুত্তা বনাইয়ে তো ম্যয় নাচার হুঁ। মগর ই কুত্তা নেহি হায়"

"আরে তুমরা মাফিক এইসা ডেঁপো ছোকরাকে পাল্লামে ইতিপূর্ব্বে পড়া বোলকে তো ইয়াদ নেহি হোতা হায়! কুত্তা নেই তো ই কি হায়"

"কুত্তী হায় হুজুর। দেখিয়ে—

চক্ষুদ্বয় বিস্ফারিত হয়ে গেল সদারঙ্গবিহারীলালের। এটা প্রত্যাশাই করেন নি তিনি। অপ্রস্তুত ভাবটা সামলে নিয়ে বললেন—"তা হো সেকতা হায় অবিশ্যি। কাঁহা পায়া"

"রস্তে মে"

"কি করে গা ইসকো লেকে"

"পোষেঙ্গে। শিখাওয়েঙ্গে—"

"উসকো শিখানে কো কুছ দরকার নেই হায়। যথেষ্ট শিক্ষা হায় উসকো—"

"কুছ নেই জানতি। দেখিয়ে না ঠিক সে চল ভি নেহি সক্‌তি—"

"বাজে বক বক মত্ করো—ই কুত্তা হামকো দেও"

"ফির আপ কুত্তীকো কুত্তা কহতে হেঁ"

"সাধারণ কথাবার্ত্তায় হামলোগ ওতনা লিঙ্গ বিচার নেহি করতা হায়। আসল কথা হাম ইসকো লে যায়গা, লে করকে আসল মালিক কো ঘুরায় দেগা, বুঝা ?"

"কুছ বখশিশ মিলনা চাহিয়ে"

"বখশিশ ? কাহে ? দোসরা আদমিকো কুত্তা লেকে ভাগতা হায়, থানামে খবর দেনেসে কি হোগা জানতা হায় ?"

"দিজিয়ে তব থানে মে খবর"

"আরে—এ তো ভারী ত্যাঁদড় ছোঁড়া দেখছি !"

সদারঙ্গবিহারীলালের মাথায় চকিতের মধ্যে একটা বুদ্ধি খেলে গেল। গলা খাঁকারি দিয়ে বললেন—"দেখো, বখশিশ ফকশিশ নেই দেগা, তবে একঠো চিজ দে সেকতা হায়"

"ক্যা—"

"নাড়ু"

"নাড়ু ?"

"হাঁ। ঘরকা তৈরি নারকেলকা নাড়ু"

"দেখলাইয়ে তো"

সদারঙ্গবিহারীলাল বাইকের পিছন থেকে বিস্কুটের টিনটি খুলে একটি নাড়ু বার করে' দিলেন তাকে। ছেলেটি একটু কামড়ে' আগে পরখ করে' দেখলে, তারপর সবটা মুখে পুরে' ফেললে।

"আওর একঠো হুজুর"

আর একটি নাড়ু দিলেন। ভাঙা ভাঙা হিন্দিতে ছোঁড়াকে উপদেশও দিলেন কিছু। ভদ্রলোকের সঙ্গে ভদ্রভাবে কথা কইতে হয়, যখন তখন অমন দাঁত বার করে' হাসাটা অভদ্রতা, দাঁত মাজাও উচিত প্রত্যহ, অমন ছেতো-পড়া

হল্‌দে দাঁত দেখতে বিশ্রী নয় কী ? সব শুনে ছোঁড়া দাঁত বের করে' বললে— "আউর একঠো লাড্‌ডু দিজিয়ে হুজুর—"

তৃতীয় নাড়ুটি দিয়ে ঝুন্থুকে উদ্ধার করলেন তিনি। ভুরু কুঁচকে ভাবলেন একটু। সমস্যা, কি করে' নিয়ে যাওয়া যায় এখন। পরমুহূর্তেই কিন্তু মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। হয়েছে ! গায়ে একটা ঢিলে গোছের কোট পরেছিলেন তিনি। বুকের বোতামগুলো খুলে ফেললেন এবং ঝুন্থুর আপত্তি সত্ত্বেও কোটের ভিতর পুরে নিলেন তাকে, পুরে বোতাম এঁটে দিলেন। এ ছাড়া গত্যন্তরও ছিল না। সোৎসাহে মোটর বাইকে সওয়ার হলেন সদারঙ্গবিহারীলাল এবং সবেগে ধাবিত হতে লাগলেন হরিমটর হোটেলের উদ্দেশে।

(১২)

শার্দ্দূল সিংহের ম্যানেজার প্রীতম্ সিং ফোন ধরেছিলেন। পাঞ্জাবী হলেও বাংলা ভাষায় বেশ কথাবার্তা বলতে পারেন ভদ্রলোক। গণেশের টুকরো টুকরো কথা থেকে তিনি মোটামুটি একটা ধারণা খাড়া করেছিলেন গণেশ ছিপসরকারী থেকে কথা বলছে, কিছুক্ষণ পরে পোস্টমাস্টারের সঙ্গে কথা কয়ে বুঝলেন, ছিপসরকারী নয় ছিপছররামারী। লাইনটা কোথায় যেন লীক করছে। সুশোভনবাবুরা রাত্রে যে হোটেলে ছিলেন তার নাম—প্রীতম্ সিং প্রথমে শুনলেন হরমটর পান্থনিবাস।

"জায়গাটার নামগুলো একটু অদ্ভুত গোছের, নয় "—প্রীতম্ সিং বললেন।

"আজ্ঞে হ্যাঁ অদ্ভুতই। মান্ধাতার আমলের ব্যাপার"

গণেশ তখন পোস্টমাস্টারকে জিজ্ঞাসা করলে, যে জায়গাটা তারা ছেড়ে এল তার নাম কি।

পোস্টমাস্টার প্রবীণ লোক। মাথার একটি চুলও কালো নেই। তার উপর এক-চক্ষু। অনেকদিন চাকরী করে' ঘাগি হয়েছেন, চট করে' কথার জবাব দেন না, বেফাঁস বা বেমক্কা হয়ে যেতে পারে। যা বলেন ভেবে চিন্তে ধীরে সুস্থে

বলেন। এই যে সব মোটরে চড়ে' শহর থেকে বাবুরা আসেন, ফড়ফড় করে' যা তা জিগ্যেস করেন, এদের উপর মনে মনে হাড়ে-চটা তিনি। যত সব ফক্কড় দালাল জ্বালাতে আসে খালি। সকালে ওই ভদ্রমহিলাটি বেশ জ্বালিয়েছেন এক চোট। টেলিফোন ডাইরেকটারিখানাকে তচ-নচ করে' তবে ঠিক করলেন যে দিগ্বিজয় সিংহরায়ের ফোন নেই। তিনি গেছেন, এবার ইনি এসেছেন!

"যেখানে থেকে আপনারা এলেন সে জায়গাটার নাম জিগ্যেস করছেন?"—সংযত কণ্ঠেই প্রশ্নটা করলেন।

"হ্যাঁ"—মাথায় একটা ঝাঁকানি দিয়ে জবাব দিলে গণেশ।

"কোন রাস্তা দিয়ে এলেন আপনারা?"

"এই যে এই রাস্তায় এক্ষুনি এলাম।"

পোস্টমাস্টারের একচক্ষুর দৃষ্টিটি নিবদ্ধ হল গণেশের মুখের উপর।

"এই রাস্তায় মেলা গ্রাম আছে, একটা নয়, মেলা। আপনি কোথা থেকে এলেন, তা আমি কি করে' বলব? যেখান থেকে এলেন সে জায়গার নাম আপনি যদি না জানেন আমি কি করে' জানব? একটা নয় মেলা গ্রাম আছে এ রাস্তায়, মেলা—মেলার চেয়েও বেশী—"

"ধরে থাকুন", গণেশ বললে প্রীতম্ সিংকে—"আমি মান্ধাতাকে জিগ্যেস করেছি। দেখছি স্বয়ং তিনিই এখানে আছেন।"

"লোকে যদি আপিসে ঢুকে ক্রমাগত জিগ্যেস করে' আমি এই রাস্তা দিয়ে যেখান থেকে এলাম তার নাম কি—তাহলে কি করে' জবাব দিই বলুন। সেকথা তাদের নিজেদেরই তো জানা উচিত। তারাই সেখান থেকে এসেছে, আমি আসিনি। আপনি যেখান থেকে এলেন কি রকম সে জায়গাটা—"

পোস্টমাস্টার বকে' চলেছিলেন।

অনেক ধস্তাধস্তির পর প্রীতম্ সিং যে সংবাদটি সংগ্রহ করলেন তা এই যে, সুশোভনবাবুরা যে হোটেলে রাত্রিবাস করেছিলেন তার নাম হরিমাটি এবং হোটেলটি যে গ্রামে অবস্থিত তার নাম ফতিমারঙ্গপুর। এর পর তাঁরা কোথা

যাবেন তা গণেশ কিছুতে বলতে পারলে না। মুচুকুন্দ-কুণ্ডলেশ্বরীর নাম কিছুতেই মনে এল না তার।

"আমাদের আপিসে যে ম্যাপটা আছে সেটা দেখলে নামটা পাবেন বোধ হয়। চমৎকারকুণ্ডু বা ওই গোছের কিছু একটা—মচকানকাণ্ডও হতে পারে। দেখবেন, ম্যাপে থাকা সম্ভব। ম্যাপেই ওই ধরনের নাম থাকে। এখান থেকে খুব দূর নয় এইটুকুই শুনেছি—এর বেশী কিছু জানি না। ফিরতে কত দেরি হবে তা বলতে পারি না। ফোন কি করে' পেলাম? এ রকম অজ পাড়াগাঁয়ে ফোন পাব আশাই করি নি। শুনলুম এদিকে মিলিটারির একটা ছাউনি ছিল, তারাই নাকি পোস্টাপিসে ফোনটা বসিয়েছিল। হ্যাঁ, আপনারা ভাববেন তাই ফোনটা করে' দিলাম—"

"ভাবনা অবশ্য ঘুচল না"—উত্তর দিলেন প্রীতম্ সিং।

"তা কি করব বলুন সার। ভাল বুঝলাম তাই করলাম—"

একদিকে পোস্টমাস্টার, অন্য দিকে ম্যানেজার—গণেশের মেজাজ ক্রমেই চড়ে' উঠছিল।

"মিছামিছি ফোন করে' অতগুলো পয়সা নষ্ট না করলেও পারতে—"

"খবর না দিলে বলতেন, ফোন করবার যখন স্থবিধে ছিল একটু খবর দিলেই পারতে। ফোন করেছি—এখন বলছেন অনর্থক পয়সা খরচ করছ কেন। আপনাদের অন্ত পাওয়া ভার"

"যাক্ তাড়াতাড়ি ফিরে এস"

ফোনে কথাবার্ত্তা শেষ হল।

এক হিসেবে এই অবশ্য যথেষ্ট হল। যতটুকু খবর পেলেন প্রীতম্ সিং, তা পাঁচ মিনিটের মধ্যে স্বয়ম্প্রভা দেবীকে জানিয়ে দিলেন। স্থতরাং লোহার দালাল জিতু সরকার লৌহসংক্রান্ত ব্যাপারে যদিও তন্ময় হয়ে পড়েছিলেন তাঁর তন্ময়তা বাধাপ্রাপ্ত হল। একটি কেরানী এসে চুপি চুপি খবর দিয়ে গেল যে মিসেস সরকার ফোনে ডাকছেন।

"ডাকছেন ? আমাকে ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ"

জিতুবাবুর মুখের বিপন্ন ভাবটা আরও স্পষ্ট হয়ে উঠল।

"ওঁকে ফোনটা ধরে' থাকতে বল। আর ওই টেলিগ্রাফের ফর্মগুলো দাও তো—"

ফর্ম দিয়ে কেরানী চলে গেল।

জিতুবাবুর মাথায় চুল বেশী ছিল না, যা ছিল তাই তিনি মুঠো করে' ধরে' রইলেন খানিকক্ষণ। তারপর মরীয়া হয়ে সুরু করে' দিলেন—"সুশোভন কট্ ট্রেণ, বাট মিস্ড্, ওয়াইফ, কট্ বাট্ রিটার্ণড্"

কেরানী পুনঃপ্রবেশ করে' বলে গেল মিসেস সরকার আপনার ফোনেই কথা বলছেন। জিতুবাবুর নিজের প্রাইভেট ফোনটা পাশেই ছিল, পরমুহূর্ত্তেই ঝনঝন করে' বেজে উঠল সেটা। জিতুবাবু ধীরে সুস্থে রিসিভারটা তুলেই বুঝলেন স্বয়ম্প্রভা ইতিমধ্যে অনেক কিছু বলে' ফেলেছেন।

"তুমি শুনছো ?"—হঠাৎ থেমে প্রশ্ন করলেন স্বয়ম্প্রভা।

"শুনছি বই কি"

"সাড়া দিচ্ছ না কেন তাহলে। টেলিগ্রাফ করেছ ?"

"নিশ্চয়"

"তাহলে বেকুবি করেছ। তখনই তোমাকে পই পই করে' মানা করলাম যে টেলিগ্রাফ কোরোনা, করা বৃথা"—

"বল ত এখনও বন্ধ করে' দিতে পারি"

"ও, পাঠাও নি এখনও! বহুক্ষণ আগেই ত পাঠাবার কথা—"

"তোমার ইচ্ছেটা কি তা-ই বল না। টেলিগ্রাফ করব, কি করব না"

"কি—"

"করব, না করব না"

"কি—"

"টেলিগ্রাফ গো"

"টেলিগ্রাফ করে' আর কি হবে। এখনও কর নি তাহলে?"

"মানে যদি চাও, বন্ধ করে দিতে পারি এখনও"

"বন্ধ করবে কি করে! কখন পাঠিয়েছ?"

"চেষ্টা করে' দেখতে পারি। টেলিগ্রাফ করতে মানা করছ কেন"

"কেন? কারণ, আমি বলছি সে সেখানে নেই। কোথায় আছে তাও জেনেছি আমি। বুঝলে? শুনছ?"

"কোথায় আছে, বল না"

"সে সেই মাগীকে নিয়ে একটা হোটেলে গিয়ে বাস করছে—"

"বল কি! হোটেলে? বাস করছে? বাস করছে মানে কি—মোটে কালই তো গেছে—"

"মানে, কাল রাত্রে তারা দুজনে সেখানে বাস করেছিল"

"কি বলছ যা তা"

"কি?"

"কি বলছ যা তা"

"জাঁতা কি? শুনতে পাচ্ছি না কিচ্ছু। ব্যাপারটা বোঝ একবার! হোটেলে গিয়ে বাস করছে!"

"কি যা তা বলছ, সম্পূ—"

"অসম্পূ? অসম্পূ কি! অসম্ভব বলছ? কি অসম্ভব?

"এই হোটেলে বাস করা। মানে, সম্পূ—"

"যা বলছ, স্পষ্ট করে' উচ্চারণ কর না। মুখটা ফোনের কাছে এগিয়ে আন—"

"আমি বলছি সম্পূর্ণ বাজে কথা এটা"

"খোকামি না করে' বাড়ি চলে এস। বেরুতে হবে এক্ষুনি—"

"যাব না। একটি কথা বিশ্বাস হচ্ছে না আমার"

"মুখে কিছু পুরেছ নাকি, সুপুরি টুপুরি ?"

"না। শোন—"

"শুনব কি করে' যা ফোন তোমার। আপিসের ফোনটাও ঠিক করে' রাখতে পার না ? কিচ্ছু শোনা যাচ্ছে না ; বানান কর—বানান করে' বল—"

"কি"

"বাড়ি চলে এস"

"এখন যাওয়া অসম্ভব। কেন ঘাবড়াচ্ছ, আমি বলছি তেমন কিছু হয় নি। সে হোটেল কোথায়—"

"মফঃস্বলে। হরিকোটর না কোথা—"

"তার মানে অনীতার খোঁজেই গেছে। বলি নি আমি ?"

"অনীতার খোঁজে ? কি বুদ্ধি তোমার মরি মরি। অনীতাকে ফেলে পালিয়েছে সে কথাটা ভুলে যাচ্ছ—"

"ইচ্ছে করে' তো পালায় নি। ট্রেণ ছেড়ে গেল, কি করবে বেচারা—"

"খুব হয়েছে ! লোহার ব্যবসা ছেড়ে ওকালতি কর গিয়ে।"

"না না, জিনিসটা ভেবে দেখ আগে"

"আমি বলছি ওই মাগীর খপ্পরে ও পড়েছে। ও রকম লোক পড়েই থাকে"

"না পড়ে নি। যেটুকু শোনা গেছে, তার থেকে ও কথা বলা যায় না"

"যায় খুব যায়। আমি চিনি ওদের। আমি যা বলছি ভদ্রভাষায় এর চেয়ে বেশী আর বলা যায় না"

"কি প্রমাণ আছে তোমার ?"

"ওরা দু'জনে মফঃস্বলের একটা হোটেলে কাল একসঙ্গে রাত্রিবাস করেছে এ প্রমাণ আমার আছে। এই যথেষ্ট মনে করি আমি। পুরুষদের চিনতে আর বাকী নেই। তোমাকে আর ওকালতি করতে হবে না ওর হয়ে। বাড়ি চলে এস। ওই মাগীর সঙ্গে ও যে বাস করছে, তাতে আর সন্দেহ নেই—"

"কিন্তু ছি ছি সম্পু—এমনভাবে একজন ভদ্রসন্তানের নামে"—এখানে বলা প্রয়োজন, স্বয়ম্প্রভাকে জিতু সরকার আদর করে' 'সম্পু' বলে ডাকেন।

"কি ? পষ্ট করে' বল না, কি বলছ"

"বলছি সুশোভন অনীতার উদ্দেশ্যেই বেরিয়েছে ট্যাক্‌সি করে'। সে তো আর জানে না যে অনীতা পরের ষ্টেশনে নেবে ফিরে এসেছে। তাছাড়া অনীতার সঙ্গে ওর সব জিনিস রয়েছে যে"

"জিনিস ?"

"হ্যাঁ"

"কি জিনিস"

"কাপড়-চোপড়, এই সব জিনিস"

"কি ?"

"কাপড়-চোপড় এই সব জিনিস। জিনিস—জিনিস। সুশোভনের জিনিস। বুঝতে পারছ না ?"

"কি কি জিনিস"

"আরে, কি বিপদ, তার সমস্ত জিনিস। যা যা নিয়ে সে বেরিয়েছিল। হোটেলটা কি সিংহরায়েদের বাড়ির কাছাকাছি ?"

"তোমার কথা কিচ্ছু বুঝতে পারছি না। তোমাকে যা বলছি ভাল করে' শোন। এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই যে সুশোভন ওই মাগীর সঙ্গে একটা হোটেলে গিয়ে বাস করছে—"

"ছি—ছি—সম্পু—যা বলছ তা ভদ্রতাবিরুদ্ধ—ভদ্রতাবিরুদ্ধ। ভুল হচ্ছে তোমাদের। সে অনীতাকেই খুঁজতে বেরিয়েছে। সে মনে করেছে যে অনীতা সিংহরায়বাবুদের ওখানেই গেছে—"

"তাহলে সিংহরায়বাবুদের ওখানে না গিয়ে হোটেলে গেল কেন"

"হয়তো কিছু—"

"এবং একটি যুবতীকে সঙ্গে নিয়ে ?"

"মানে হয়ত কিছু—"

"বাড়ি চলে এস। আপিস বন্ধ করে' দাও"

পোস্টাফিসে টেলিফোন-গাইডটি রেখে সান্ত্বনা সেলুনের দিকে অগ্রসর হ'ল। ভিতরে ঢোকবার আগেই কানে এল অনেকগুলি লোক একসঙ্গে কথা কইছে। দ্বারের কাছে গিয়ে দেখতে পেল সুশোভনের দাড়ি অর্দ্ধেক কামানো হয়েছে, বাকি অর্দ্ধেকটায় তখনও সাবানের ফ্যানা লেগে রয়েছে, নাপিতটি ক্ষুর হাতে করে' দাঁড়িয়ে আছে। পিলে-রোগা একটি ছোকরা এক হাতে কাঁচি এবং আর এক হাতে আয়না নিয়ে নিকটস্থ টুলটির উপর বসে নিজেই তার হিটলারি গোঁফ জোড়াকে আরও হিটলারি করবার চেষ্টা করছে, কোণের দিকে টেবিলে আর একটি নাপিত ভুঁড়ি-ওলা এক স্থূলকায় ব্যক্তির বগল কামাচ্ছে—এবং সকলে মিলে যুগপৎ কথা কইছে। সুশোভনও। বস্তুতঃ সুশোভনই আলোচনাটা সুরু করেছিল। অন্য কিছু নয় মুচুকুন্দ-কুণ্ডলেশ্বরী যাবার কোন শর্টকাট আছে কিনা—।

সান্ত্বনা বুঝলে এখানে দাঁড়িয়ে থাকা বৃথা। তার চেয়ে ইতিমধ্যে বরং আর একটা কাজ সেরে ফেলা যাক। সদারঙ্গবিহারীবাবু এইখানেই যেন থাকেন কোথাও, তাঁর সঙ্গে দেখা করে' কালকের রাত্রির ঘটনাটা খুলে বলা যাক্। সান্ত্বনার মনে হতে লাগল অবিলম্বে এটা করা দরকার। আর এই ফাঁকেই সেটা সেরে ফেলা ভাল। সদারঙ্গবিহারীলালের ঠিকানা জোগাড় করতে বেগ পেতে হল না বিশেষ। মোটররাইকবিহারী সদারঙ্গবিহারীকে এ অঞ্চলে আবাল-বৃদ্ধবনিতা সবাই চেনে। খোঁজ করতেই একজন বললে যে আজ সকালে তিনি নরসিংহপুরে ত্রিবেদী পণ্ডিতের বাড়িতে এসেছেন। নরসিংহপুর বেশী দূরে নয় সোজা কিছুদূর গিয়েই বাঁ-হাতি।

বড় রাস্তাটা ধরেই সোজা হাঁটতে লাগল সে এবং বলাবাহুল্য অল্পক্ষণের মধ্যেই বেশ একটি দৃশ্য হয়ে উঠল। মফঃস্বলের রাস্তায় একটি লম্বা ফরসা যুবতী জুতো পরে' ফার-কোট গায়ে দিয়ে অসঙ্কোচে খটখটিয়ে হেঁটে যাচ্ছে—এ অতি

চমকপ্রদ দৃশ্য। সান্ত্বনা নিজেও সেটা বুঝতে পারছিল। তার ঘাড়ের কাছে কেমন একটা অস্বস্তি বোধ হচ্ছিল যেন। দরিদ্রনারায়ণ, পল্লী-উন্নয়ন, নৈশ-বিদ্যালয়, শিশুমঙ্গল প্রভৃতি ব্যাপারে বরাবরই উৎসাহ তার—কিন্তু এখন রাস্তার দু'ধারে সারি সারি দণ্ডায়মান ব্যাদিত আনন দরিদ্রনারায়ণদের দেখে মনে মনে বেশ একটু নিরুৎসাহিত হয়ে পড়ল বেচারি। তাকে দেখে কি ভাবছে এরা কে জানে।

জনমতকে চিরকালই ভয় তার। জনমত-ভীমরুলের দংশন একবার সহ্য করতে হয়েছে তাকে। অবশ্য কাল রাত্রে যা ঘটেছে তার কৌতুকজনক বিবরণ জনসাধারণের গোচর হবার সম্ভাবনা নেই বললেই হয়, কে আর অত খোঁজ করতে যাচ্ছে। কিন্তু কোনক্রমে এটা যদি প্রচার হয়ে যায় যে কালরাত্রে সে সুশোভনবাবুকে স্বামী বলে' চালিয়েছে এবং হরিমটর পান্থনিবাসে একঘরে রাত্রিবাস করেছে—তাহলে যা হবে তা আর কহতব্য নয়। তা ছাড়া অপরে যা-ই বলুক, তার নিজের মনের ভিতরই খচ-খচ করছিল যে! কি যে কাণ্ড হল।

অবশ্য স্বামীর সম্বন্ধে সে নিশ্চিন্ত ছিল। উদার গম্ভীর শান্ত মিতভাষী ব্রজেশ্বরের মুখখানা মনের উপর ভেসে উঠল—না, ও কিছু মনে করবে না। স্ত্রীকে সন্দেহ করবার মতো নীচতা ওর নেই। কিন্তু তা না থাকলেও উনি একজন কংগ্রেস-কর্ম্মী, জন-নায়ক। সেদিক থেকে ভেবে দেখলে জনমতকে মোটেই অগ্রাহ্য করা যায় না। এ কথা যদি রটে' যায় যে কংগ্রেস-কর্ম্মী অধ্যাপক ব্রজেশ্বরের যুবতী পত্নী সুশোভন সরকারকে স্বামী বলে' পরিচয় দিয়ে তাঁর সঙ্গে এক হোটেলে এক ঘরে রাত্রিবাস করেছিল, তাহলে তো ঢি ঢি পড়ে' যাবে। এমনিতেই তো কংগ্রেস পার্টিতে শত্রুর অভাব নেই, এ খবর পেলে তো নেচে উঠবে তারা! কাল এই হতভাগা হোটেলটা দেখে প্রথমে কি আনন্দই হয়েছিল তার। না এলেই হ'ত। বেশ কেটে যেত মোটরে। মোটর ড্রাইভার ছিল, সন্দেহের কোন কারণই ঘটত না। ভারী অন্যায় হয়ে গেছে—ছি, ছি—

সদারঙ্গবিহারীলালের (অর্থাৎ ত্রিবেদী মশায়ের) বাড়ির কাছাকাছি এসে অনেকটা যেন নিশ্চিন্ত বোধ করতে লাগল সে। ওই হড়বড়ে বাক্যবাগীশ

লোকটার মুখ বন্ধ করতে পারলে আর কোনও ভয় থাকবে না। তার স্বামীর বিরুদ্ধপক্ষীয়দের ফাৎনাফিরিঙ্গিপুরে হরিমটর হোটেলে আসবার সম্ভাবনা নেই। আর যদিই বা আসেন কেউ, গোঁসাইজির কাছ থেকে খবর সংগ্রহ করার সম্ভাবনা আরও কম। গোঁসাইজির কাছে আমল পাওয়া সহজ ব্যাপার নয়। সান্ত্বনার ভয় এই অদূরদর্শিতার ফলে ওর অমন স্বামীর সুনাম পাছে নষ্ট হয়। মিতবাক খদ্দরধারী ব্যক্তিটির মূর্ত্তি আর একবার ফুটে উঠল মনে।

বেশ সপ্রতিভভাবেই সে বন্ধ দরজার কড়াটা নাড়তে লাগল। ভাবটা যেন যাবার আগে দেখা করতে এসেছে, প্রসঙ্গতঃ শুধু বল্লে যাবে—কাল রাত্রে কি বিপদেই পড়েছিল তারা। অতদূর হেঁটে ওই হোটেলে এসে তারা গোঁসাইজির ভাব-ভঙ্গী দেখে বুঝল যে স্বামী-স্ত্রী বলে' নিজেদের পরিচয় না দিলে নিষ্ঠাবান গোঁসাইজি নির্ঘাত বলে' বসবেন—'সৎকার করতে অক্ষম'। সুতরাং তাই পরিচয় দিতে হয়েছিল। সদারঙ্গবিহারীলাল এসে অজ্ঞাতসারে তাতে বাস্তবতার এক পোঁচ রঙ চড়িয়ে দেওয়াতে তাদের সুবিধেই হয়ে গেল—সেজন্যও ধন্যবাদ দেবে সে। আর বেশী কিছু বলবার দরকার নেই। ওইটুকুতেই যথেষ্ট হবে।

ত্রিবেদী মশায় গামছা পরে' সর্ষপ তৈল-যোগে নিজের অঙ্গমর্দ্দন করছিলেন। নিজের গাল দুটিতে হাত বুলুতে বুলুতে এসে ধীরে সুস্থে কপাট খুললেন এবং খুলেই সান্ত্বনাকে দেখে একটু হকচকিয়ে গেলেন। বুঝলেন সাবধানে কথা বলতে হবে। হ্যাঁ, সদারঙ্গবিহারীবাবু ছিলেন, কিন্তু বেরিয়ে গেছেন। তা প্রায় ঘণ্টাখানেক হবে।

সান্ত্বনা ভ্রূকুঞ্চিত করে' দাঁড়িয়ে রইল ক্ষণকাল।

"কখন ফিরবেন বলতে পারেন"

"সে বিষয়ে সঠিক কিছু বলতে সাহস পাচ্ছি না"

হাতের চেটো দুটো উভয় গণ্ডে আর একবার বুলিয়ে ন যযৌ ন তস্থৌ অবস্থায় এমনভাবে দাঁড়িয়ে আড়চোখে চাইতে লাগলেন ত্রিবেদী মশায় যে সান্ত্বনার পক্ষে সেখানে দাঁড়িয়ে থাকা আর সম্ভব হল না।

ধীরে ধীরে ফিরে এল বেচারী। ফিরে এসে মোটরে বসে' স্থশোভনের অপেক্ষা করতে লাগল। মনটা কেমন যেন খারাপ লাগছিল। নানা কথা মনে হচ্ছিল। কাল রাত্রে সদারঙ্গবিহারীলালের কথা হেসে উড়িয়ে দিয়েছিল সে। এখন নানারকম বিপজ্জনক সম্ভাবনার কথা মনে হত লাগল। যা বাক্যবাগীশ লোক, কি বলতে কোথায় যে কি বলে' বসবে! কোলকাতার কারও যদি কানে ওঠে, তবেই তো হয়েছে!

স্থশোভনের মেজাজও ক্রমশঃ খারাপ হয়ে আসছিল। সেলুনে মুচুকুন্দ-কুণ্ডলেশ্বরী সম্পর্কে যে ভৌগোলিক আলোচনা চলছিল, তা শুনে ক্রমেই যেন ঘাবড়ে যাচ্ছিল সে। ভাবছিল, সান্ত্বনার মুখও গোমড়া হয়ে আসছে ক্রমশঃ। কাল যখন মোটরে উঠল কি হাসি-হাসি মুখ, ভাসা-ভাসা চোখে কি উদ্ভাসিত দৃষ্টি। এখন যেন একেবারে আলাদা লোক। নারী চরিত্র! দেবা ন জানন্তি কুতো মনুষ্যা! কিন্তু তার অনীতা এ রকম ভেতর-বুঝে' নয়, আর যা-ই হোক্। এ রকম ক্ষণে ক্ষণে বদলায় না সে। তাকে বুঝিয়ে দিতে পারলেই হল যে স্থশোভন এক চুল টলে নি, টলতে পারে না, বাস্ তাহলেই মিটে যাবে। এ বিষয়ে স্থশোভনের সন্দেহ ছিল না। আর তো ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই পৌঁছে যাওয়া যাবে, তখন দেখা যাবে। আগে থাকতে ভেবে লাভই বা কি। তার বিশ্বাস অনীতা বুঝবে।

নাপিত গলায় তোয়ালে জড়িয়ে গালে ক্ষুর চালাতে লাগল। স্থশোভন ভাবতে লাগল অনীতার সঙ্গে দেখা হলে কি বলে' স্থরু করবে।

(১৩)

মাঠের মাঝখানে একটা বটগাছের ছায়ায় সদারঙ্গবিহারীলাল তাঁর মোটরবাইক থেকে অবতরণ করলেন, রুমাল দিয়ে কপালটা মুছে চারিদিকে চাইলেন একবার। রাস্তাটা দু'ভাগ হয়ে গেছে, কোনটা ধরবেন ঠিক করতে পারছিলেন না। মনে হল কাছাকাছি এসে গেছেন এইবার, এ সব সম্ভবতঃ দিগ্বিজয়বাবুরই জমিদারি।

তবু একটু খোঁজ করতে হবে। ঝুনু ভাবলে তার বিলম্বিত-হলেও-অনিবার্য্য মৃত্যু এবার আসন্ন হয়ে এসেছে—হঠাৎ কোটের ফাঁক থেকে বেরিয়ে পালাবার চেষ্টা করলে সে একবার প্রাণপণে—পারলে না। সদারঙ্গবাবু দেখলেন অদূরে আর একটি বটগাছের নীচে একটি গরুর গাড়ি রয়েছে এবং তাতে একটি বৃদ্ধ বসে আছেন। ভদ্রলোক বলেই মনে হল। এগিয়ে গেলেন সেদিকে। বৃদ্ধের দৃষ্টিশক্তি তাদৃশ প্রখর নয়, সদারঙ্গবিহারীলাল যে তাঁর দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন তা তিনি বুঝতে পারছেন বলে' মনে হল না! আপন মনেই কি যেন বলছিলেন তিনি এবং মাথা নাড়ছিলেন। সদারঙ্গবিহারীলাল তাঁর কাছে এসে দাঁড়াতে তিনি মুখ তুলে চাইলেন। প্রথমেই চোখে পড়ল ঝুনুর মুখটা। সঙ্গে সঙ্গে চোখ ফিরিয়ে নিলেন অন্যদিকে। দাড়ি-গোঁফওয়ালা একটা জানোয়ার একজন ভদ্রলোকের কোটের ফাঁক থেকে উঁকি দিচ্ছে এ দৃশ্য অপ্রত্যাশিত এবং অস্বস্তিকর। এ আবার কি বিপদ জুটল এসে! নিজের জ্বালাতেই তিনি অস্থির হয়ে আছেন—এ আবার—

"নমস্কার। আচ্ছা, একটা খবর বলতে পারেন—"

"খবর? একটিমাত্র খবরই এখন মস্ত হয়ে রয়েছে আমার কাছে, সেটা যদি শুনতে চান বলতে পারি"

সদারঙ্গবিহারীলালের পরোপকার-চিকীর্ষু অন্তঃকরণ কৌতূহলী হয়ে উঠল, মনে হল ভদ্রলোক বিপদে পড়েছেন হয়তো।

"নিশ্চয় শুনব, কি বলুন"

"ধানের চেষ্টায় বেরিয়েছিলাম, দাম শুনে চক্ষু কপালে উঠেছে। খালি বোরাগুলি নিয়ে মানে মানে বাড়ি ফিরে যাচ্ছিলাম, কিন্তু তা-ও যেতে পারছি না। জল খেয়ে আসি বলে' গাড়োয়ান ব্যাটা সেই যে কোথায় সরেছে এখনও তার পাত্তা নেই"

"ও। তাহলে তো মুস্কিলে পড়েছেন আপনি"

"সারাজীবনই এক-নাগাড়ে মুস্কিল চলেছে মশাই। এই করেই সত্তরটা বছর

কাটিয়ে দিলাম, আরও যে ক'টা দিন কর্ম্মভোগ আছে করতে হবে। কিন্তু ধানের অবস্থা যদি এই দাঁড়ায়, তাহলে লোকে বাঁচবে কি করে' বলতে পারেন”

সদারঙ্গবিহারীলাল বুঝতে পারলেন এ ব্যক্তির উপকার করা তাঁর সাধ্যাতীত। ধানের দর কমাতে তিনি পারবেন না।

“আচ্ছা, একটা খবর—”

“খবরই তো বলছি মশাই, শুনুন না। এই খবরই তো আসল খবর। আপনারা শহুরে বাবু, এ সব খবরের ধার ধারেন না হয়তো, কিন্তু ধানের খবরই আসল খবর। ধানের এই অবস্থা হলে জান বাঁচবে না কারও তা বলে' দিচ্ছি—বাইশ টাকা মণেও দিতে চাইলে না মশাই—”

“ও, তাই নাকি। তাহলে চালের দর আরও চড়বে? বার্ম্মা-রাইস না আসাতেই এ রকম হচ্ছে—”

“ওই এক ধুয়ো তুলেছেন আপনারা। বার্ম্মা-রাইস না-ই এল, বিনুমোড়লের গোলায় ধান ঠাসা রয়েছে দেখে এলাম, বদমাইসি করে' ছাড়বে না। আমি দেখব কেমন খদ্দের জোটে ওর। লক্ষ্মণ ব্যাপারীকে চেনেন নি বাছাধন এখনও—”

আপন মনেই আর একবার মাথা নাড়লেন। সদারঙ্গবিহারীলালের হঠাৎ একবার মনে হল, বার্ম্মা-রাইসের সঙ্গে বিনুমোড়লের গোলার ধানের অর্থ নৈতিক যোগাযোগটা কোথায় তা চট করে' ভদ্রলোককে বুঝিয়ে দিলে মন্দ হয় না।

“সেদিনকার ছোঁড়া বিনে—এখন বিনুমোড়ল হয়েছেন। তার বাপকে চরিয়েছি, ঠাকুরদাকে চরিয়েছি—সে ওপরটপকা চাল মারবে আমার ওপর—”

সদারঙ্গবিহারীলালের উপস্থিতিকে সম্পূর্ণরূপে অগ্রাহ্য করে' বৃদ্ধ নিজের মাথার টাকে হাত বুলোতে বুলোতে উল্লিখিত অর্দ্ধ-স্বগতোক্তি করাতে সদারঙ্গবাবু থমকে গেলেন একটু। তাঁর রসনায় যে অর্থ নৈতিক বক্তৃতাটা উদ্যত হয়ে উঠেছিল তা বাধ্য হয়ে সংযত করে' ফেলতে হল তাঁকে।

“আচ্ছা, একটা খবর বলতে পারেন। মুচুকু—”

"এই বলে দিলাম আপনাকে ওই বিনেকে গলবস্ত্র হয়ে পৌনে একুশ টাকায় ছাড়তে হবে—না যদি হয় নাক কেটে ফেলব আমি—"

বলে' ভদ্রলোক নিজের নাকে একটা হ্যাঁচকা টান মেরে সদারঙ্গবিহারীলালের দিকে চাইলেন। সদারঙ্গবিহারীলাল আড়চোখে একবার তাঁর নাকের দিকে চেয়ে দৃষ্টিটা ফিরিয়ে নিলেন অন্য দিকে।

"তোর ধান তুলসী-মঞ্জুরীও নয়, রূপশালীও নয়—"

"মুচুকুন্দ-কুণ্ডলেশ্বরী এখান থেকে কতদূর বলতে পারেন"

"পারি বই কি। সেখানে যাওয়া হচ্ছে কেন"

"এই কুকুরটাকে পৌঁছে দিতে হবে"

"ওটা কি কুকুর নাকি"

"হ্যাঁ, কুকুর বই কি। বিলিতি-কুকুর"

"তাই বলুন বিলিতি-কুকুর। বিলিতি-কুকুর কুকুর নয়, বিলিতি-কুকুর। বিলিতি-বেগুন যেমন বেগুন নয়, বিলিতি-বেগুন। মাল নিয়ে কেনা-বেচা করি আমি, আমার কাছে বেফাঁস কথা চলবে না"

সদারঙ্গবাবু অবাক হলেন। ভদ্রলোক শুধু অর্থ নৈতিক নয় প্রাণিতত্ত্ব সম্বন্ধেও কিছু জ্ঞান নেই। আশ্চর্য্য! এঁর মনে আলোকপাত করা কর্ত্তব্য। অন্ততঃ চেষ্টা করা কর্ত্তব্য—নিশ্চয়ই!

"কুকুর বলতে আপনি কি বোঝেন"

"ওতে আবার বোঝাবুঝি কি আছে। আপনি যা বোঝেন আমিও তাই বুঝি"

"তবু শুনি না আপনার ধারণাটা কি রকম"

"আপনার ধারণা যে রকম"

"আমি যদি বলি আমার ধারণা এটাও কুকুর"

সদারঙ্গবাবু ঝুনুকে দেখিয়ে হাসলেন একটু।

"তাহলে আমি বলব আপনার ধারণা ভুল। ওটা বিলিতি-কুকুর"

"বিলিতি-কুকুর কি কুকুর নয়?"

"আপনিই আগে বলুন বিলিতি-আমড়া কি আমড়া? বিলিতি-দুধ কি দুধ? বিলিতি-রুটি কি রুটি?"

সদারঙ্গবিহারীলাল উপলব্ধি করলেন এ ব্যক্তির মনে আলোকপাত করতে হলে অনেক ধৈর্য্য এবং সময়ের প্রয়োজন। ধৈর্য্য তাঁর আছে, কিন্তু সময় আপাতত নেই। অন্য সময়ে চেষ্টা করা যাবে—করতেই হবে—ভদ্রলোকের বাড়িটা কোথা জেনে নেওয়া যাক।

"আচ্ছা, এ বিষয়ে পরে আলোচনা করবার ইচ্ছে রইল। আপনার নিবাস কোথা?"

"কেন"

"সুবিধে পাই তো গিয়ে পড়ব একদিন"

সদারঙ্গবিহারীলালের চক্ষু প্রদীপ্ত এবং হাসি আকর্ণ হয়ে উঠল।

"আমার বাড়ি কাঁটকে"

"সে কোন দিকে"

"কাঁটকের নাম শোনেন নি! শালিকপুর কাঁটকে"

"এখান থেকে কতদূর"

"এখান থেকে বার ক্রোশ হবে। সোজা উত্তর দিকে গিয়ে ভগবানগঞ্জের কাছ বরাবর পশ্চিমে বেঁকৃতে হবে। মাঝে নদী আছে গোটা দুই। বৈতি আর চাঁকা—"

"মহাশয়ের নাম কি"

"লক্ষ্মণচন্দ্র কুণ্ডু"

"আচ্ছা, যেতে চেষ্টা করব একদিন"

নোটবুক বার করে' সব টুকে নিলেন সদারঙ্গবিহারীলাল।

"আচ্ছা, মুচুকুন্দ-কুণ্ডলেশ্বরী কতদূর এখান থেকে"

"গরুর গাড়িতে গেলে ঘণ্টা দুই লাগবে—তাও অবশ্য নির্ভর করবে গরু কেমন তার উপর, শুধু তাই নয়—গাড়োয়ান কেমন হাঁকায় তার উপরও। আমার

ভাগ্যে যেমন জুটেছে এইরকম পক্ষিরাজ গরু আর স্থমন্ত্র গাড়োয়ান যদি হয় তাহলে—"

"কোন দিকের রাস্তাটায় যাব"

"সোজা চলে যান না"

"বাঁ-দিকে, না ডান-দিকে"

"ডান-দিকের রাস্তাটা কি সোজা ? বেঁকে গেছে দেখছেন না ?"

সদারঙ্গবিহারীলাল আর অধিক বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করে' বাইকে সওয়ার হলেন।

আর মিনিট পাঁচেক আগে যদি তিনি পৌছতে পারতেন তাহলে দিগ্বিজয়-দম্পতির সঙ্গে দেখা হয়ে যেত। স্থশোভন এবং ব্রজেশ্বরবাবুদের জন্যে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে' অবশেষে তাঁরা যে ক'জন এসে পৌছেছিলেন তাঁদের নিয়েই বেরিয়ে পড়েছিলেন শিকার-অভিযানে। স্থরেশ্বরী দেবী গিয়েছিলেন নানাবিধ আহারের সরঞ্জাম নিয়ে। তিনি তাঁবুতে থাকবেন।

স্থশোভন এবং ব্রজেশ্বরবাবুরা না আসাতে দিগ্বিজয় ভাবছিলেন তিনিই বোধহয় গোলমাল করে' ফেলেছেন সব। কোনও কারণে না আসতে পারলে তারা একটা খবর দিত নিশ্চয়। দু'জনে দু'জায়গা থেকে আসবে, দু'জনেই যখন আসে নি এবং কোনও খবর দেয় নি, তখন তিনিই গোলমাল করে' ফেলেছেন নিশ্চয়।

"বুঝলে তারিখের গোলমাল করে' ফেলেছি সম্ভবতঃ। দু'জনকেই একসঙ্গে চিঠি লিখেছিলাম তো, দু'জনকেই ভুল তারিখ জানিয়েছি, মানে দু'দু'বার ভুল করেছি। তারা বেরোয় নি। হঠাৎ কবে এসে পড়বে কে জানে! তারা ভাববে তাদের প্রত্যাশায় আছি, আমি যে তারিখ ভুল করেছি তাতো জানবে না তারা—"

স্থরেশ্বরী দেবীর কণ্ঠে হাসির জল-তরঙ্গ বেজে উঠল।

দিগ্বিজয় বললেন—"কিন্তু তাদের চিঠি এসেছিল তো। তাতে লেখাও ছিল কোন তারিখে কোন ট্রেনে আসছে তারা। চিঠি দু'খানা তোমাকেই দিলাম সেদিন ?"

"হ্যাঁ, দিলে তো"

· সুরেশ্বরী টেবিলে, 'তাকে' এবং অন্যান্য সম্ভাব্য স্থানে খুঁজলেন। পাওয়া গেল না।

"পেলে?"

"কই না। টেবিল থেকে মেজেতে পড়ে গিয়েছিল বোধহয়। চাকরটা হয়তো পাঁশ-গাদায় ফেলে দিয়েছে"

"কোথায়?"

"পাঁশ-গাদায়—ওই যে বাগানের ওধারে ছেঁড়া কাগজপত্তর ওঁচলা ফেলে দেয় যেখানে"

"ও, ছাই গাদায়"

"ছাই গাদাও বলতে পার। পাঁশ-গাদা বললেও ভুল হয় না বোধহয়। আমি তো বরাবর পাঁশ-গাদাই বলি। আমার বাপের বাড়িতেও পাঁশ-গাদাই বলে"

সুরেশ্বরীর কণ্ঠে অভিমানের সুর ধ্বনিত হ'য়ে উঠল। পত্নীর দিকে চকিত দৃষ্টিতে একবার চেয়ে দিগ্বিজয় বললেন—"ও, তাই নাকি"

"আমরা মুখ্য মানুষ, যা শুনে এসেছি বরাবর, তাই মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ে"

দিগ্বিজয় প্রমাদ গণলেন মনে মনে।

"তাতে আর হয়েছে কি। পাঁশ-গাদাও বলে তো অনেকে। ওইটেই সম্ভবতঃ বেশী শুদ্ধ, পাংশু কথার অপভ্রংশ—"

"তা হোক, পাঁশ পাড়া-গেঁয়ে কথা। ছাইটাই শুদ্ধ বাংলা"

"যাক ও নিয়ে তক্কাতক্কি করে' আর কি হবে। অনর্থক সময় নষ্ট শুধু। তবে এটা আমি ঠিক জানি পাঁশ অশুদ্ধ নয়। সে যাক গে, এখন কি করা যায়—"

সুরেশ্বরী দেবী বললেন—"নিজে দাঁড়িয়ে পাঁশ-গাদাটা—মানে, ছাই-গাদাটা—একবার খোঁজাই না হয় ভাল করে'। যদি পাওয়া যায় চিঠি দুটো—"

"না, তার দরকার নেই। চিঠি পেলেও তারা তো আর আসছে না। আমি তারিখেই গোলমাল করেছি ঠিক। কিন্তু কি করে' যে গোলমাল করলাম!

ছকুবাবু আর গোবর্দ্ধনবাবু, এঁরা দু'জন তো ঠিক এসেছেন। এঁদেরও তো আমিই লিখেছিলাম—"

ছকুবাবু এবং গোবর্দ্ধনবাবু দু'জনেই সুরেশ্বরী দেবীর বাপের বাড়ির সম্পর্কিত লোক। অনেকদিন থেকে আসতে চেয়েছিলেন বলে' এঁদেরও নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল।

সুরেশ্বরী বললেন, "কিন্তু তুমি তো সাধারণতঃ ভুল কর না এরকম। আমারই বরং ভুলো মন—"

"না, না, কি যে বল সুরো। তোমার আবার ভুলো-মন হল কবে থেকে। ভুলো-মন আমার—"

"কেন বাড়িয়ে বলছ মিছিমিছি। কোথায় কোন পেরেকটি কুড়িয়ে রাখ তা মনে থাকে তোমার—তুমি ভুল করবে তারিখ"

সুরেশ্বরীর কণ্ঠস্বরে ঈষৎ ঝাঁজের আমেজ পাওয়া গেল। বাইরের কোন লোক উপরোক্ত কথোপকথন শুনলে ভাববে যে ভুলো-মন হওয়াটা যেন একটা লোভনীয় গুণ এবং তা না হতে পেরে সুরেশ্বরী দেবী যেন ক্ষুণ্ণ হয়েছেন।

দিগ্বিজয় বললেন—"আমার স্বভাবই গোলমাল করে' ফেলা। তুমি ঠিক মতো সামলে নাও বলেই গোলমাল হয় না"

"কি যে বাজে কথা বল! আমি আবার কখন সামলাতে যাই তোমাকে? তোমার কোন কাজটায় আমি হাত দিতে চাই? দেবার দরকারই হয় না, দিলেই বোধহয় গোলমাল হ'ত। এমনিতে তো কখনও কোন বিষয়ে গোলমাল হতে দেখিনি তোমার—"

দৃঢ়কণ্ঠে দিগ্বিজয় বললেন, "একটা কারণে মনে হচ্ছে যে চিঠিতে ভুল তারিখ দিই নি। চিঠি খামে ঢোকাবার আগে তোমাকে দেখিয়েছিলাম যে। ভুল থাকলে নিশ্চয় চোখে পড়ত তোমার"

"মোটেই না। তোমার চিঠি শোধরাবার দরকার হবে একথা ভাবতেই পারি না—"

"যাই বল, গোলমালটা আমিই করেছি। ট্রেন ফেল করলে সান্ত্বনা অন্ততঃ টেলিগ্রাম করত একটা। সুশোভন ছোকরার সঙ্গে তেমন আলাপ নেই অবশ্য, কিন্তু ওর বাপকে চিনতাম তো, ট্রেন ফেল করে' চুপচাপ থাকবে এ কথা তার সম্বন্ধেও ভাবা যায় না। তারিখেই গোলমাল করে' ফেলেছি আমি—"

(১৪)

রায় বাহাদুর দিগ্বিজয় সিংহরায় লোকটি ক্ষীণকায়,খর্ব্বাকৃতি। গায়ের রঙ ঘোর কালো, এত কালো যে তাঁর পাকা গোঁফ ও ভুরুকে অস্বাভাবিক দেখায়, মনে হয় তুলো দিয়ে তৈরি করে' জুড়ে দেওয়া হয়েছে বুঝি। মাথায় টাক, পালিশ-করা আবলুস কাঠের মতো চকচকে। ঘাড়ের ধারে ধারে এবং কানের পাশে পাশেও অল্প-স্বল্প তুলোর সারি আছে। ছিমছাম পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ব্যক্তি। নিজের রঙ কালো বলেই সাদা জিনিসের দিকে সম্ভবতঃ বেশী ঝোঁক। পায়ের চটিটা পর্য্যন্ত সাদা চামড়ার এবং সমস্তই নিখুঁত রকম নির্ম্মল। সুরেশ্বরী দেবী যৌবনে সুন্দরী ছিলেন। এখন বয়স হয়েছে, কিন্তু এখনও গাল দু'টি টুকটুক করছে। এখনও একটু সাজগোজ করতে ভালবাসেন।

দিগ্বিজয় সিংহরায় বরাবর মফঃস্বলেই বাস করছেন। নিজের ক্ষুদ্র জমিদারির গণ্ডী ছেড়ে কদাচিৎ বাইরে গেছেন তিনি। সেই যে বহুকাল আগে কোলকাতায় একবার ট্যাক্‌সি চাপা পড়তে পড়তে বেঁচে গিয়েছিলেন, তারপর থেকে আর শহরমুখো হন নি। ট্যাক্সি অবশ্য চাপা দেয় নি তাঁকে, তিনি যে পড়ে' গিয়েছিলেন তা-ও নয়। কোন রকম অঙ্গচ্যুতি বা পদচ্যুতি না ঘটলেও আর একটা অভূতপূর্ব্ব দুর্ঘটনা ঘটেছিল যা তাঁর তেষট্টি বছরের জীবনে আর কখনও ঘটে নি। তিনি ধৈর্য্যচ্যুত হয়েছিলেন।

দিগ্বিজয় সিংহরায়ের একটা সন্দেহ কিন্তু মাঝে মাঝে জাগে এবং জাগলেই আকুল হয়ে পড়েন তিনি। তাঁর সন্দেহ পত্নী সুরেশ্বরীকে। সুরেশ্বরী বরাবর উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করে' আসছেন যে তাঁরও নাকি শহরের প্রতি ঘোর বিতৃষ্ণা।

কিন্তু ওই মোটর দুর্ঘটনা হওয়ার ফলে শহরের সঙ্গে সব সম্পর্ক চুকিয়ে মুচুকুন্দ-কুণ্ডলেশ্বরীতে এসে বসবাস করতে আসার আগে যখন তিনি কোলকাতায় ছিলেন তখনকার সুরেশ্বরীর মুখচ্ছবিটা মাঝে মাঝে ভেসে ওঠে দিগ্বিজয়ের মানসপটে। তখনকার সেই উদ্ভাসিত চোখমুখ, উচ্ছ্বসিত কথাবার্তা থেকে অনুমান করা শক্ত যে সুরেশ্বরী সত্যিসত্যিই উচ্ছৃঙ্খল নাগরিক-জীবনে বীতস্পৃহ হয়ে উঠেছিলেন। দিগ্বিজয়ের সন্দেহ যে সুরেশ্বরীর বিতৃষ্ণা আসলে বোধ হয় আত্মত্যাগমূলক স্বামি-ভক্তির নিদর্শন। তা যদি হয়, তাহলে ভয়ানক ব্যাপার। ছোটবড় অনেক ব্যাপারেই দিগ্বিজয়ের সন্দেহ হয় যে সুরেশ্বরীর আচরণ সব সময়ে অকৃত্রিম নয়। উদাহরণস্বরূপ সিমের ব্যাপারটাই ধরা যেতে পারে। সিম জিনিসটা দিগ্বিজয় দু'চক্ষে দেখতে পারেন না এবং কোনও এক দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে বহুকাল আগে বিবাহের ঠিক অব্যবহিত পরেই কথাটা তিনি সুরেশ্বরীকে বলে' ফেলেছিলেন। ফলে, সুরেশ্বরীও সিম বর্জ্জন করলেন, শুধু তাই নয়—বলে' বেড়াতে লাগলেন কোনও তরকারিতে সামান্য একটু সিম থাকলেও তাঁর গা গুলিয়ে ওঠে। দশ বৎসর এইভাবে কাটল। তারপর একদিন কোনও কারণে দিগ্বিজয়কে একবার দু'দিনের জন্য বাইরে যেতে হয়েছিল। ফেরবার সময় খবর দিতে পারেন নি। হঠাৎ দুপুরে বাড়ি ফিরে অবাক হয়ে গেলেন। সুরেশ্বরী ভাত খেতে বসেছেন—পাতে থরে থরে সাজানো সিম-ভাতে, সিম-ভাজা, সিমের চচ্চড়ি, সিমের সুক্তো। সিম সীমা অতিক্রম করেছে। সীমন্তিনীর এবম্বিধ ব্যবহারে 'থ' হয়ে গেলেন দিগ্বিজয়। সেইদিন থেকে সুরেশ্বরীকে আর বিশ্বাস করেন না তিনি। যে স্ত্রীলোক সামান্য একটা সিমের ব্যাপারে এতটা করতে পারে তার অসাধ্য কিছু নেই। হয়তো তার মনে কত বাসনা গোপনে ক্ষুধিত হয়ে রয়েছে, তিনি কিছুই জানতে পারছেন না, জানবার উপায় নেই মোটে। শহরের থিয়েটার, সিনেমা, পাড়া-বেড়ানো প্রভৃতি সম্বন্ধে সুরেশ্বরীর আসল মনোভাব যে কি তা কে বলতে পারে? ফলে এই হয়েছে—কোনও বিষয়ে বিতৃষ্ণা প্রকাশ করলেই দিগ্বিজয় তার মধ্যে প্রচ্ছন্ন আকাঙ্ক্ষা দেখতে পান। সুতরাং সুরেশ্বরী যখন একদিন বললেন যে তিনি তাঁদের পুরোনো 'কম্পাস'

গাড়ি বাতিল করে' দিয়ে কিছুতেই মোটর কিনবেন না, তখন দিগ্বিজয় বুঝলেন সুরেশ্বরী মনে মনে মোটর কেনবার জন্যে লোলুপ। নিজের আন্তরিক মোটর-বিতৃষ্ণাকে দমন করে' তাই তাঁকে প্রকাশ্যে মোটরের জন্য লালায়িত হয়ে উঠতে হল। এ ছাড়া সুরেশ্বরীর শখ মেটাবার আর অন্য উপায় ছিল না। বহু অর্থব্যয় করে' মোটর কিনলেন একখানা। সুরেশ্বরীর চোখে জল এসে পড়েছিল। দিগ্বিজয়ের মনে হল এ আনন্দাশ্রু। কিন্তু সুরেশ্বরী বাইরে প্রকাশ করলেন রাগ। কেন, কি দরকার ছিল মোটর কেনবার? 'কম্পাস' গাড়িই ভাল লাগে তাঁর। তাঁদের অনাবিল দাম্পত্য-কৌমুদী মেঘাবৃত হয়ে উঠেছিল ক্ষণিকের জন্য। অবশ্য তা ক্ষণিকের জন্যই এবং একবারমাত্র। তখন থেকেই এঁরা পরস্পরের নিঃস্বার্থপরতার প্রকোপ থেকে পরস্পর বাঁচবার চেষ্টা করছেন সুকৌশলে। নেপথ্যে দু'জনের মধ্যে অদ্ভুত একটা দ্বন্দ্ব চলেছে নিরন্তর। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে এই আটত্রিশ বৎসর-ব্যাপী দাম্পত্য-জীবনে নিঃস্বার্থপরতার এই অনমনীয় দ্বন্দ্বে একটি দিনের জন্য মনোমালিন্য হয় নি দু'জনের মধ্যে। একটি রূঢ় কথা কেউ কাউকে বলেন নি। কোনও নিতান্ত প্রয়োজনীয় ব্যাপারে আশু মীমাংসা করা অপরিহার্য্য হয়ে পড়লে—যেমন কোনও দুঃস্থ প্রতিবেশী বা বন্ধুকে সাহায্য করা সম্পর্কে উপায় নির্দ্ধারণ বা ওই জাতীয় কিছু—তখন জটিলতা না বাড়িয়ে দিগ্বিজয় সটান সুরেশ্বরীর মত সমর্থন করেন। এ ছাড়া আর কোনও উপায় ছিল না। কিন্তু এ-ও খুব সহজে হ'ত না। সুরেশ্বরী চাইতেন দিগ্বিজয়ের কথায় সায় দিতে। এমন ভাব প্রকাশ করতেন যে দিগ্বিজয় যদি সুরেশ্বরীকে তাঁর মতে (দিগ্বিজয়ের মতে) সায় দিতে দেন, তাহলে সুরেশ্বরী যেন চরিতার্থ হয়ে যাবেন। কিন্তু দিগ্বিজয় আত্মত্যাগের দুর্গে অবিচলিত থেকে সুরেশ্বরীর মতটাকেই সমর্থন করতেন, সুরেশ্বরীকে শেষ পর্য্যন্ত আত্মমত-বিসর্জ্জনের সুখ থেকে বঞ্চিত হ'তে হত। ব্যাপারটা সহজে মিটে যেত।

বন্ধুবান্ধবদের তাঁরা খুব যে একটা নিমন্ত্রণ করতেন, তা নয়। সুরেশ্বরী তাঁর দু'চারজন অন্তরঙ্গকে মাঝে মাঝে নিমন্ত্রণ করতে পেলে খুশী হতেন, কিন্তু তাঁর সন্দেহ হ'ত হয়তো তাঁর বন্ধুবান্ধবেরা দিগ্বিজয়ের বিরক্তির কারণ হবে। তিনি

এ-ও জানতেন দিগ্বিজয় কিছুতেই সে কথা স্বীকার করবেন না। নিজের মনের টুঁটি চেপে ধরে' মেরে ফেলবেন তবু স্বীকার করবেন না। দিগ্বিজয়ও শিকারপার্টি আহ্বান করতে ইতস্ততঃ করতেন, কারণ তাঁর ধারণা সুরেশ্বরী জীবহত্যা-ব্যাপারে কষ্ট পান মনে মনে। বলা বাহুল্য সুরেশ্বরী কখনও বলেন নি একথা। বলেন নি—তার কারণ সুরেশ্বরীর ধারণা দিগ্বিজয় শিকারে আনন্দ পান, যদিও দিগ্বিজয় তাঁকে লক্ষবার বলেছেন, শিকার-টিকার মোটেই ভাল লাগে না তাঁর। উচ্চ উচ্চতর উচ্চতম কণ্ঠে বলেছেন। সুরেশ্বরী বিশ্বাস করেন নি। পতি-পরায়ণা আত্মত্যাগ-শীলা রমণীর স্বামী হওয়া যে কি দুর্ভোগ তা দিগ্বিজয়কে হাড়ে হাড়ে বুঝতে হয়েছে। সুখের বিষয়, দিগ্বিজয় সুরেশ্বরীকে বেশী ভালবাসেন, না সুরেশ্বরী দিগ্বিজয়কে বেশী ভালবাসেন এ প্রশ্ন একদিনও ওঠে নি। উঠলে জটিলতম সমস্যার সৃষ্টি হত।

...সেদিনকার শিকার পার্টিতে তিনজন শিকারী যোগদান করেন নি। সুশোভন এবং ব্রজেশ্বরবাবুর যোগ না দেবার কারণ অজ্ঞাত থাকলেও ছকুবাবুর যোগ না দেবার কারণটা জেনে ফেলেছিলেন সবাই। ছকুবাবু সুরেশ্বরীর দূর সম্পর্কের আত্মীয়। যৌবনকালে তিনি ইন্‌কিলাবপুরের স্বনামধন্য বিহারী জমিদার পোখমন সিংহের অন্তরঙ্গ পারিষদ ছিলেন। তিনি গিয়েছিলেন সেখানকার স্থানীয় স্কুলের শিক্ষক হিসেবে, কিন্তু হয়ে পড়েছিলেন পারিষদ। তাঁর যকৃত, পায়ের গাঁটগুলি এবং ভাষা এখনও সে অন্তরঙ্গতার পরিচয় বহন করছে। ভাষার মধ্যে ঢুকেছে অদ্ভুত ধরনের বিহারী বুকনি, লিভারে প্রায়ই ব্যথা হয়, হাঁটুটি ফুলে ওঠে মাঝে মাঝে। সেদিন সকালেই তিনি সকলকে জানিয়েছিলেন বাতটা আবার 'উখড়েছে'। শিকারে যেতে পারবেন না। আসলে হয়েছিল লিভারে ব্যথা—এ কথাটা সকলকে সব সময়ে জানাতে চাইতেন না তিনি।

তিন তিনজন শিকারী অনুপস্থিত হওয়াতে 'পার্টি' জমল না মোটে। তবু দিগ্বিজয় দমলেন না। গ্রাম থেকে আরও দু'জন জোগাড় করলেন। গোবর্দ্ধনবাবু সম্বন্ধে কিন্তু খুব আশা পোষণ করতে পারছিলেন না তিনি। বড্ড বেশী গোবর-গণেশ গোছের লোকটা। ও কি শিকারে সুবিধে করতে পারবে?

সুরেশ্বরী দেবীও খাবার টাবার সঙ্গে নিয়ে যাবেন। সহধর্ম্মিণীত্ব রক্ষা করা হবে, তাছাড়া আর একটা গোপন উদ্দেশ্যও ছিল তাঁর। ওঁরা যে অঞ্চলে শিকার করতে যাচ্ছেন সেখানে মাধব গোমস্তার বাড়ি। মাধবের একটি ছেলে হয়েছে ক'দিন হল। সুরেশ্বরী ঠিক করেছিলেন ওঁরা যখন হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত থাকবেন তখন তিনি গিয়ে মাধবের ছেলেটিকে দেখে আসবেন।

যারা আসে নি তারা যে খবর না দিয়েও এসে পড়তে পারে, এ কথা মনেই হল না সুরেশ্বরীর।···

বাইরে গেটের সামনে গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। দিগ্বিজয় এবং গোবর্দ্ধন গাড়ির কাছে অপেক্ষা করছেন সুরেশ্বরী দেবীর জন্য। অসুস্থ ছকুবাবুর যাতে কোনরকম অসুবিধা না হয় সুরেশ্বরী তার নানারকম ব্যবস্থা করে দিলেন ; যাবার আগে আর একবার সব নিজে তদারক করছিলেন।

ছকুবাবু লোকটিকে দেখলেই শুকনো বাসী তেলেভাজা খাবারের কথা মনে পড়ে যায়। শীর্ণ চেহারা। চোখের শাদা অংশে হলদে রঙের ছোপ। গালের হাড়গুলি উঁচু। চোখের দৃষ্টি লুব্ধ। সমস্ত মুখে কেমন যেন একটা মার্জ্জার-ভাব। গোঁফগুলি ঈষৎ কটা এবং অনেকটা বিড়ালের গোঁফের মতই। ছকুবাবু লাঠি ধরে' ধরে' সুরেশ্বরীর পিছু পিছু দ্বার পর্যন্ত এলেন। শিকার-প্রসঙ্গে দিগ্বিজয়ের মুখে এতক্ষণ তুবড়ি ফুটছিল। আসন্ন শিকারের কাল্পনিক উল্লাসে নিজেকে এবং গোবর্দ্ধনকে এতক্ষণ চাঙ্গা করে' তোলবার চেষ্টা করছিলেন তিনি বক্তৃতার চোটে। হঠাৎ খাপছাড়া ভাবে বলে' উঠলেন—"শিকার জিনিসটাই কিন্তু ভাল লাগে না আমার মোটেই।" গোবর্দ্ধন বিস্মিত হয়ে আড়চোখে চাইলেন একবার তাঁর দিকে। সুরেশ্বরী দ্বারপ্রান্তে এসে ঘাড় ফিরিয়ে ছকুবাবুকে বললেন, "বাড়ি নিয়ে আপনি থাকুন তাহলে, আমরা ঘুরে আসি। খাবার খাবেন কিন্তু, রেখে গেলুম সব"

"খাবার! না, ও বাত আর বোলো না, দোহাই মহাবীরজির! খেতে আর পারব না"

"না, না, চেষ্টা করবেন তবু। আপনার জন্যেই বিশেষ করে' কম মশলার

তরকারি করলাম। দেখবেন একটু চেখে। তিনটে নাগাদ নিশ্চয় খিদে পেয়ে যাবে। সকালে তো খান নি তেমন কিছু”

“খিদে এখনই পেয়েছে। ভুকের কিছু কমি নেই, কিন্তু ডর লাগছে। এর পর যদি পেটের বাইও উখড়ে যায় খতম হয়ে যাব”

“না, না, কি যে বলেন—কিচ্ছু হবে না। পায়ের উপর হট্ ব্যাগটা চাপিয়ে একটু ঘুমুন দেখি। এখানে কেউ বিরক্ত করবে না আপনাকে। শেক দিয়ে একটু যদি ঘুমুতে পারেন ব্যথাটা কমে যাবে, ভাল লাগবে তখন”

“সেটা মুম্‌কিন্ বটে। দেখি, কিন্তু তোমার যে মেজমানরা আসে নি, তারা হুড়মুড় করে এসে অগর পৌঁছে যায়”

“তা সম্ভব নয়। এখন ট্রেণ নেই তো। এলে কালই আসত”

“হল তোমার”—দিগ্বিজয় তাগাদা দিলেন—“শিকারে যদি যেতেই হয় একটু তাড়াতাড়ি করাই ভাল”

“এই যে”

খাবারের ঝুড়ি, টিফিন-কেরিয়র প্রভৃতি সমভিব্যাহারে গাড়ির কাছে এগিয়ে এলেন স্বরেশ্বরী।

“চল যাওয়া যাক এইবার। ছকুদা ভয় পাচ্ছেন যে ওরা যদি আবার সব এসে পড়ে কি করবেন উনি। আমার মনে হয় না কেউ আসবে। বড় জোর একটা টেলিগ্রাফ আসতে পারে। যদি আসে রেখে দেবেন, জবাব দেবার থাকে যদি কিছু জবাবও দিয়ে দিবেন যা হয় একটা—”

শিক্ষক ছকুবাবুর ভ্রূযুগল উৎক্ষিপ্ত হল।

“টেলিগ্রাফ আবার কি? টেলিগ্রাম মীন করছ নিশ্চয়। টেলিগ্রাফ গলৎ হ্যায়—”

“তাই যদি বলতে চান বলুন”—স্বরেশ্বরী দেবী গাড়িতে উঠে কম্বলের বিচিত্র আবেষ্টনীর মধ্যে নিজেকে স্থাপিত করে’ বললেন—“আমরা মুখ্যুস্থখ্যু লোক, আমরা টেলিগ্রাফই বলি। ওতে খুব বেশী দোষ হয় না বোধহয়”

"কিছু দোষ হয়-না"—বলে' উঠলেন দিগ্বিজয়। তিনি আর ধৈর্য্য ধরতে পারছিলেন না। এই নূতন ঝামেলা সৃষ্টি করার জন্যে ছকুবাবুর দিকে একটা রোষদৃষ্টি নিক্ষেপ করে' তিনি বললেন—"আমার তো মনে হয় টেলিগ্রাফটাই বেশী শুদ্ধ। টেলিগ্রামটা হচ্ছে—ওই যে সংস্কৃতে কি বলে যেন—নামধাতু—না না—প্রক্ষিপ্ত? উহুঁ কথাটা ঠিক মনে পড়ছে না, যোগরূঢ়ও নয়—যাক গে—সোজায় এই দেখুন না আমরা খাতায় যা সই করি তার নাম অটোগ্রাফ, অটোগ্রাম নয়"

"রাম কহো, রাম কহো, রাম কহো"—খ্যাঁক খ্যাঁক করে' হেসে ফেললেন ছকুবাবু—"মহাবীরজিকি ভালা হো। আরে মশাই, টেলিগ্রাফ হল যন্ত্রটার নাম। বিশেষণরূপেও ওর ব্যবহার হতে পারে—যেমন টেলিগ্রাফ লাইন"

"মরুক গে"—ব্যাপারটাকে হেসে উড়িয়ে দিতে চাইলেন দিগ্বিজয়—"আমরা অভিধানও লিখছি না, পরীক্ষাও দিচ্ছি না। চিরকাল টেলিগ্রাফ করে' এসেছি, চিরকাল টেলিগ্রাফ করবও, কি বলেন গোবর্দ্ধনবাবু—অ্যাঁ?"

গোবর্দ্ধনবাবু গাড়িতে চড়বার জন্যে কসরৎ করছিলেন। দিগ্বিজয়ের ঘোড়ার গাড়িটি একটু অসাধারণ গোছের। পা-দানিটা বেশ একটু উঁচুতে। দিগ্বিজয়ের কথা শুনে নিরীহ গোবর্দ্ধন বললেন—"তা বই কি। ও সব হল কথার মার প্যাঁচ—ওতে কি আসে যায়—"

"আগে বাঁ পা-টা দিন তারপর হাতলটা ধরুন। হ্যাঁ—"

ছকুবাবুর পীতাভ চক্ষু দু'টি ব্যঙ্গ-দীপ্ত হয়ে উঠেছিল। তিনি বললেন, "অত হাঙ্গামা না করে' 'তার' বললেই মিটে যায়। তার যদি আসে তাহলে খুলব সেটা। কিন্তু কি জবাব দিতে হবে তাতো মালুম নেই"

সুমিষ্ট হাসি হেসে সুরেশ্বরী বললেন—"দেবেন না তাহলে। আমরা এসে যা হয় করব। তোমরা সব বসেছ তো ঠিক করে'? চল আর দেরি করা নয়—উঃ, শিকারের কথা ভেবে যা আনন্দ হচ্ছে"

"থাম, থাম, এক লহমা। শোন—"

ছকুবাবু গাড়ি থামালেন আবার।

"আপনার যে মেজমানদের আসবার কথা, তাদের মধ্যে যেটি বলিয়া জেলায় গিয়েছিলেন তাঁর নামটি কি"

"বলেছি তো আপনাকে। ব্রজেশ্বর—সান্ত্বনার স্বামী"

"ব্রজেশ্বর। আচ্ছা, আর রুক্‌ব না তোমাদের। দিগ্বিজয়—দিগ্বিজয় করে' এস তাহলে। রাম রাম"

"শিকার টিকার ভালই লাগে না আমার"—দিগ্বিজয় আর একবার বললেন স্বরেশ্বরীর দিকে চেয়ে।

গাড়ি বেরিয়ে গেল। ছকুবাবুর বাতও সেরে গেল সঙ্গে সঙ্গে। দিগ্বিজয় যে হুইস্কির বোতলটি দিয়েছিলেন তাঁকে এবং যার প্রায় সবটাই শেষ হয়ে এসেছিল সেইটি বার করে' লিভারের চিকিৎসা সুরু করলেন তিনি। একটু পরেই কিন্তু চমকে উঠতে হল তাঁকে। এ কি, গেটের সামনে 'মেশিন গান' দাগছে কে! অস্ফুটকণ্ঠে একটা অশ্লীল বিহারী গাল উচ্চারণ করে' উঠলেন তিনি, জানলা দিয়ে উঁকি দিলেন। দেখেই চেয়ারে এসে বসলেন আবার। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে পুরাতন ভৃত্য পরেশ এসে দেখলে, ছকুবাবু যুগপৎ ভীত এবং কুপিত হয়ে বসে আছেন। পরেশ বাঙালী চাকর, বেশ কায়দা-দুরস্ত।

"বাইরে একজন বাবু একটা কুকুর নিয়ে এসেছেন। আপনি তাঁর সঙ্গে একটু দেখা করবেন কি? নিয়ে আসব এখানে?"

"আমি? ওয়াজে?"

'ওয়াজে' কথার তাৎপর্য্য পরেশ ঠিক বুঝতে পারলে না। 'ওয়াজে' কথার অর্থ 'হেতু'।

"তিনি বললেন খুঁজে পেয়েছেন"

"কি খুঁজে পেয়েছেন?"

"কুকুরটা"

"বুঝলাম। কিন্তু আমি তার সঙ্গে মোলাকাৎ করি, এ তুমি চাইছ কেন"

"উনি চাইছেন। উনি ব্রজেশ্বরবাবুর স্ত্রীর খোঁজে এসেছেন বললেন, কিন্তু তিনি এখানে—"

"কার স্ত্রীর খোঁজে? ব্রজেশ্বরবাবুর? ও, হ্যাঁ ব্রজেশ্বরবাবু। তাঁর স্ত্রীর খোঁজে এসেছেন? তারপর?"

"ব্রজেশ্বরবাবুর স্ত্রী এখানে নেই শুনে আশ্চর্য্য হয়ে গেলেন। তারপর আমি যখন বললাম মা বাবু দু'জনেই বেরিয়ে গেছেন, তখন তিনি জিগ্যেস করলেন যে বাড়ীতে আর কেউ আছে কিনা। আমি আপনার নাম করাতে উনি আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাইছেন"

"যিনি এক্ষুণি ঝড়ঝড়ে মোটরবাইকে চড়ে এলেন তিনি? চেন তুমি ওঁকে?"

ছকুবাবু অঙ্গুষ্ঠ দিয়ে দক্ষিণ নাসারন্ধ্রটি চেপে রেখে বাম রন্ধ্র দিয়ে ভীষণ জোরে নাক ঝাড়লেন।

"আজ্ঞে হ্যাঁ। সদারঙ্গবাবু"

"আচ্ছা, ডাক। কুত্তা এনেছে একটা? হে ভগবান"

একটু পরেই দ্বারপ্রান্তে সদারঙ্গবিহারীলাল আবির্ভূত হলেন। আপাদমস্তক ধূলোয় ঢাকা, বগলে ঝুন্নু, চোখেমুখে আনন্দ এবং উৎসাহ ঝলমল করছে। চশমাটা ঠিক করে' নিয়ে তিনি ছকুবাবুর দিকে চাইলেন।

"বকুবাবু?"

"ছকু"

"ও, ছকু, মাপ করবেন, ঠিক ধরতে পারি নি তাহলে। আমার নাম সদারঙ্গবিহারীলাল"

"আসুন, বসুন। ওটা আপনার 'চাইনীজ্-পুড্ল্' দেখছি"

"বাঃ, আপনি তো কুকুর চেনেন! হ্যাঁ, 'চাইনিজ্-পুড্ল্'ই"

"চিনি বই কি। পোখমনবাবুর ছিল যে একটা—"

"পোখমনবাবু কোথায় থাকেন"

"বিহারে"

"ও, বিহারে। পোথমন? ও বিহারী, ন্যাচরালি! বিহারী ভদ্রলোকের নাম পোথমন তো হবেই। ঠিক। পোথমন—"

ছকুবাবুর ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটল হঠাৎ।

"মনে হচ্ছে এরপর বলবেন রামায়ণের নায়কের নাম তো রামচন্দ্র হবেই, ন্যাচরালি"

ঘাবড়ে গেলেন সদারঙ্গবিহারীলাল। কিন্তু ক্ষণিকের জন্য। চশমায় আলোক-রশ্মি বিকীরণ করে' আকর্ণ-বিশ্রান্ত হাসলেন একটা।

ছকুবাবু বললেন—"মাপ করবেন, মেজাজটা ভাল নেই। লিভার—মানে—বাতে বড় কষ্ট পাচ্ছি। আপনি বিহারে কখনও যাননি মনে হচ্ছে"

"না, যাই নি। তবে যাবার ইচ্ছা আছে। খুব। শুনেছি চমৎকার জায়গা"

"মোটেই চমৎকার জায়গা নয়, ভয়ানক ধুলো! চমৎকার জায়গা একবার জীবনে গিয়েছিলাম, ওই পোথমনবাবুর সঙ্গেই"

"দার্জিলিং কিম্বা কাশ্মীর নিশ্চয়"

"না, সিঙ্গাপুর। গেছেন কখনও"

"না, তবে যাবার ইচ্ছে আছে। ক্লাইমেটটা খারাপ শুনেছি"

"মোটেই খারাপ নয়"

"ও, নয়?"

"চমৎকার ক্লাইমেট। এসব দেশের ক্লাইমেট কি ক্লাইমেট? মাতাহারির কি জানেন আপনি?"

"আজ্ঞে?"

"বলছি, মাতাহারির বিষয় কিছু জানেন?"

"মাতাহারি? একজন বিখ্যাত স্পাই শুনেছি। একটা ফিল্মেরও ওই নাম আছে—ওই স্পাইয়ের গল্প নিয়েই লেখা সম্ভবতঃ। দেখি নি, আন্দাজ করছি"

"মাতাহারি মানে সূর্য্য। মালয় ভাষা"

"ও, তাই না কি। বাঃ!"

"হুবহু অনুবাদ করলে হয় 'দিনের চোখ'। মাতা—চোখ, হারি—দিন। মাতাহারি—দিনের চোখ—সূর্য্য"

"বাঃ! দিনের চোখ! চমৎকার—পোয়েটিক্—"

"তাই বলছি এ হতভাগা দেশে সূর্য্যের কতটুকু পরিচয় পান আপনারা"

"ও, হ্যাঁ—তা বটে। হা—হা—হা। তবে এখানেও গরম খুব"

"একে গরম বলেন? আপনার সিঙ্গাপুরে যাওয়া উচিত"

"যাবার ইচ্ছে আছে"

"যাবেন একবার। এখন আপনার দরকারটা কি বলুন। 'স্টিংগাহ্' চলবে একটা?"

"আজ্ঞে?"

"এক 'পেগ' দেব? সিঙ্গাপুরে ড্রিঙ্ককে স্টিংগাহ্ বলে। এই যে—"

নিজের গ্লাসটা দেখালেন।

"ও! না, ধন্যবাদ—"

"পোখমনবাবুর স্মৃতি এটি"—এই বলে' ছকুবাবু গ্লাসটি তুলে আর এক ঢোক খেলেন।

"এখন এমন দাঁড়িয়েছে যে এ ছাড়া একটি দিন চলবার উপায় নেই"

"ঠিক। বিহারে যেতে হবে একবার। সিঙ্গাপুরেও। এখন এই কুকুরটাকে এনেছি। রাস্তায় কুড়িয়ে পেলাম এটাকে"

"পুষুন। আমার দরকার নেই। আমি নিজের জ্বালাতেই অস্থির, আমি ও-নিয়ে কি করব"

"না—না—ঠিকই তো। তা নয়—মানে এ কুকুরটা আমার চেনা কুকুর—হঠাৎ রাস্তায় দেখতে পেলাম। অদ্ভুত ঠেকছে, নয়? কি হয়েছে তাহলে শুনুন সব"

পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা করে' সব বললেন তিনি। ছকুবাবু ব্রজেশ্বর-দম্পতির নৈশ-অভিযানের কাহিনী শুনে পুলকিত তো হলেনই না, উপরন্তু তারা যে-কোনও মুহূর্ত্তে এসে পড়তে পারে শুনে চঞ্চল হয়ে উঠলেন।

"সীয়ারাম, সীয়ারাম—তারা তো তাহলে এলো বলে—অ্যাঁ"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, তাই তো আশা করছি। আসবেন নিশ্চয়ই। তাঁদের এখানে দেখতে পাব আশা করেই তো এসেছিলাম আমি—"

"কিন্তু আমি তো তাহলে মহামুশকিলে পড়ে যাব দেখছি। তাঁদের কোন ঘরে থাকতে দেব কি করব আমার তো কিছুই জানা নেই। স্থরো হয়তো চাবি নিয়েই চলে গেছে। হনুমানজি বোম বখেড়ায় ফেলে দিলে দেখছি ঝড়াকৃসে"

ছকুবাবু চেয়ার থেকে উঠে অস্থির ভাবে ঘরের চারদিকটা পরিক্রমণ করে' নিলেন একবার।

"এতে ভাবনার কি আছে"—সদারঙ্গবাবু বললেন—"চাকরটা নিশ্চয় জানে সব। জানা উচিত অন্ততঃ। নিশ্চয়। ডাকব ?"

"ডাকুন, ডাকুন। কিছু করুন একটা। অপরিচিত লোক সব হুড়মুড় করে' এসে পড়লে দিল্ ঘাবড়ে যায় আমার। ওই ঘণ্টাটা টিপুন। আচ্ছা, আপনি বাইক করে' গিয়ে স্থরেশ্বরীকে ডেকে আনতে পারেন ?"

"শুনুন, ব্যস্ত হবার কিছু নেই। এদের জানি, অতি অমায়িক লোক ওরা। এসেই ঘরের লোকের মতো হয়ে যাবে দেখবেন। কিচ্ছু বেগ দেবে না। এসেই খুব সম্ভবতঃ শিকারে চলে যাবে"

"তা' হতে পারে। যাক্, ব্রজেশ্বরবাবু আসছেন তবু ভাল। উনি বলিয়া জেলায় ছিলেন কিছুদিন শুনেছি। ধরবার ছোঁবার মতো কিছু পাব আশা করি। খাঁটি কলকাতিয়া লোককে বড় ভয় করি। কেমন যেন ফসকে ফসকে যায়—"

"উনি বলিয়া জেলায় গিয়েছিলেন না কি ? হিষ্টির রিসার্চের জন্যে, না কংগ্রেস ক্যামপেন্ ?"

"মালুম নেই"

পরেশ এসে প্রবেশ করল।

সদারঙ্গবিহারী তার দিকে চেয়ে বললেন—"ব্রজেশ্বরবাবুরা যদি এসে পড়েন—আসবেনই—তাহলে তাঁরা কোন ঘরে থাকবেন, তাঁদের জন্মে কি কি ব্যবস্থা করতে হবে—তুমি জান তো সব?"

"জানি"

পরেশ মিতবাক্ ব্যক্তি। বহুকাল থেকে সে সুরেশ্বরী দেবীর কাছে আছে। তার এই ছোট্ট 'জানি'র মধ্যে সে কতখানি যে প্রকাশ করলে তা' বাইরের লোকের বোঝবার উপায় নেই। সদারঙ্গবিহারীলালের দিকে সে যে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে তার প্রাঞ্জল অর্থ—আমাদের ঘরোয়া ব্যাপারের মধ্যে আপনি ফোড়ন কাটছেন কেন মশাই।

"জান? ও, তাহলে তো মিটেই গেল। বাস্—"

গলা খাঁকারি দিয়ে সদারঙ্গবিহারীলাল আড়চোখে একবার ছকুবাবুর দিকে চাইলেন। তাঁর মনে হল ছকুবাবুর অন্তরে সাহস সঞ্চার করতে হলে ব্যাপারটা আর একটু বিশদ করা দরকার বোধহয়। পরেশের দিকে চাইলেন তিনি।

"তাঁদের খাবার বসবার শোবার হাতমুখ ধোবার ইত্যাদি ইত্যাদির সব ব্যবস্থা করতে পারবে তাহলে?"

"পারব। ইত্যাদি ইত্যাদিটা কি বুঝলাম না—"

"না, ও কিছু নয়। মানে, তারা আসছে—মানে আই মীন, পথে আছে—একটু ইয়ে তো হবেই নিশ্চয়। তবে লোক খুব ভাল। দু'জনেই। আমি তাদের সঙ্গে কাল রাতটা কাটিয়েছি কি না—ঠিক পুরোরাত নয়, খানিকটা, তবু ধাতটা জানা হয়ে গেছে—বিশেষ বেগ পেতে হবে না,—সাদাসিধে একদম। তোমাকে তো বলেইছি গোড়ায় সব। কেবল বকুবাবু—ও ছকুবাবু—তোমাকে ডাকতে বললেন কিনা তাই—"

"চুপ করুন"—ছকুবাবু বলেন—"আপনি সমস্ত গোলমাল করে' দেবেন দেখছি। শোন পরেশ, ব্রজেশ্বরবাবুরা আসছেন সব ঠিক করে' রাখ। আমাকে কোনও ঝামেলা যেন পোয়াতে না হয়। বাস্। অত বক্তৃতা করবার দরকার কি—"

সদারঙ্গবিহারীলালের দিকে ভ্রূকুটি করে' চেয়ে রইলেন তিনি।

"সব ঠিক আছে"

পরেশও ভ্রূযুগল ঈষৎ উত্তোলন করে' চাইলে সদারঙ্গবিহারীর দিকে।

সদারঙ্গবিহারী একবার ছকুবাবুর দিকে একবার পরেশের দিকে চেয়ে অপ্রস্তত ভাবটা কাটিয়ে ফেলবার চেষ্টা করতে লাগলেন। হাসলেন। পরেশের দিকে চশমার লেন্স থেকে এক ঝলক আলো ফেললেন। হাত দুটো ঘসলেন।

"যাক্ সব ঠিক থাক্‌লেই হল। চমৎকার ব্যবস্থা আছে তাহলে। থাকাটাই স্বাভাবিক। বাঃ—খাসা। এইবার আমাকে উঠতে হবে কিন্তু। ওঠা উচিত। যেতে হবে অনেকদূরে কিনা, হনুমানপুর। বৃষ্টিও নামবে মনে হচ্ছে। যাচ্ছে তাই কাণ্ড। কিন্তু উপায় নেই, যেতেই হবে। একটু দেরী হয়ে গেল—তা হোক—এখানে এসে সব ব্যবস্থা যে করে' দিয়ে যেতে পারলাম তাতে ভারী আনন্দ হচ্ছে। খুব। আচ্ছা, এবার চলি তাহলে—নমস্কার বকুবাবু। এ কুকুরটা—"

ছকুবাবু বললেন—"পরেশকে দিন। পরেশ কুকুরটা নাও"

"ও—হ্যাঁ—পরেশ—তোমার নাম পরেশ বুঝি। এই যে নাও, ধর ভাল করে'। না, কামড়াবে না। হ্যাঁ—। আচ্ছা, চলি তাহলে এবার, নমস্কার ছকুবাবু—"

কম্পমান ঝুনুকে পরেশের হাতে সমর্পণ করে' চলে গেলেন সদারঙ্গবিহারীলাল। যাবার আগে ঘাড় ফিরিয়ে ছকুবাবুর দিকে চেয়ে আকর্ণ-বিশ্রান্ত হাসি হাসলেন আর একবার। তিনি চলে যেতেই ছকুবাবু হাত উলটে মন্তব্য করলেন—"আজব দুনিয়া!"

পরেশ মৃদু হেসে বললে—"উনি বরাবরই একটু কিম্ভূত গোছের"

"কিম্ভূত নয়, বুদ্ধু। দিল্ ঘাবড়ে দিয়েছে একদম। আর একটা স্ট্রিংগাহ্ বানাও। সোডাটা একটু সমঝে দিও,—বুঝলে"

"আজ্ঞে"

স্ট্রিংগাহ্ শব্দটা কোন দেশীয় তা ঠিক না জানলেও পরেশ এটুকু বুঝেছিল যে 'স্ট্রিংগাহ্ বানাও' মানে 'মদ ঢাল'।

ঢালতে লাগল।

(১৫)

দু'দিনের মধ্যেই অনীতাকে আবার ট্রেণে চড়তে হল। এবার সঙ্গে মা বাবা। স্বয়ম্প্রভা দেবী একটি কোণে গিয়ে বসেছিলেন। তাঁর বলিষ্ঠ-চোয়াল-নিবদ্ধ মাংসপেশীগুলির কুঞ্চন-প্রসারণ দেখে মনে হচ্ছিল অদূর ভবিষ্যতে তাঁকে যে সব বক্তৃতা করতে হবে তারই মহলা দিচ্ছেন যেন তিনি মনে মনে। অনীতার বাবা জিতুবাবু গাড়ির আর এক প্রান্তে বসেছিলেন। সুখের বিষয় গাড়িতে আর কেউ ছিল না। সঙ্গে জিনিসপত্রও ছিল না বিশেষ। স্বয়ম্প্রভা একটি মাত্র বড় ব্যাগ এনেছিলেন। ব্যাগটি তাঁর এবং অনীতার শাড়ি-ব্লাউস-সায়া-সেমিজেই ভরে' উঠেছিল প্রায়। জিতুবাবুর একটি কাপড় এবং গেঞ্জিও ছিল অবশ্য তার মধ্যে। কোট কামিজ ছিল না। এক-কোটে এবং এক-কামিজেই তিনি চালিয়ে দিতে পারবেন এই সম্ভবতঃ স্বয়ম্প্রভা প্রত্যাশা করেছিলেন। জিতুবাবু কিছুই আনতে চান নি, এমন কি নিজেকেও না। তাঁকে জোর করে' টেনে এনেছেন স্বয়ম্প্রভা। গাড়ির এক কোণে চুপ করে' বসেছিলেন তিনি বাইরের দিকে চেয়ে। বর্ষাকালে নির্জ্জন মাঠে গাছতলায় একক গাধাকে ভিজতে দেখেছেন কখনও? জিতুবাবুর অবস্থা কতকটা সেই রকম।

অনীতাকে ভারী সুন্দর দেখাচ্ছিল। কালো চোখের জলন্ত দৃষ্টি মর্ম্মভেদিনী হয়ে উঠেছিল যেন। মেজাজ সপ্তমে চড়ে' ছিল তার। সমস্ত পৃথিবীর উপরই চটেছিল সে। সব চেয়ে বেশী রাগ হচ্ছিল নিজের উপর। এত কেলেঙ্কারি কেন করতে গেল সে! রাগ হচ্ছিল খাণ্ডার মায়ের উপর। মা যেন তার এই দুর্দ্দশাটা উপভোগ করছে মনে মনে! ক্ষেপে বসেছিল সে। সুশোভনের উপর প্রথমে তার যে রাগটা হয়েছিল তা রূপান্তরিত হয়ে অন্য রকম হয়ে দাঁড়িয়েছিল এখন। অর্থাৎ তার হৃদয়নাট্যমঞ্চে যে নিদারুণ নাটক অভিনীত হচ্ছিল সে নাটকে সুশোভনই এখন একমাত্র পাষণ্ড নয়। সুশোভনের বিরুদ্ধে যে প্রচণ্ড ক্রোধাগ্নি প্রথমটা প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠেছিল তার শিখা অনেকটা কমে এসেছে এখন। প্রদাহও নেই আর তেমন। এখন আর একটি সূক্ষ্মতর এবং অধিকতর

মর্ম্মান্তিক জ্বালায় তার সমস্ত বুকটা পুড়ে যাচ্ছিল। এতক্ষণ এ বিষয়ে সে তেমন সচেতনও ছিল না। স্বয়ম্প্রভার কুঞ্চিত চোখের নিষ্পলক দৃষ্টি এবং চোয়াল-চিবুকের নীরব সঞ্চালন দেখে হঠাৎ সে ব্যাপারটা উপলব্ধি করলে। করবামাত্রই সমস্ত চিত্ত তিক্ত হয়ে উঠল নিমেষে, স্কন্ধযুগল আপনিই উঠে পড়ল কানের দিকে। সুশোভন? হ্যাঁ সুশোভন তো তাকে দাগা দিয়েইছে, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই, যদিও মনে মনে সে এখনও সঙ্গোপনে আশা করছে যে হয়তো সন্দেহটা অমূলক, হয়তো তার ব্যবহারের সন্তোষজনক ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে একটা। কিন্তু মায়ের এ কি ব্যবহার? সুশোভনের দোষ ধরতে পেরে এবং বিনা প্রমাণে সে বিষয়ে নিঃসন্দিগ্ধ হয়ে বিজয়োল্লাসে তাকে শাস্তি দিতে যাওয়ার আগ্রহে মায়ের চোখে যে দৃষ্টি ফুটে উঠেছে তা ঠিক যেন জাল-বদ্ধ পশুকে দেখে প্রলুব্ধ শিকারীর দৃষ্টির মতো। হিংস্র!........অনীতা অজ্ঞাতসারে কখন যে তার দোষী স্বামীর পক্ষ অবলম্বন করেছে মনে মনে তা সে নিজেও টের পায় নি প্রথমে। ছি, ছি, এমন বোকামি সে করতে গেল কেন! রাগের মাথায় কেন সে সব কথা বলতে গেল মাকে? ওই বলিষ্ঠ নীতিবাগীশ নির্ম্মম মহিলাটিকে সে কি চেনে না? না, সুশোভনের উপর আর রাগ ছিল না তার। ঈর্ষ্যার একটা কাঁটা খচখচ করছিল যদিও মনের ভিতর কিন্তু রাগ আর ছিল না তার। বরং সমস্ত ব্যাপারটাকে অবিশ্বাস করে' ক্ষমা করবার জন্যেই উন্মুখ হয়ে উঠেছিল সে ভিতরে ভিতরে। মায়ের এই 'কর্ত্তাত্তি' করতে যাওয়ার মানে কি? সুশোভনের বিরুদ্ধে যদি কিছু করতেই হয় সে নিজেই করবে। সুশোভনের নাগাল পেলে মা তাকে থুড়বে, ধুনবে, নাস্তানাবুদ করে' ফেলবে সকলের সামনে। তার বুকের ভিতরটা মুচড়ে উঠল—না, যা করবার সে নিজেই করবে। পাঁচজনে মিলে তার স্বামীকে সকলের সামনে অপমান করবে—এ কিছুতেই হতে দেবে না সে। সুশোভনকে সে চায় আবার, তাকে সে ভালবাসে এখনও, তার সব দোষ সত্ত্বেও।

"মা—"

অনীতার কণ্ঠস্বর এত তীক্ষ্ণ শোনাল যে স্বয়ম্প্রভা চমকে উঠলেন। গাড়ির অপর প্রান্ত থেকে জিতুবাবুও ঘাড় ফিরিয়ে তাকালেন।

"কি? হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলি কেন আচম্‌কা! হল কি" স্বয়ম্প্রভা প্রশ্ন করলেন।

অনীতা মায়ের দিকে একটু ঝুঁকে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে চেয়ে রইল তাঁর মুখের দিকে। সে দৃষ্টিতে কেবল রাগ নয় গভীরতর আর একটা কি যেন প্রতিভাত হচ্ছিল। আত্মসম্বরণ করবার চেষ্টা করছিল সে প্রাণপণে, কিন্তু পারছিল না। দাঁত দিয়ে নীচের ঠোঁটটাকে কামড়ে ধরে' চেষ্টা করছিল তবু।

"মনে হচ্ছে এতে তুমি যেন খুশীই হয়েছ"

"কি বলছিস বুঝতে পারছি না ভাল। কি একটা ভাবছিলাম তোর চীৎকারে গুলিয়ে গেল সব। খুশী? মানে?"

"উনি যে এই কাণ্ড করেছেন তাতে যেন আনন্দই হয়েছে তোমার মনে হচ্ছে। ব্যাপারটা তুমি যেন উপভোগ করছ বেশ"

স্বয়ম্প্রভা ঈষৎ ভ্রূকুঞ্চিত করে' বাতায়ন-পথে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন। তাঁর নাসারন্ধ্র বিস্ফারিত হল। তারপর হঠাৎ ঘাড় ফিরিয়ে বললেন—"তোমার মাথার ঠিক নেই, কথা বোলো না বেশী। এত বড় আঘাতের পর মাথা ঠিক রাখা কঠিন। তবু চেষ্টা কর। নিজের জামাই বাস্তুঘুঘু এ আবিষ্কার করে' খুশী হয় না কেউ। আমিও হই নি। তবে আশ্চর্য্যও হই নি। এ আমি গোড়া থেকেই জানতাম—"

"কি—"

জিতুবাবু ওদিক থেকে সরে' এলেন একটু।

"তুমি ওদিকেই থাক না। তোমাকে কিছু বলছি না—"

অনীতা বললে, গোড়া থেকেই যদি জানতে তাহলে বিয়ের সময় আপত্তি কর নি কেন। তখন তো খুশীই হয়েছিলে—"

স্বয়ম্প্রভার মুখে তিক্ত হাসি ফুটে উঠল একটা। গম্ভীরভাবে মাথা নাড়লেন তিনি।

"একটি দিনের তরেও খুশী হই নি। গোড়া থেকেই সন্দেহ করেছি। গোড়া থেকেই আমোল দিতে চাই নি—"

অনীতা এবার ফেটে পড়ল।

"মিছে কথা। এখন তুমি ওঁর শত দোষ দেখছ কিন্তু গোড়ায় গোড়ায় প্রথম যখন উনি আমাকে বিয়ে করতে চাইলেন তখন তুমি কিচ্ছু বল নি। বরং যখন জানা গেল যে ওঁদের অবস্থা বেশ সচ্ছল, ব্যাঙ্কে বেশ টাকা আছে, কোলকাতায় বাড়ি আছে, মরিস 'কার' আছে, বড় বড় লোকের সঙ্গে আত্মীয়তা আছে তখন তো তুমি থল-থল করে' উঠেছিলে আনন্দে, গলে পড়েছিলে—"

"মুখ সামলে কথা বল্। ভদ্রভাবে কথা বলতেও শিখিস নি? আমি গলে' পড়েছিলাম? থল-থল!"

"কি ব্যাপার কি—"

জিতুবাবু আর একবার এদিকে আসবার প্রয়াস পেলেন। কিন্তু স্বয়ম্প্রভার উত্তোলিত তর্জ্জনীর নিষেধাত্মক আন্দোলনে থেমে যেতে হল তাঁকে আবার।

অনীতা বললে—"উনি সত্যি খারাপ এ সন্দেহ থাকলে কিছুতেই বিয়েতে রাজি হতে না তুমি। সে সন্দেহ তোমার ঘুণাক্ষরে ছিল না। আর উনি যে সত্যিই খারাপ তা এখনও প্রমাণিত হয় নি—"

"এই যদি তোমার বুদ্ধি হয় মা তাহলে বুঝতে হবে অনেক দুঃখ নাচছে তোমার কপালে। এ দেশের ঘরে ঘরে যে সব সতী সাধ্বীরা অপমানিত হয়েও স্বামীদের অধঃপতনে বাধা দেয় না তোমাকেও শেষ পর্য্যন্ত তাদের দলে গিয়ে হায় হায় করতে হবে সারাজীবন—"

"না, হবে না। তুমি যা ভাবছ তা নয়। ওঁর কোনও অধঃপতন হয় নি। বাবা যেমন নিষ্কলঙ্ক আমার বিশ্বাস উনিও তেমনি—"

"দেখ মা পুরুষমাত্রেই উড়তে চায়। সে উড়বে কিনা তা নির্ভর করে তার স্ত্রীর উপর। সব ঘোড়ার চালই বদচাল, তাকে ঠিক চালে চালাতে পারে ভালো সওয়ার—" বলিষ্ঠ গর্দ্দান ফিরিয়ে স্বামীর দিকে চাইলেন একবার।

"বিশ্বাস করি না ওসব কথা আমি। উনি যা করেছেন তার কারণ আছে নিশ্চয়ই একটা। গেলেই বোঝা যাবে"

"যেমন বাপ তেমনি মেয়ে! একটা মাগীকে নিয়ে হোটেলে গিয়ে পড়ে' আছে তবু বলে কিনা—"

"বিশ্বাস করি না আমি"—চীৎকার করে' উঠল অনীতা—"হয়তো ভুলিয়ে নিয়ে গেছে—কিম্বা—"

"ভুলিয়ে নিয়ে গেছে! আগে থাকতে সড় করে' ষ্টেশনে এসেছে, বলে কিনা ভুলিয়ে নিয়ে গেছে। কচি খোকা! মোয়া দেখে ভুলে গেলেন!"

"সে যাই হোক, তুমি এ নিয়ে মাতামাতি করছ কেন"

"কর্ত্তব্য করছি। মাতামাতিটা কোনখানে দেখলি তুই"

"যখন থেকে ব্যাপারটা শুনেছ তখন থেকে তো উন্মত্ত হয়ে উঠেছ। তোমার জামাই দুশ্চরিত্র এটা আবিষ্কার করে' দিগ্বিজয় করে' ফেলেছ যেন একটা—"

"মুখ সামলে কথা বল্ অনি। ছোট মুখে বড় কথা মানায় না। চুপ করে' বসে থাক একধারে।"

"এ সব থিয়েটারি কাণ্ড ভাল লাগে না আমার"

"থিয়েটারি কাণ্ড করেছে কে—আমি না তুই"

"বাবাকে নিয়ে এই যে তুমি ছুটছ এর কোনও মানে হয়?"

"এ সব কথা শোনবার পর কি ঘরে বসে থাকা সম্ভব?"

"আমার একা এলেই যথেষ্ট হত। আমি একাই তার সঙ্গে দেখা করতে চাই"

"ও! একা দেখা করতে চাও?"—স্বয়ম্প্রভার বলিষ্ঠ চিবুকের পেশীগুলি কুঞ্চিত হল—"একা দেখা করে' তার বানানো গল্পগুলি বিশ্বাস করতে চাও? এমনি করেই তো আরম্ভ হয়! একবার যদি ওদের বানানো গল্প বিশ্বাস করতে আরম্ভ কর—বাস্ তাহলেই হয়ে গেল—জন্মের মতো হয়ে গেল। বেশী দিন লাগবে না, ছ'মাস"—হঠাৎ স্বয়ম্প্রভা বামকরপল্লবটি বিস্ফারিত এবং দক্ষিণ

বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠটি উত্তোলন করে' চীৎকার করে' উঠলেন—"ছ'মাসের মধ্যেই ডুব মারবে। টিকিটি দেখতে পাবে না আর"

"আমার স্বামীর সঙ্গে আমি নিজের মতো করে' বোঝাপড়া করব। তাও করতে দেবে না আমাকে ? এ কি জবরদস্তি তোমার"

"যারা অসুস্থ তাদের জবরদস্তি করেই ওষুধ গেলাতে হয়। এ জবরদস্তি নয়, বাঁচাবার উপায়। তোমার নিজের মতো করে' করতে গেলেই হয়েছে। তোমার চোখে ধুলো দিতে কতক্ষণ ?"

"কিন্তু এরকম কেলেঙ্কারি করার কি দরকার ছিল ? গুষ্টিসুদ্ধ মিলে—"

"কেলেঙ্কারি যাতে বেশী দূর না গড়ায় তারই ব্যবস্থা হচ্ছে। এখন থেকে ব্যবস্থা না করলে—ঢিঢি পড়ে' যাবে। লোকসমাজে আর মুখ দেখানো যাবে না তখন—"

"কি ব্যাপার কি"—জিতুবাবু আবার বললেন।

"তোমার আর শুনে কাজ নেই। ওইখানেই থাক তুমি"

"তাই তো আছি"

"তাই থাক"

জিতুবাবু মেয়ের দিকে চাইলেন। তাঁর দৃষ্টি থেকে সহানুভূতি যেন উপচে পড়ছিল। অনীতাও আড়চোখে একবার চাইলে বাবার দিকে। জিতুবাবুর মনে হল সে যেন নীরবে তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করছে। স্ত্রীর দিকে চেয়ে কিন্তু জিতুবাবু কেমন যেন দিশাহারা হয়ে পড়লেন।

"কি নিয়ে এত বকাবকি করছ তোমরা"—একটু ইতস্ততঃ করে' আর একবার বললেন তিনি। একটু সরেও এলেন।

"তুমি আবার আসছ এদিকে! ওই দিকে থাক না যেমন আছ—আরও সরে' যাও বরং কোণের দিকে। আমাদের কথায় ফোড়ন দিতে হবে না তোমাকে"

"তোমাদের কাছে বসতেও দেবে না নাকি। সমস্ত পথটা একা একা আমাকে বসে' থাকতে হবে ওই কোণে!"

"সারাটা জীবনই তো আমাদের কাছে বসে আছ। কিছুক্ষণ দূরেই থাক না। সিগরেট খাও না"

"আমাকে সঙ্গে করে' আনবার কি দরকার ছিল"

হঠাৎ দু'হাত তুলে বলে উঠলেন জিতুবাবু।

অনীতা মায়ের দিকে চেয়ে বললে, "কেন, বাবা আমাদের কাছে এসে বসলে ক্ষতি কি"

"মেয়ে হয়ে তুমি মাকে যে সব কথা বলছ তা যাতে ওঁর কানে না যায় তাই ওঁকে দূরে থাকতে বলছি—"

"এমন কিছুই বলা হয় নি তোমাকে। সব কথা শুনলে বাবা আমার দিকেই সায় দিবেন"

"কি কথা—"

আর একটু এগিয়ে এলেন জিতুবাবু।

"বাড়িতে সিগরেট ফুঁকতে পেলে তো আর কিছু চাও না। ইঞ্জিনের মতো ফস ফস করে' ধোঁয়া ছাড় খালি। তখন তো বকেও থামানো যায় না তোমাকে। এখন সুযোগ পেয়েছ তাই করগে যাও না"

অনীতা বাবার দিকে চেয়ে বললে—"আমি মাকে বলছি ব্যাপারটা আমার হাতে ছেড়ে দাও তোমরা। তোমরা এর মধ্যে মাথা গলাতে যাচ্ছ কেন"

"ঠিকই তো"—জিতুবাবু মৃদুকণ্ঠে বললেন।

স্বয়ম্প্রভার নাসারন্ধ্র বিস্ফারিত হয়ে উঠল। দাঁতের ভিতর দিয়ে একটি সুদীর্ঘ নিশ্বাস টেনে বসে রইলেন তিনি গুম হয়ে।

অনীতা বলতে লাগল—"মা বলছে যে একা তার সঙ্গে দেখা করলে আমি নাকি কিছু বলব না। যদি দেখি সত্যিই তেমন কিছু নয় বলব কেন, কি বল"

তার কালো চোখের দৃষ্টিতে এক ঝলক আলো চকমক করে' উঠল।

"সত্যি সত্যি তার কোনও দোষ আছে কিনা সেইটেই তো সর্ব্বাগ্রে নির্ণয় করা দরকার। আমার মনে হয় ও কিছু নয়"

"ও !"

ফোঁস করে' উঠলেন স্বয়ম্প্রভা। তারপর উঠে দাঁড়ালেন, ট্রেনের ঝাঁকানি সত্ত্বেও নিজের ভারসাম্য এবং গাম্ভীর্য্য রক্ষা করে' বললেন—"তাহলে আমিই ওদিকে গিয়ে বসি। তোমরা বাপ বেটিতে ব'সে পরামর্শ কর। কিন্তু আমার একটা কথা লিখে রাখ—দুর্দ্দশা চরমে পৌছবে, ঢিঢিক্কার পড়ে' যাবে চতুর্দ্দিকে···"

পরের বড় জংসনটাতে নাবলেন তাঁরা। আগে থাকতেই এই প্ল্যান ছিল। অবশ্য স্বয়ম্প্রভা দেবীর প্ল্যান। তাঁর আর তর সইছিল না যেন। চলতি ট্রেন থেকেই লাফিয়ে নাবলেন তিনি। তাঁর গালের চিবুকের এবং শরীরের অন্যান্য চর্ব্বিবহুল অংশের স্পন্দন দেখে মনে হল লাফিয়ে নাবতে গিয়ে সমস্ত দেহে বেশ একটু নাড়া খেয়েছেন ভদ্রমহিলা। কিন্তু তাতে কিছুমাত্র ভ্রূক্ষেপ নেই তাঁর। নেবেই একটা কুলিকে এক ধমক দিলেন তিনি। সে বেচারা ছুটে এসে তাঁর পতন্মোন্মুখ দেহকে জাপটে ধরতে গিয়েছিল।

অনীতা চুপ করেছিল। তার কেমন যেন অবসন্ন মনে হচ্ছিল। জিতুবাবুর কানের ডগাটা লাল হয়ে' উঠেছিল। ফাঁকি ধরা পড়ে' যাবার পর বড়বাবুর কাছে বকুনি খেয়ে ফাঁকিবাজ কেরাণীর যেমন মুখভাব হয়, জিতুবাবুর মুখভাব সেই রকম দেখাচ্ছিল অনেকটা।

"আমরা এইখান থেকেই মোটর নেব, বুঝলে"—স্বয়ম্প্রভা বললেন—"তুমি আগেই ট্যাক্সি ঠিক করে' ফেল একটা। পরে হয়তো না-ও পাওয়া যেতে পারে। আমরা ষ্টেশনের ধারের ওই হোটেলটায় খেয়ে নি, তুমি ততক্ষণ একটা মোটর দেখ। কাছাটা ঠিক করে' দাও"

"কি"—ট্রেন থেকে নাবতে নাবতে জিগ্যেস করলেন জিতুবাবু। ভীড়ে গোলমালে ভাল করে' সব কথা শুনতেই পান নি তিনি।

স্বয়ম্প্রভা আবার সব বললেন।

"আঃ, চেঁচিও না অত। লোকে চেয়ে দেখছে"

"দেখছে তোমাকে। কাছাটা ঠিক করে' দাও"

"দোহাই তোমার, থাম। ইস্—কি বিশ্রী ষ্টেশনটা। এখানে হোটেল কোথা? ষ্টেশনে তো মোটর দেখছি না একটাও, সব ছ্যাক্ড়া গাড়ি—"

"একটু দূরে ট্যাক্সি স্ট্যাণ্ড আছে, আমি খবর নিয়েছি"

"কোথায় সে স্ট্যাণ্ড, জানব কি করে'। তাছাড়া কোথায় আমরা যাচ্ছি তাই তো জানি না। ট্যাক্সিওয়ালাকে বলতে হবে তো জায়গাটার নাম। কি বলব তাকে"

"কাকে"

"তাকে। ট্যাক্সিওয়ালাকে"

"ডেকে আন না। কোথায় যেতে হবে আমি তাকে বুঝিয়ে বলে' দেব"

"কিন্তু ট্যাক্সি ডাকলে তক্ষুণি জানতে চাইবে কোথা যেতে হবে"

"সে আমি বলব তাকে"

"কিন্তু তুমি তো থাকবে হোটেলে। আমি তাকে হোটেলে ডেকে নিয়ে আসব? সে হয় তো আসতেই চাইবে না, ড্রাইভারগুলো প্রায়ই তেরিয়া মেজাজের লোক হয়"

"সামান্য একটা ড্রাইভারের ভয়ে তুমি যদি অস্থির হও পুরুষমানুষ হয়ে, তাহলে আমার আর—"

"মোটেই না। কিন্তু একটা কথা আমি জানতে চাই—আগে থাকতেই ট্যাক্সি ডাকবার দরকার কি। চল না আমিও হোটেলে গিয়ে খেয়ে নি, তারপর ট্যাক্সি ডাকলেই হবে। আমারও ক্ষিদে পেয়েছে।"

"সমস্ত লুচিগুলি তো রাস্তায় একা তুমিই খেলে। এর মধ্যেই ক্ষিদে পেয়ে গেল?"

"দেড়টা বাজে, ক্ষিদে পাবে না? খেয়ে নিয়ে ট্যাক্সি খুঁজলেই হবে। এতে আপত্তি কি তোমার?"

"খাবার পর ট্যাক্সি খুঁজতে গেলে ট্যাক্সি পাবে না। এ তো আর কোলকাতা নয়। দুটো চারটে ট্যাক্সি হয় তো আছে, ভাড়া হয়ে যাবে"

"তার মানে ট্যাক্সি খুঁজে না আনা পর্য্যন্ত খেতে পাব না আমি—"

"তুচ্ছ খাওয়ার ব্যাপার নিয়ে চেঁচামেচি করতে লজ্জা করে না তোমার বুড়ো বয়সে! সবাই চেয়ে চেয়ে দেখছে যে। আমরা হোটেলে যতক্ষণ খাব, ততক্ষণে তুমি যদি একটা ট্যাক্সি ডেকে আনতে পার এক-ঢিলে দুই পাখী মারা হবে"

"তুমি দেখছি আমাকেই মারতে চাও। আমি তা হলে খাব না?"

"ট্যাক্সিটা ডেকে এনেই খেও। খুব যদি ক্ষিদে পেয়ে থাকে রাস্তায় কেক বা সন্দেশ যা পাও কিনে নিয়ে খেতে খেতে যাও"

"সেটা কি—"

"এই কুলি হোটেলে চল। আমরা হোটেলে চললুম, বুঝলে। তুমি ট্যাক্সি দেখ একটা"

ঈষৎ চিন্তার পর জিতুবাবু উপলব্ধি করলেন গত্যন্তর নেই। হোটেলের দিকেই অগ্রসর হলেন তাঁরা। অনীতা একটু পিছিয়ে রইল। এসব কোন কিছুর মধ্যে থাকবে না সে। থাকতে ভাল লাগছিল না।

জিতুবাবু বেরিয়েই গোটা চারেক কেক কিনে নিলেন এবং স্বয়ম্প্রভার অগোচরে অনীতাকে দুটো দিতে এলেন।

"আমি খাব না বাবা"

"দেখ না চেখে"

অগত্যা অনীতাকে নিতে হল।

"ট্যাক্সিওয়ালা যদি জানতে চায় কোথায় যেতে হবে, কি বলব। জানতে চাইবেই"

"বোলো ফতিমারং যাব"

"ফতিমারং? ফতিমারং কোনও জায়গার নাম হতে পারে না"

"রংপুর যদি হতে পারে ফতিমারং হতে বাধা কি"

"রংপুর আর ফতিমারং আকাশ-পাতাল তফাত।"

"যাক্ সে আমি তাকে বুঝিয়ে বলব এখন। ওই দিকে গেলেই নামটা জানা যাবে। ফতিমারং কিম্বা ফাৎনারঙ্গ—ওই ধরনেরই নাম সে গ্রামের। ওদিকে গেলেই জানা যাবে"

"কোন দিকে যেতে হবে তাও হয় তো সে জানতে চাইবে"

"কেন"

"কি কেন"

"কেন তাই তো আমি জানতে চাইছি। আমি তাকে নিয়ে যাব, তার আগে থাকতে জানবার দরকার কি"

"না জেনে সে যদি না আসতে চায়"

"দেখ কুঁড়ে লোকেরাই 'যদি' 'হয় তো'—এই সবের আশ্রয় নেয়। তুমি গিয়েই দেখ না"

"জায়গাটা কত দূর হবে এখান থেকে"

"ঠিক জানি না। তবে কাছেই। বেশী দূর হতে পারে না"

"হবার বাধা কি"

"হলে কোলকাতা থেকে ওরা মোটরে করে' গিয়ে সেখানে রাত্রিবাস করছে কি করে'? ঘটে কি একেবারে কিছু নেই!"

"কি বললে"

"কিছু নয়। যাও তুমি। এমন তর্ক করা স্বভাব হয়েছে—"

জিতুবাবু গেলেন। ফিরে আসতে বেশ একটু সময় লাগল। ফিরে দেখলেন স্বয়ম্প্রভা মারমুখী হয়ে বসে আছেন। হোটেলওয়ালা, হোটেলের চাকর-চাকরাণী, হোটেলের ঠাকুর সকলের সঙ্গে তুমুল ঝগড়া বাধিয়েছেন। প্রায় ফৌজদারি কাণ্ড। অনীতা চুপ করে' বসে আছে একধারে। চারিদিকে নোংরা, মাছি ভনভন করছে, সমস্ত গা ঘিনঘিন করছিল তার। জিতুবাবু কিন্তু বেশ উল্লসিত এবং উদ্দীপ্ত হয়ে ফিরেছেন মনে হল।

"চলে এস! ট্যাক্সি পেয়েছি—"

"উঃ একটা গাড়ি ডাকতে যে কারও এতক্ষণ লাগতে পারে তা ধারণার অতীত ছিল"

"কেউ আসতে চায় না। জিগ্যেস করে' করে' বার করলাম গ্রামটার নাম। ফাৎনা ফিরিঙ্গিপুর। কেউ যেতে চায় না। অনেক কষ্টে এই লোকটাকে রাজি করেছি। জায়গাটা বেশ দূর, ভাড়াতে ফতুর করে' দেবে। যাক্ চল—যেতেই যখন হবে"

"ডিভোর্স করতে হলে উকীলের ফী যা লাগবে ট্যাক্সিভাড়া তার চেয়ে বেশী হবে না আশা করি"

"মা"—ফোঁস করে' উঠল অনীতা।

"থাক। তুমি আবার সুরু কোরো না। কোথায় মোটর"

"বাইরে। তুমি কি আশা করেছিলে মোটর এসে একেবারে রান্না ঘরে ঢুকে পড়বে?"

জিতুবাবু বেরিয়ে গেলেন। অনীতাকে সঙ্গে নিয়ে স্বয়ম্প্রভাও বেরিয়ে এলেন। জিতুবাবুর পাশে দাঁড়িয়ে দু'একবার নাক কুঁচকে নিশ্বাস নিয়ে স্বয়ম্প্রভা অবশেষে তাঁর মুখের দিকে চাইলেন।

"মদ খেয়েছ নাকি"

"খেয়েছি। মানে, খেতে বাধ্য হয়েছি। শরীর আর বইছে না। আমি উট নই, মানুষ"

"খাওয়ার ইচ্ছে যদি ছিল ষ্টেশনের কেলনারে ঢুকে ভদ্রভাবে খেলেই হ'ত। আমাদের হোটেলে বসিয়ে রেখে একটা বাজে তাড়িখানায় ঢুকে ধাঙড়ের মতো তাড়ি না গিললে চলছিল না"

"তাড়িখানা নয়, ভাল দোকান। 'বিয়ার' পেয়ে গেলাম"

"কতটা খেয়েছ? মাতলামি করবে নাকি রাস্তায়"

"কোয়ার্টখানেক খেয়েছি। ওতে নেশা হয় না। ভাল বোধ করছি বরং"

"আমরা নোংরা হোটেলে এক ঝাঁক মাছির মধ্যে বসে' একদল অসভ্য লোকের সঙ্গে বকাবকি করছি, আর তুমি গিয়ে ওদিকে মদ মারছ! লজ্জা করে না তোমার?"

"না"—মরীয়া হয়ে বলে উঠলেন জিতুবাবু—"আমার সঙ্গ যদি তোমার পছন্দ না হয় বল এক্ষুণি বাড়ি ফিরে যাচ্ছি"

"ড্রাইভারের পাশে গিয়ে বস। তোমার পাশে বসতে পারব না। গন্ধে বমি আসছে"

"বল তো বাড়ি ফিরে যাই"

"যা বলছি কর"

(১৬)

ছকুবাবু পিছনে হাত দিয়ে লাইব্রেরি ঘরে উত্তেজিতভাবে পদচারণ করছিলেন। ব্রজেশ্বরবাবুদের কি ভাবে অভ্যর্থনা করবেন তারই নানা রকম মক্‌সো করছিলেন তিনি মনে মনে। কি এক ফ্যাসাদ এসে জুটল, রাম কহো! অভ্যর্থনা! এসে পড়লে করতেই হবে, উপায় নেই এবং যদি করতে হয় এক-হাত দেখিয়ে দেবেন তিনি। সুচারুরূপে সংক্ষেপে এবং অভিনবত্ব সহকারে যাকে বলে! মাঝে মাঝে থেমে ঝাঁকড়া ভ্রূ কুঞ্চিত করে' গেটের দিকে চাইছিলেন। এখনই আসবে! ওই বোধহয়! অনতিবিলম্বেই একটা মোটরকার সশব্দে এসে দাঁড়াল। ছকুবাবুও এক নিমেষে গ্লাসে যেটুকু অবশিষ্ট ছিল সেটুকু গলায় ঢেলে দিয়ে জানলার কাছে এসে দাঁড়ালেন এবং যে সাদর সম্ভাষণ করবেন ঠিক করেছিলেন সেটা আওড়ালেন আর একবার মনে মনে।

মোটরের ভিতরও রিহার্সাল চলছিল একটা। ভিন্ন রকমের। নেবেই প্রথম আলাপের মোহড়ায় কতটা প্রকাশ করা উচিত এবং কতটা চেপে যাওয়া উচিত—তারই আলোচনা চলছিল দু'জনের মধ্যে। দু'জনেই বেশ একটু চঞ্চল হয়ে পড়েছিল। সান্ত্বনা অবশ্য চোখে মুখে খুব একটা সহজ ভাব ফুটিয়ে

রেখেছিল, রাখবার চেষ্টা করছিল অন্তত। মুখে খুব একটা সপ্রতিভ হাসি ফুটিয়ে জানলা দিয়ে ঝুঁকে চেয়ে দেখছিল সে বাড়ির সামনেটা।

সুশোভন ঝোঁকে নি। একটা সিগারেট ধরিয়ে সে গাড়ির এককোণে সেঁটে বসেছিল—চোখে মুখে একটা বে-পরোয়া ভাব ফুটিয়ে।

রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হবার ঠিক পূর্ব্বমুহূর্ত্তে উইংসের ধারে দণ্ডায়মান নূতন অভিনেতাদের যে মনোভাব—এদের উভয়েরই মনোভাব অনেকটা সেই রকম হয়ে উঠেছিল প্রায়।

"প্রথম ঝোঁকটা তুমিই সামলে নাও, বুঝলে সান্ত্বনা, যা কৈফিয়ত টৈফিয়ত দেবার দিয়ে ফেল তুমিই প্রথমে। 'উঃ, কি বিপদে যে পড়েছিলাম' গোছের একটা কিছু—বুঝলে। বারান্দাটা দেখতে পাচ্ছ ?"

"হ্যাঁ"

"কেউ দাঁড়িয়ে আছে নাকি"

"না। সামনের দরজাটা তো বন্ধ"

"বাঁচা গেল। অনীতা দাঁড়িয়ে থাকলেই হয়েছিল আর কি! একটু দম না নিয়ে অনীতার সামনা-সামনি দাঁড়াতে পারব বলে' তো মনে হয় না। কিন্তু দেখো, ঠিক তার সঙ্গেই আগে দেখা হয়ে যাবে! যা কপাল—"

"সে যা হয় হবে। আচ্ছা, আমিই আগে নাবি। আপনি ভিতরেই থাকুন এখন। আমি আগে দেখে আসি—হাওয়া কি ভাবে কোন দিকে বইছে"

"বেশ। তাই যাও। গুছিয়ে সংক্ষেপে ব্যাপারটা বলে' দিও আগে, বুঝলে। তারপর আমাকে এসে টেনে বার কর—'এই যে সুশোভনবাবু এখানে রয়েছেন' —এই গোছের কিছু একটা, বুঝলে। সব নির্ভর করছে অনীতা কোথা আছে তার উপর। প্রথমেই তার সঙ্গে দেখা হয়ে গেলে কেলেঙ্কারি—"

মোটর এসে বারান্দার সামনে দাঁড়াল। গণেশ একটা আড়িমুড়ি ভেঙে স্টিয়ারিং ছেড়ে নাবল নীচে।

সান্ত্বনা নাববার আগেই বারান্দার দরজাটা খুলে গেল। বেরিয়ে এল পরেশ। পরেশ ঘাড় ফিরিয়ে কাকে যেন হেঁকে বললে—“ছটু—এই ছটু—ব্রজেশ্বরবাবুরা এসে গেছেন, খবর দাও ভিতরে”—বলে নিজেই চলে গেল আবার ভিতরে।

একটা অজানা আতঙ্কে দু'জনেরই বুক কেঁপে উঠল। কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই আতঙ্কের সঙ্গে মিশল বিস্ময়। কপাট খুলতে না খুলতেই ঝুনু বেরিয়ে এল। তখনও থর থর করে' কাঁপছে। কান দুটো খাড়া। বারান্দায় একটু দাঁড়িয়েই এক ছুটে নেবে এল নীচে। আনন্দে কৃতজ্ঞতায় আবদারে গদগদ একেবারে। কি যে করবে ভেবে পেল না বেচারি, লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে অস্থির হয়ে উঠল।

“ওমা, ঝুনু যে”—বলে' উঠল সান্ত্বনা।

“ও আবার জুটল কি করে”—গলা বাড়িয়ে দেখবার চেষ্টা করলে সুশোভন।

“আপনাদের সেই কুকুরটা দেখছি যে”—গণেশ বলল—

“কেউ কুড়িয়ে দিয়ে গেছে বোধ হয়”

“হ্যাঁ। জিনিসপত্রগুলো নাবিয়ে ফেল”

সুশোভনের দিকে চেয়ে সান্ত্বনা বললে—“কেউ এসেছিল এখানে তাহলে”

“হ্যাঁ এবং সব ফাঁস করে' দিয়েছে হয় তো।”

“কে হতে পারে”

সুশোভন গম্ভীরভাবে তর্জ্জনী ও অঙ্গুষ্ঠ দিয়ে গোঁফ জোড়ার উপর তা দিতে লাগল।

“ওই চাকরটাকে জিগ্যেস করলে হয় না। উঁকি মেরেই সরে পড়ল কোথায় লোকটা”

“আমি যাই। আপনি অপেক্ষা করুন”

পরেশ আবার বেরিয়ে এল। ঠোঁটে মধুর একটি হাসি ফুটিয়ে সান্ত্বনা এগিয়ে গেল তার দিকে।

বিনীত নমস্কার করে' পরেশ বলল—“আপনারা যে এ সময়ে এসে পড়বেন তা আমরা আন্দাজ করতে পারি নি। ওঁরা তাই শিকারে বেরিয়ে গেছেন

সবাই। গিন্নিমাও সঙ্গে গেছেন। আপনারা আসবেন জানলে উনি অন্তত থাকতেন"

"তাতে কি হয়েছে। বরং ভালই হয়েছে এক হিসেবে। আমাদের আসবার খবর পেলে হয়তো শিকার পার্টিটাই মাটি হয়ে যেত। ট্রেন ফেল করে' আসতে পারি নি আমরা। ঝুনুকে কে দিয়ে গেল। কাল রাত্রে হারিয়ে গিয়েছিল। সে কি মুশকিল"

পরেশ স-স্নেহে চাইলে একবার ঝুনুর দিকে।

"সব শুনেছি আমরা। একটু আগেই এ অঞ্চলের একজন ভদ্রলোক দিয়ে গেলেন ওকে। তিনি আপনাদেরও চেনেন। কাল রাত্রের সব খবরও বললেন। তাঁর কাছে খবর পেয়ে আমরা বুঝলাম ব্যাপারটা—তখন গিন্নিমা চলে গেছেন—"

"কে বল তো ভদ্রলোকটি"

"সদারঙ্গবিহারীবাবু"

"ও"—সান্ত্বনা অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল একটু, তারপর তাড়াতাড়ি বললে—"জিনিসপত্রগুলো নাবিয়ে ফেলবার ব্যবস্থা কর তাহলে"

"হ্যাঁ, এই যে"

"সুশোভনবাবুর স্ত্রীও শিকারে গেছেন নাকি"

"তাঁরা তো আসেনই নি। কোনও খবরও আসে নি"

সান্ত্বনা মোটরের দিকে এগিয়ে গেল ধীরে ধীরে। বাঁ হাতের আঙুল দিয়ে একটু ইশারা করতেই সুশোভন মুণ্ড টেনে নিলে গাড়ির ভিতর। সে অধীর হয়ে উঁকি দিয়ে বোঝবার চেষ্টা করছিল ব্যাপার কতদূর গড়াল।

"আচ্ছা"—সান্ত্বনা আবার পরেশকে জিজ্ঞাসা করলে—"সদারঙ্গবাবু আসবার আগেই মেসোমশায়রা শিকারে বেরিয়ে গিয়েছিলেন, নয়? আমাদের খবর ওঁরা তাহলে কিছুই পান নি"

"না। পেলে কি আর বেরিয়ে যেতেন! ছকুবাবু আর আমি ছাড়া কেউ জানে না"

"ছকুবাবু ?"

"হ্যাঁ। গিন্নিমার দূর সম্পর্কের কে যেন হন। বেড়াতে এসেছেন।"

"ও। ছকুবাবুর সঙ্গে সদারঙ্গবাবুর দেখা হয়েছে তাহলে"

"হ্যাঁ। অনেকক্ষণ বসে' গল্প-সল্প করলেন দু'জনে"

"ও। আচ্ছা, জিনিসগুলো নাবিয়ে ফেল"

গণেশ ও পরেশ দু'জনে মিলে জিনিসগুলো সামনের 'হলে' রাখতে লাগল। সান্ত্বনা এগিয়ে গেল মোটরের দিকে।

"সুশোভনবাবু, আপনার নাবা চলবে না, শুধু তাই নয়, চাকরটা যেন আপনাকে দেখতে না পায়"

"অদৃশ্য হব কি করে! যাদুবিদ্যা তো জানা নেই। কেন কি হ'ল ?"

"পরেশ হরিমটর হিন্দু-পান্থ নিবাসের সমস্ত কথা শুনেছে"

"সমস্ত ?"

"কতটা ঠিক জানি না। কিন্তু সদারঙ্গবিহারীবাবু যখন ঝুনুকে এনেছিলেন তখন—"

"সেই ব্যাটাচ্ছেলে বাক্যবাগীশ এখান পর্যন্ত ধাওয়া করেছিল ? অ্যাঁ, বল কি ? আর অনীতার খবর কি ?"

"অনীতা এখানে নেই"

"যাক্, এটা সুখবর। কোথা সে এখন ? শিকারে—"

"সে আসেই নি"

"আসেই নি ? বল কি ? আসেই নি ? কোথা গেল সে তবে ?"

"তা এরা কি করে' জানবে। পরেশ বলছে, আপনাদের আসবার কথা ছিল কিন্তু আপনারা কেউ আসেন নি"

"কি হল অনীতার তাহলে! কি হতে পারে ?"

অতিশয় বিচলিত চিত্তে গাড়ির মধ্যেই উঠে দাঁড়াল সুশোভন।

"সে হয়তো আর একটা হোটেলে আর কারও সঙ্গে রাত কাটিয়ে আসছে একটু পরে"

অতিশয় স্বাভাবিক কণ্ঠে কথা ক'টি বলে' নির্ব্বিকারভাবে চেয়ে রইল সান্ত্বনা।

"না, রসিকতা ভাল লাগছে না সান্ত্বনা। ব্যাপার মোটেই সুবিধের মনে হচ্ছে না। আচ্ছা, সে কি ফিরে গেল নাকি? তা'হলে তো—আমি বরং চলে যাই, বুঝলে"

"আমিও তো তাই বলছি। পরেশের দৃষ্টি থেকে সরে' থাকতেও বলছি সেই জন্যে। হিন্দু-পান্থনিবাসের কীর্ত্তি ওঁরা যদি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে শুনে থাকেন তাহলে আপনার আত্মগোপন করে' এই মোটরেই সরে' পড়া উচিত। আমি বলব বিশেষ একটা জরুরি দরকারের জন্য আমার স্বামীকে এই মোটরেই ফিরে যেতে হল—"

"এবং সঙ্গে সঙ্গে তোমার স্বামী হয়তো হাজির হয়ে যাবেন পরের ট্রেনে"

"কালকের আগে তাঁর আসবার সম্ভাবনা নেই"

"কিন্তু শোন, আমরা সত্য কথাটা অকপটে বলব বলেই তো প্রস্তুত হয়ে এসেছি। তাই করি না কেন। কি দরকার এই লুকোচুরির? এক হোটেলে দু'জন রাত্রিবাস করলেই চণ্ডী অশুদ্ধ হয়ে যাবে এমন কোন কথা নেই। সে কথা যদি কেউ ভাবে, তাহলে নিতান্ত ইয়ে বলতে হবে তাকে—"

"কিন্তু একটা কথা ভেবে দেখুন"—সান্ত্বনা শান্তভাবে বোঝাতে লাগল—"ঝুনুকে সদারঙ্গবাবু এখানে যখন দিয়ে গেছেন তখন এখানকার ঠিকানা সংগ্রহ করতে হয়েছে তাঁকে গোঁসাইজির কাছে। গোঁসাইজি তাঁকে কতটা কি বলেছেন তাতো জানা নেই—তার ওপরই সব নির্ভর করছে"

"পরেশকে জিগ্যেস করেছিলে কিছু এ বিষয়ে?"

"নিশ্চয় না। তা কি করা যায়?"

"ধর যদি গোঁসাইজি সদারঙ্গবাবুকে সব কথা বলেই থাকেন যে আমরা একঘরে দু'জনে শুয়েছিলাম, তাহলে সে কথা কি গাড়োলটা এখানে এসে চাকরদের কাছে গল্প করবে—এও কি সম্ভব নাকি"

"ইচ্ছে করে' না করলেও কথায় কথায় বেরিয়ে পড়তে পারে বই কি। বলা যায় কি কিছু! ঝুনুকে নিয়ে কম কাণ্ড তো হয় নি, ঝুনুর গল্প করতে করতেই হয়তো বেরিয়ে পড়েছে সব। আমি আমার স্বামীর সঙ্গে হোটেলে ছিলাম, এর বেশী অন্য লোককে জানতে দেবার দরকারই বা কি। আপনি যদি এখন ফিরে যান লুকিয়ে, মানে, কেউ যদি আপনাকে দেখে না ফেলে, তাহলে আমি স্বচ্ছন্দে এখানে প্রচার করতে পারি যে আমি আমার স্বামীর সঙ্গে হিন্দু-পান্থনিবাসে ছিলাম, সকালে এখানে মোটরে করে' এসেছিলাম, হঠাৎ একটা জরুরি কাজের কথা মনে পড়ে' যাওয়াতে আমার স্বামীকে ফিরে যেতে হল, কাল নাগাদ আবার হয়তো তিনি এসে পড়বেন। তার পর কাল যদি উনি সত্যি সত্যি আসেন তখন আমি ওঁকে খুলে বলব সব। তারপর আপনারা স-স্ত্রীক এসে পড়ুন, কেউ ঘুণাক্ষরে কিছু জানতে পারবে না"

"তুমি দেখছি পাকা মিথ্যুক একটি। ওফ—! বেশ, ব্যাপারটা যদি এইভাবে দাঁড় করাতে পার মন্দ হবে না নিতান্ত"

সান্ত্বনা হেসে বললে, "এ সব ব্যাপারে মিথ্যে কথা বলায় দোষ নেই। সব দিক যাতে রক্ষা পায় তাই করাই ভালো নয় কি"

"বেশ। কিন্তু ভেবে দেখ আমি চলে গেলেই সব দিক রক্ষে হবে তো! ফাঁকি ধরা পড়া গিয়ে শেষকালে আরও জটিল কিছু না হয়ে পড়ে"

"না, তা হবে না। অনীতার খবর নেবার জন্যে আপনি তো যেতেই চাইছেন। আমি কেবল বলছি এখানে আত্মপ্রকাশ করবেন না। লুকিয়ে চলে যান আমি সব ঠিক করে' নিতে পারব"

"তা পারবে। যদি না ওই সরগরমবাবু হুড়মুড় করে' এসে আবার—"

"সে তখন দেখা যাবে। কিন্তু আপনি আর দেরি করবেন না। পরেশ আসছে এ দিকে, ডাকতেই আসছে বোধ হয় আমাদের। তাহলে ঠিক হল, কি বলব আমি এখানে"

"যা তোমার খুশী। কিন্তু আমি যদি অনীতাকে নিয়ে ফিরি আবার, কি করে' জানব তুমি কি বলেছ"

"আমি কি বলব, সেটা নির্ভর করছে এরা কতটা কি জেনেছে তার উপর। এখানে পরেশ ছাড়া আর একজন ভদ্রলোক আছেন কিনা"

"আবার কে"

সান্ত্বনাকে আর বুঝিয়ে বলতে হল না। অতিশয় নাটকীয় ভাবে ছকুবাবু স্বয়ং আত্মপ্রকাশ করলেন! হঠাৎ বারান্দায় বেরিয়ে এসে সামনের দিকে দুই হাত প্রসারিত করে' তিনি বলে উঠলেন—"আঁই, আঁই রেঁায়া আঁয়ি আঁয়ি—এতানা দেরি কাহে ভইল—আঁয়ি, উপর পাধারি—"

হাস্যোদ্ভাসিত মুখ তাঁর। খোঁচা খোঁচা গোঁফগুলো পর্য্যন্ত হর্ষ-কণ্টকিত।

"সর্ব্বনাশ, ও কি!"

সান্ত্বনাও সবিস্ময়ে ফিরে তাকিয়েছিল।

"বেহারের ভাষা বোধ হয়। উনি বলিয়া জেলায় ছিলেন, কিছুদিন ওঁর মুখে এই ধরনের কথা শুনেছি"

"যাব কিনা একটু দ্বিধা হচ্ছিল, কিন্তু এ ভাষা শোনার পর আর দ্বিধা নেই। বুঝলে, আমি চললাম। ঈশ্বর তোমাকে রক্ষা করুন। গণেশ"

"এই যে"—

"আঁয়ি, আঁয়ি, রেঁায়া, আঁয়ি—"

সান্ত্বনা দাঁড়িয়ে রইল স্মিতমুখে।

গণেশ দ্রুত হস্তে 'গিয়ার' বদলে গাড়ি স্টার্ট করে' দিলে এবং স্টিয়ারিং ধরে' সোঁ করে' গাড়িটা ঘুরিয়ে একেবারে পঁচিশ মাইল বেগে সুরু করলে চালাতে। গাড়িটা দৃষ্টির বাইরে বেরিয়ে যেতেই সান্ত্বনা সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগল বারান্দায়। পরেশের দিকে চেয়ে বললে—"একটা জরুরি কাজের কথা মনে পড়াতে উনি ফিরে গেলেন এই গাড়িতে"

"ও"

"কালই ফিরবেন সম্ভবতঃ"

জনৈকা মহিলার সান্নিধ্য সত্ত্বেও ছকুবাবু আত্মসংবরণ করতে পারলেন না। তাঁর ভাষা বদলে গেল। তিনি বলে ফেললেন—"আরে মোলো, এ যে চোঁচা দৌড় দিলে! তাজ্জব কি বাত!"

তারপর সান্ত্বনার নমস্কারের উত্তরে প্রতিনমস্কার করে' ছকুবাবু বললেন—"ব্যাপারটা ঠিক বুঝলাম না তো। আসুন, ভিতরে আসুন"

শুনে দমে' গেলেন ছকুবাবু। চলে' গেলেন ভদ্রলোক। আফশোষ কি বাত!

"আপনি বলিয়া জেলার ভাষা বোঝেন?"

"না, আমি বুঝি না"

ভদ্রমহিলার সঙ্গে বিশুদ্ধ বঙ্গভাষায় আলাপ করে' যেতে হবে না কি ক্রমাগত! সর্ব্বনাশ। তাহলে তো শক্তি-সংগ্রহ করা দরকার। শক্তি-সংগ্রহ করবার উদ্দেশ্যে তিনি লাইব্রেরির দিকে যাচ্ছিলেন—এমন সময় সান্ত্বনা কথা কয়ে উঠল।

"আমাদের বন্ধু সদারঙ্গবাবু খুব বিরক্ত করে' গেছেন নিশ্চয় আপনাকে"

"না, না বিরক্ত আর কি। আপনার কুকুরটা যে পাওয়া গেছে এতে খুশীই হয়েছি বরং"

"হ্যাঁ কুকুরটার জন্যে আমরা—বিশেষ করে' আমি—বড় চিন্তিত হয়ে পড়েছিলাম। সব শুনেছেন নিশ্চয়"

"নিশ্চয়। শুনতে বাকি নেই আর। সব শুনেছি। ভদ্রলোক শুনিয়ে তবে ছেড়েছেন"

সান্ত্বনা একটু ইতস্তত করতে লাগল, তারপর ছকুবাবুর দিকে মাথা নেড়ে এমন একটা প্রত্যাশাসূচক ভঙ্গী করে' রইল যার অর্থ—যা শুনেছেন বলুন না সব।

"উঃ কি রাতই কেটেছে আপনাদের কাল"—মুচকি হেসে বললেন ছকুবাবু।

ঈষৎ অনুনাসিক আবদার-তরল-কণ্ঠে সান্ত্বনা বললে, "আপনি হাসছেন কিন্তু কাল রাত্রে কি বিপদেই যে পড়েছিলাম আমরা"—

"বহুবচনটা কি গৌরবে ব্যবহার করছেন? বিপদে তো পড়েছিলেন আপনার স্বামী ভদ্রলোক। শীতকালে রাতদুপুরে বিছানা ছেড়ে কুকুর আনতে দৌড়ানো অ্যাঁ? হা হা হা"—

"হা—হা—হা"—কলকণ্ঠে সান্ত্বনাও হেসে উঠল—"হ্যাঁ তা দৌড়েছিলেন বটে। কুকুরটা এত কাঁদছিল আমরা ঘুমুতেই পারছিলাম না যে"

"তাই ভদ্রলোক বিছানা ছাড়তে বাধ্য হয়েছিলেন। সমঝেছি। আমারও এ অভিজ্ঞতা হয়েছিল একবার। কিন্তু কুকুরের জন্য নয়, শেরের, মানে বাঘের জন্য। দিল ঘাবড়ে দিয়েছিল একেবারে"

"ও"—সান্ত্বনার চক্ষু বিস্ফারিত হয়ে উঠল।

"পোখমনবাবুর সঙ্গে শিকারে যেতে হয় কিনা। বাঘের সে কি আবাজ—ভর রাত বসে কাটাতে হয়েছে—ডরে দিল কাঁপছে। আপনার স্বামী এতটা বিপদে পড়েন নি। কুকুরটাকে খুলে দিয়ে এসে বিছানায় আবার এসে তখখুনি শুলেন তো—দু'চার লহমার ব্যাপার—"

চোখ মটকে আবার হাসলেন ছকুবাবু।

আপনাদের কাণ্ড সব শুনেছি, কি ভাবছেন, সব জানি! হা-হা-হা—"

মুখে স্মিত হাসি ফুটিয়ে আনত নয়নে বসে রইল সান্ত্বনা। ছকুবাবু সোৎসাহে লাইব্রেরির দিকে চলে গেলেন।

খাশা মেয়ে। অচেনা এক ভদ্রমহিলাকে নিয়ে বিকেলটা কেমনভাবে কাটবে ভাবনায় পড়েছিলেন ছকুবাবু। এখন মনে হচ্ছে—খাশা কাটবে। চোঁ চোঁ করে' তিনি সান্ত্বনার স্বাস্থ্য পান করে' ফেললেন খানিকটা।

...একটু পরে তিনি দেখলেন সান্ত্বনা কাপড়চোপড় বদলে একটি বেতের চেয়ার টেনে নিয়ে লনের দিকে মুখ করে' বারান্দায় এসে বসল। বেশ ছিমছাম মেয়েটি। ছকুবাবু তর্জ্জনীটি নাকের উপর লঘুভাবে রেখে লাইব্রেরির জানলা থেকে সান্ত্বনার গতিবিধি লক্ষ্য করছিলেন। সান্ত্বনাও যেন বুঝতে পারছিল আড়াল থেকে কেউ

তাকে লক্ষ্য করছে। আড়ষ্টতাটা কিছুতেই সে যেন কাটিয়ে উঠতে পারছিল না। স্বাভাবিক হবার চেষ্টা করতে গিয়ে আরও যেন অস্বাভাবিক হয়ে উঠছিল।

…আকাশটা কেমন যেন ঘোলাটে গোছের। বাতাসে ইউক্যালিপটাস্ গাছের ডালপালাগুলো নুয়ে নুয়ে পড়ছে। চীৎকার করে' চলেছে একদল দাঁড়কাক। সান্ত্বনার কিন্তু প্রকৃতি-পর্য্যবেক্ষণ করার মতো মানসিক অবস্থা ছিল না। জটিল পরিস্থিতিটার কথাই সে ভাবছিল লনের দিকে নিবদ্ধদৃষ্টি হয়ে। নিজের নির্বুদ্ধিতার জন্যে কি জটই না সে পাকিয়ে তুলেছে। কি করে যে এখন ছাড়ানো যায়! ভ্রূকুঞ্চিত করে' নিবিষ্টচিত্তে ভাবছিল সে। মনে হচ্ছিল সে যেন কোন অদৃশ্য দাবার ছকের দিকে চেয়ে চাল ভাবছে। দিগ্বিজয়বাবুর পল্লীভবনের নিবিড় শান্তি কিন্তু ধীরে ধীরে অজ্ঞাতসারে প্রভাব বিস্তার করছিল তার মনে। অর্দ্ধ-বিস্মৃত রূপকথালোকের স্নিগ্ধ মায়া চারিদিকে ছড়িয়ে আছে, সংসারের দুঃখ-যন্ত্রণার জ্বালাকে জুড়িয়ে দিচ্ছে যেন। সান্ত্বনার ছেলেবেলার খানিকটা এখানে কেটেছে। কোলকাতার অত্যুগ্র কোলাহলের পর এখানকার শান্তি যে কি মধুর তা অজানা নেই তার। চুপ করে' বসে রইল সে। গাছের মর্ম্মর আর পাখীর ডাক ছাড়া আর কোনও শব্দ নেই। অনেক দূরে একটা মালী ফুলের গামলাগুলো নিয়ে কি যেন করছে। আরও দূরে একটা ছোটবাছুর মনের উল্লাসে ছুটে বেড়াচ্ছে লেজ তুলে। নানা রকম দুশ্চিন্তা সত্ত্বেও ধীরে ধীরে চোখ বুজে এল সান্ত্বনার। পল্লীপ্রকৃতির স্নেহ-ক্রোড়ে আত্মসমর্পণ করল সে ধীরে ধীরে।

…এখানে কেউ ছল চাতুরি করবে কেন? কিসের প্রয়োজন? কুকুর হারিয়ে গিয়েছিল—একজন বন্ধু সেটা পেয়ে ফেরত দিয়ে গেলেন—এ আর এমন কি একটা ঘটনা, যার জন্যে তার গত চব্বিশ ঘণ্টার গতিবিধির তন্ন তন্ন অনুসন্ধান করা প্রয়োজন? ভাবনা কি! তাকে কেউ জেরা করতেও আসছে না। মাসীমাকে সমস্ত ঘটনাটা খুলেই বলবে সে লুকিয়ে। আর বাকি সকলের জন্য অত মিথ্যার জাল বোনবার দরকারই বা কি!

…নিজের স্বামীর উপর আস্থা আছে। মনে মনে ছবিটা কল্পনা করছিল সে।

সবিস্ময়ে ভ্রূকুঞ্চিত করে' শুনবে, তারপর ছোট্টহাসির আভায় মিলিয়ে যাবে সমস্ত ভ্রূকুটি।

··· গোঁসাইজির সঙ্গে জীবনে আর দেখাই হবে না হয় তো।

···সদারঙ্গবিহারীলাল ? হ্যাঁ, ও ভদ্রলোককে সামলাতে হবে। মোটরবাইকে চড়ে' আর অধিক দূর অগ্রসর হবার পূর্ব্বেই ওকে রুকতে হবে। ওঁকে সঙ্গে করে' নিয়ে গেলেই হবে না হয় তাঁর বাড়িতে একদিন। এখান থেকে কত দূরই বা। কিন্তু না, একটু সাবধানতার প্রয়োজন আছে। গোঁসাইজির হিন্দু পান্থনিবাসে অবস্থিত সেই অতিকায় ছাপ্পর খাটে যে রহস্য নিহিত আছে তার খবরটা ভদ্রলোক জানেন যে। একটু সাবধানতার প্রয়োজন আছে বই কি। যিনি তাঁদের এক খাটে পাশাপাশি শুয়ে থাকতে প্রত্যক্ষ করেছিলেন তিনি ছাড়া সদারঙ্গবিহারীলালই এক্ষেত্রে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ভয়ঙ্কর সাক্ষী। পরেশ কিম্বা ছকুবাবু তার সাজানো-স্বামীটিকে চাক্ষুষ করেন নি বটে, কিন্তু সদারঙ্গবিহারীলাল রীতিমত গল্প করেছেন তার সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে' উচ্ছ্বসিত হয়ে। গোঁসাইজি নিশ্চয় তাঁর কাছে তাদের পাশাপাশি শুয়ে থাকার গল্পটাও করেছেন। গোঁসাইজি যে রকম নিখুঁত প্রকৃতির লোক—নিজের গল্পকে বাস্তব রূপ দেবার জন্য সদারঙ্গবিহারীলালকে উপরে শোবার ঘরে নিয়ে গিয়ে ছাপ্পর খাটটা দেখিয়েছেনও হয়তো। মোট কথা, যা জানবার সবই তিনি জেনেছেন এবং যে রকম উর্ব্বরমস্তিষ্ক উৎসাহী লোক, হয় তো অনেক কিছু রংও চড়িয়েছেন তাতে কল্পনা থেকে। না, সদারঙ্গবিহারীলাল সম্বন্ধে সাবধানতার খুবই প্রয়োজন আছে।

······সুশোভনের সম্বন্ধেও। ওই স্বল্পবুদ্ধি দায়িত্বজ্ঞানহীন লোকটিকে রীতিমত তালিম না দিয়ে অমন হুড়মুড় করে' পাঠানোটা ঠিক হয় নি মোটেই। কোন অবস্থায় কি বলতে হবে, তা অন্তত বলে' দেওয়া উচিত ছিল। অনীতার কাছে সাফাই গাইবার জন্য উলটো-পালটা যা-তা বলে' বসবে হয় তো।

······ইউক্যালিপটাস্ গাছগুলোর মাথায় আকাশটা ঘনঘটাচ্ছন্ন হয়ে এল বেশ। দাঁড়কাকগুলো আরও জোরে চীৎকার করছে। মালীটা ঘাড় তুলে চেয়ে দেখলে

একবার, তারপর টবটা মাটিতে নাবিয়ে ছুটল তার ঘরের দিকে। বাছুরটাও ছুটে পালাল। বৃষ্টি এল। মানুষের বহুবিধ ভ্রান্তির জন্য রোষে ক্ষোভে দুঃখে প্রকৃতি যেন কেঁদে ফেললেন।

সান্ত্বনা উঠে ভিতরে গেল। তার চিত্ত তখন রীতিমত বিচলিত।...

পরেশ এসে সসম্ভ্রমে খবর দিলে খাবার দেওয়া হয়েছে। সান্ত্বনা গিয়ে দেখলে ছকুবাবুও চায়ের টেবিলে সমাসীন। সান্ত্বনার হাব-ভাব দেখে দমে' গেলেন কিন্তু ছকুবাবু। যে রকম উচ্ছলতা তিনি আশা করেছিলেন তাতো মোটেই নেই। মিইয়ে গেল কেন হঠাৎ! তবু তিনি হাল ছাড়লেন না। নানাপ্রসঙ্গ উত্থাপন করে' ভাব জমাবার চেষ্টা করতে লাগলেন। ছোট ছেলের সঙ্গে ভাব করবার জন্যে লোকে যেমন নানা উপায় উদ্ভাবন করে, ব্যাপারটা অনেকটা সেই গোছের দাঁড়াল। কিন্তু তেমন জুত করতে পারলেন না তিনি। তাঁর মনে হতে লাগল একটা অদৃশ্য যবনিকা যেন সান্ত্বনার মনকে তাঁর রসিকতা-কিরণ থেকে আড়াল করে' রাখছে। মনে মনে চটতে লাগলেন খুব, অথচ মুখে দেঁতো হাসি হেসে নানা রকম রসিকতাও করে' যেতে লাগলেন। সান্ত্বনাও গম্ভীরভাবে শুনে যেতে লাগল। খাদ্যপ্রসঙ্গে অবতীর্ণ হলেন শেষে ছকুবাবু। কোনও দিক থেকে সুবিধে করতে না পেরে মনের নেপথ্যলোকে রাগটা জমে' উঠেছিল বেশ। ঝালটা ঝাড়লেন ডালের উপর। লুচির সঙ্গে ঘন বুটের ডাল ছিল খানিকটা।

"ডালটা ভাল লাগছে আপনার? রাম কহো, এর নাম কি ডাল! এরা কি ডালের মর্ম্ম বোঝে! বুটের ডাল বলে' চেনবার উপায় আছে! ঘেঁটেঘুঁটে লেই বানিয়েছে একটা। আমার 'খাওয়াশ'টা যদি থাকত, ডাল কাকে বলে দেখিয়ে দিতাম আপনাদের। আপনাদের 'খাওয়াশ' কি বাঙালী? 'খাওয়াশ' আছে নিশ্চয়"

"না বোধহয়। 'খাওয়াশ' জিনিসটা কি"

"সীয়ারাম, আপনি বুঝি বাইরে এক ডেগও যান নি। 'খাওয়াশ' মানে চাকর"

"ও। না, বাংলার বাইরে আমি যাই নি কখনও"

"তাহলে ডালের মর্ম্মই বোঝেন নি। ওদেশের বুটের ডাল, বুটের হালুয়া, পুদিনার চাটনি, লিট্টি, ডালরুটি, তিলুয়া, ঠেকুয়া, সিদ্ধির সরবৎ—অপূর্ব্ব জিনিস সব। আবার ওদেশে ফিরতে হবে দেখছি। ডালই আমাকে তাড়াবে এ দেশ থেকে"—

"ওদেশের ডাল খুব ভাল বুঝি"

"বেশক্"

"শুনে আমারও যেতে লোভ হচ্ছে"

মুচকি হেসে বললে বটে সান্ত্বনা, কিন্তু তার একটুও ভাল লাগছিল না। একটু আগে সামনের বারান্দায় বেতের চেয়ারটিতে একা বসে তার মনে যে শান্ত স্নিগ্ধ ভাবটি এসেছিল তা যেন খিঁচড়ে গেল। একটা অজানা আশঙ্কা তার মনের শান্তিকে বিঘ্নিত করছিল, এই ছকুবাবু লোকটির অসহ্য আস্ফালনও নষ্ট করছিল এখানকার নির্জ্জন স্নিগ্ধতাকে। মনে হচ্ছিল একটা বাঁদর যেন এসে মন্দিরে ঢুকেছে।

আহারান্তে ছকুবাবু উঠলেন এবং দাঁড়ালেন গিয়ে জানলার ধারে। বৃষ্টিটা থেমেছে। একটু-আধটু রোদও দেখা যাচ্ছে। প্রকৃতির মেজাজটা একটু যেন প্রসন্ন হয়েছে মনে হল। ছকুবাবুর মেজাজও প্রসন্ন হয়েছিল। সে কথা বললেনও তিনি। এমন কি বৈকালিক ভ্রমণের ইচ্ছাও প্রকাশ করলেন। বললেন—দেখে আসি ওরা কোনদিকে গেল। আপনি যাবেন? চলুন না"। সান্ত্বনা ভদ্রভাবে অসম্মতিজ্ঞাপন করাতে একাই বেরিয়ে পড়লেন তিনি।···বারান্দায় সূর্য্যালোক এসে পড়ল আবার। মালীটা তার ঘর থেকে বেরিয়ে আবার গামলাগুলো পরিষ্কার করতে লাগল। সুরেশ্বরী দেবীর বুড়ো স্প্যানিয়েলটা থাবার উপর মুখ রেখে শুয়েছিল গম্ভীরভাবে। ঝুনু তার চারদিকে লাফালাফি করে' তাকে উৎসাহিত করবার চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু উৎসাহের কোনও

লক্ষণ প্রকাশ করল না সে। প্রবীণ দাদামশাই দামাল নাতনীর দুরন্তপনা সহ্য করেন যেমনভাবে—তেমনি একটা মুখভাব করে' সে থাবার উপর মুখ রেখেই শুয়ে রইল। সাইকেল দেখা গেল দূরে একটা। টেলিগ্রাফ পিওন। সুরেশ্বরী দেবীর নামে টেলিগ্রাম। সান্ত্বনাই সই করে' নিলে। হলদে খামটার দিকে চেয়ে রইল সে খানিকক্ষণ ভ্রূকুঞ্চিত করে'। কার টেলিগ্রাম হতে পারে? খুলবে? না, সেটা উচিত হবে না। ভিতরে গিয়ে পরেশের হাতে দিয়ে দিলে সেটা। পরেশ সুরেশ্বরী দেবীর চিঠি লেখার টেবিলে এমনভাবে সেটা রেখে দিলে—যাতে এসেই তিনি দেখতে পান।

মৃত্যুর সম্বন্ধে যেমন ঝড়বৃষ্টির সম্বন্ধেও ঠিক তেমনি। প্রত্যেক মানুষের ধারণা আমি ঠিক বেঁচে যাব। বৃষ্টিটা অপ্রত্যাশিতভাবে মোটেই আসে নি। আকাশ অনেকক্ষণ থেকেই ঘনঘোর হয়েছিল। তবু কিন্তু অনেকগুলি লোক ভিজে গেলেন এতে। রায় বাহাদুর দিগ্বিজয় একজন। সুরেশ্বরী দেবী আর একজন। মাধব গোমস্তার বাড়ি থেকে বেরিয়েই বৃষ্টিটা পেয়েছিলেন তিনি। কিন্তু তিনি ফিরলেন না, কারণ একটু-আধটু বৃষ্টিতে ভিজলে তাঁর কিছু হয় না, এই তাঁর ধারণা। দ্বিতীয় কারণ শিকারীদের জন্যে যে থাবার তিনি এনেছেন তিনি না গেলে সেগুলো অভুক্তই পড়ে থাকবে। গ্রামের আরও যে দু'জন লোক শিকারে যোগ দিয়েছিলেন তাঁরাও ভিজেছিলেন বেশ। গোবর্দ্ধনবাবু ভিজে ন্যাতা হয়ে গিয়েছিলেন বললেই হয়। শিকারের উৎসাহ-বহ্নিতেও জল পড়েছিল প্রচুর। প্যাচপেচে কাদায় ছপ ছপ করতে করতে একটা বড় গাছতলায় সবাই সমবেত হলেন এসে!

"যাচ্ছেতাই কাণ্ড"—দিগ্বিজয় বললেন সুরেশ্বরীর দিকে চেয়ে···"এঃ—বড্ড ভিজে গেলে যে তুমি। আর শিকারে কাজ নেই, চল বাড়ি ফেরা যাক"

"আমি? আমি কিচ্ছু ভিজি নি। কিন্তু আমার মনে হয় ফেরাই ভাল; তুমি বড্ড ভিজেছ—এঁরাও—"

"কি যে বল, আমি একটুও ভিজিনি"

"তোমার গা থেকে টপ টপ করে' জল পড়ছে দেখতে পাচ্ছি, আর তুমি বলছ ভিজিনি !

"টপ টপ করে' জল পড়ছে ওয়াটার-প্রুফ বেয়ে। ভাগ্যে ওটা সঙ্গে এনেছিলাম। ভিতরে কিছু ভেজেনি আমার। শোন, গাড়ি ক'রে তুমি বরং ফিরে যাও, তোমার শাড়ি ভিজে সপসপ করছে"

সুরেশ্বরী দেবী চুপ করে' রইলেন।

"সত্যি, তোমাদের শিকারটা মাটি হল"

"বিশ্রী দিন আজ! কিচ্ছু ভালো লাগছে না আমার"

এ সুযোগ সুরেশ্বরী দেবী উপেক্ষা করলেন না। দিগ্বিজয় নিজমুখে স্বীকার করেছেন তাঁর কিছু ভাল লাগছে না!

"চল তবে ফেরাই যাক"

তাঁর কণ্ঠস্বরে বিজয়িনীসুলভ সুর বেজে উঠল।

অন্যান্য পথিকরাও ভিজেছিলেন এ বৃষ্টিতে। একটা বুড়ো চাষা ভিজতে ভিজতে ছুটছিল। শুধু ছুটছিল না, চীৎকারও করছিল প্রাণপণে।

গণেশ খুব ভেজেনি। তার গাড়ির রেডিয়েটার আবার খারাপ হয়েছিল। ঝুঁকে তারই তদারক করছিল সে, এমন সময় বৃষ্টিটা এল। সঙ্গে সঙ্গে গাড়ির ভিতর ঢুকে সে জানলার কাচগুলো তুলে দিলে—আর বিরক্ত মুখে ভাবতে লাগল কি অশুভক্ষণেই গাড়ি নিয়ে বেরিয়েছিল!

সুশোভন বেশ ভিজেছিল। কিন্তু নিজের চিন্তাতেই এত তন্ময় ছিল সে যে বৃষ্টি নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় ছিল না তার। সে হাঁটছিল। দ্রুতবেগে হাঁটছিল ফাৎনাফিরিঙ্গিপুর অভিমুখে। আর মনে মনে ভাববার চেষ্টা করছিল কোন ট্রেন কখন পাওয়া যাবে, কাকে কি টেলিগ্রাম করবে, আর ফোন করবার সুযোগ যদি পাওয়া যায় কি বলবে ফোনে।

স্বয়ম্প্রভা দেবী যে ট্রেনটায় আসছিলেন সেটাও ভিজেছিল বৃষ্টিতে। জিতুবাবু সেদিকে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করাতে স্বয়ম্প্রভা বললেন, "তুমি বাজে কথা বলে' অন্যদিকে আমার মন ফেরাবার চেষ্টা করছ বুঝতে পারছি। কিন্তু অন্য কোনও কথা ভাবব না আমি এখন। ভাবতে চাই না"—জিতু সরকার আর কিছু না বলে' বাতায়ন পথে বাইরের দিকে চেয়ে রইলেন। সেই একই ট্রেনে—ঠিক তিনটি কামরা পরে—অধ্যাপক ব্রজেশ্বরবাবুও ছিলেন। তিনি এককোণে বসে' সেদিনকার কাগজটা পড়ছিলেন নিবিষ্টচিত্তে। কাচের জানলাটা বন্ধ ছিল। বৃষ্টির শব্দে বাইরের দিকে ভ্রূকুঞ্চিত করে' চাইলেন তিনি একবার, তারপর আবার কাগজে মন দিলেন।

বাইক-বিহারী সদারঙ্গবিহারীলালেরই সব চেয়ে বেশী ভেজা উচিত ছিল। কিন্তু তিনি ঊর্দ্ধশ্বাসে বাইক চালিয়ে হনুমানপুরে পৌঁছে গিয়েছিলেন ঠিক। বিশেষ ভেজেন নি।

যাঁর ভেজবার কথা নয়, যিনি কখনও কোনও উচ্ছৃঙ্খল ব্যাপারে নিজেকে জড়াতে চান না, সেই গোঁসাইজি ভীষণভাবে পড়ে গেলেন এই উচ্ছৃঙ্খল ঝড়-বৃষ্টির খামখেয়ালী খপ্পরে। গোঁসাইজি কদাচিৎ বাড়ি থেকে বের হন। কিন্তু সেদিন প্রিয়বন্ধু নিতাই বৈরাগী নিমন্ত্রণ করেছিল তাঁকে। বাড়িটা একটু দূরে হওয়াতে যাবেন কি না ইতস্তত করছিলেন—কিন্তু জনৈক সহৃদয় গাড়োয়ান বিনা ভাড়ায় নিজের গরুর গাড়িতে চড়িয়ে নিয়ে যেতে রাজি হয়ে গেল যখন, তখন আর দ্বিধা রইল না। ফিরতি মুখে গাড়োয়ান নিয়েও আসবে তাঁকে। তিনি ফদকা এবং পার্শ্ববর্ত্তী তাড়ির দোকানের চাকর গোকুলের হাতে তাঁর হিন্দু পান্থনিবাস ও অসুস্থ গুরুভগ্নীর ভার দিয়ে নিতাই বৈরাগীর সঙ্গসুখ লাভ করতে বেরিয়ে পড়েছিলেন। একটি ছাতাও ছিল তাঁর—রেলিব্রাদার্সের বৃহত্তম ছাতা, উপরে শাদা কাপড়ের মলাট দেওয়া—তবু কিন্তু তিনি রক্ষা পেলেন না। ঝড়-বৃষ্টির সমস্ত তোড়টা তাঁর উপর পড়ল এসে।

(১৮)

সদারঙ্গবিহারীলাল যে ঐতিহাসিক মন্দির ও মূর্ত্তিগুলির উল্লেখ স্থশোভনের কাছে করেছিলেন সেগুলি দেখতে হলে যে ষ্টেশনে নাবা দরকার সেই ষ্টেশনে নেবেই মুচুকুন্দকুণ্ডলেশ্বরীর জন্যও গাড়ি বদল করতে হয়। স্থতরাং অধ্যাপক ব্রজেশ্বর দে সেই ষ্টেশনে নেবেছিলেন। নেবে নিজের খদ্দরী ঝোলা থেকে কিছু ফলমূল বের করে' এবং ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী দোকানটা থেকে কিছু লুচি ভাজিয়ে নিয়ে আহারটা সমাধা করে' নিলেন তিনি প্রথমে। তারপর হাতঘড়িটার দিকে চেয়ে দেখলেন। ট্রেনের জন্য অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে এখনও। ষ্টেশনের দেওয়ালে টাঙানো টাইম-টেবিলটা দেখলেন আর একবার। হ্যাঁ, এখনও অনেক দেরী আছে ট্রেনের। ষ্টেশন মাস্টারের কাছে গেলেন। তাঁর কাছে নিজের খদ্দরের ঝোলাটি এবং স্যুটকেসটি গচ্ছিত রেখে বেরিয়ে পড়লেন তিনি ষ্টেশন থেকে। বেশ দ্রুত পদক্ষেপেই বেরিয়ে পড়লেন। অধ্যাপক ব্রজেশ্বর দে আস্তে হাঁটেন না কখনও। ঐতিহাসিক মানুষ তিনি। রাউতপুরের উক্ত প্রাচীন মন্দির ও মূর্ত্তিগুলির কথা তিনিও শুনেছিলেন। এ স্থযোগ ত্যাগ করা অনুচিত হবে তাঁর মনে হল। একটু দূর গিয়ে স্থানীয় একটি লোকের সঙ্গে দেখা হল তাঁর। লোকটি তাঁকে সোজা একটি রাস্তা দেখিয়ে দিয়ে বললে—"এ রাস্তা দিয়ে গেলে ঘুর হবে একটু, মাঠামাঠি গেলে শিগ্‌গির পৌঁছবেন।" অধ্যাপক ব্রজেশ্বর দে মাঠে নেবে পড়লেন।

...মন্দিরের কাছে পৌঁছে হাতঘড়িটার দিকে চাইলেন একবার। তারপর চুপ করে' দাঁড়িয়ে রইলেন। আর একবার হাতঘড়িটা দেখলেন। অবাক হলেন একটু! মোটে তিন মিনিট কাটল। হঠাৎ তাঁর মনে হল স্থবিশাল মন্দিরটা যেন আধুনিকতার সমস্ত হৈ চৈ হুড়োমুড়িকে অগ্রাহ্য করে' অচঞ্চল গাম্ভীর্য্যসহকারে সময়ের গতিরোধ করে' দাঁড়িয়ে আছে! কথাটা মনে হতেই তাঁর ডানদিকের ভ্রূর শেষ প্রান্তটা তড়াক করে' উপরের দিকে উঠে গেল খানিকটা। তারপর

সচেতন হলেন তিনি—সময় নষ্ট হচ্ছে—কবিত্ব করে' সময় নষ্ট না করে' মন্দিরটাকে দেখা উচিত আগে ভাল করে' নানাদিক থেকে।

একটু এগিয়ে একটা কোণ ঘুরেই থমকে দাঁড়াতে হল তাঁকে। যা চোখে পড়ল তা অপ্রত্যাশিত। সামনেই একটা মোটর বাইক স্ট্যাণ্ডের উপর দাঁড় করানো রয়েছে। তার সামনেই মন্দিরের একটা সিঁড়ি। সিঁড়ির পাশেই প্রকাণ্ড একটা সুড়ঙ্গ-গোছের, মাটির নীচে চলে গেছে। তার ভিতর হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকেছেন কে একজন। তাঁর দেহের নিম্নার্দ্ধ—বিশেষ করে' পশ্চাদভাগটা—দেখা যাচ্ছে কেবল। এই সুযোগে একটা ছোঁড়া পা দিয়ে তার মোটর-বাইকটা ফেলে দেবার চেষ্টা করছে। ব্রজেশ্বরবাবুর বুঝতে দেরি হল না যে মোটর-বাইক ওই ভদ্রলোকের, ছোঁড়াটা দুষ্টুমি করবার চেষ্টায় আছে। বাইকটা পড়ে' গেলে জখম হতে পারে। পরুষ কণ্ঠে ধমকে উঠলেন তিনি—"এই কি হচ্ছে—"

ছোঁড়াটা ছুটে পালাল এবং নানা রকম কসরৎ করে' সুড়ঙ্গ থেকে নিজের দেহকে অতি কষ্টে মুক্ত করে' বেরিয়ে এলেন সদারঙ্গবিহারীলাল। হাতে টর্চ।

"কি! বলছেন কি! সুড়ঙ্গের ভিতরও খানিকটা কারুকার্য্য আছে কি না আমি সেইটে দেখছিলাম। মানে, আশা করি অন্যায় হয় নি তাতে কিছু। আপনি কি প্রত্নতত্ত্ববিভাগের কেউ?"

"না। আমি—"

"এই মন্দিরের কারুকার্য্য সম্বন্ধে কিছু লেখবার ইচ্ছে আছে আমার। আপনি যদি প্রত্নতত্ত্ববিভাগের কেউ না হন তাহলে হঠাৎ অমন ধমকে উঠলেন যে! মাথাটা এমন ঠুকে গেছে আমার। উঃ—"

মাথার পিছন দিকে হাত বুলোতে লাগলেন তিনি।

"আমি আপনাকে কিছুই বলি নি। এ মোটর-বাইক কি আপনার?"

"হ্যাঁ, আমারই। কিন্তু এ কথাই বা জিগ্যেস করছেন কেন তাও তো বুঝতে পারছি না। আমি এ নিয়ে চটাচটি করতে চাই না, কিন্তু অমন আচমকা চীৎকার করবার সত্যি কি কোনও দরকার ছিল? আমার মোটর-বাইক নিশ্চয়

আপনার কোনও ক্ষতি করে নি। আশেপাশে প্রচুর জায়গা রয়েছে, স্বচ্ছন্দে আপনি চলে' যেতে পারতেন। কিছু মনে করবেন না, কিন্তু ওখানে মোটর-বাইক আমি কেন রাখতে পাব না তা আমি বুঝতে পারছি না। বিশেষ আপনি যখন প্রত্নতত্ত্ববিভাগের কেউ নন তখন অমন করে' চেঁচাবার—”

“মশাই, আমার কথাটা শুনুন আগে শেষ পর্য্যন্ত। শুনলে হয় তো আপনার রাগ আর থাকবে না—”

“না, না, রাগ আমার হয় নি, রাগের প্রশ্নই উঠছে না। আপনার চীৎকারে আমি এমন চমকে উঠেছি যে মাথাটা ঠুকে গেছে। সুড়ঙ্গের ভিতর সব পাথর কিনা—”

“একটা ছোঁড়া আপনার বাইকটা ফেলে দেবার চেষ্টা করছিল, আমি তাকেই একটা ধমক দিয়েছিলাম”

“ও, তাই না কি! আরে বাঃ—সো সরি, কিছু মনে করবেন না মশাই, ক্ষমা করুন, মানে করতেই হবে। ছি ছি ধারণার অতীত ছিল—ঠিক—মানে, আচমকা মাথা ঠুকে গেলে মানসিক অবস্থাটা একটু—বুঝতেই পারছেন। ধন্যবাদ অসংখ্য ধন্যবাদ, অসংখ্য”

এগিয়ে এসে বাইকটা নেড়ে চেড়ে দেখলেন একবার। ব্রজেশ্বরবাবু লক্ষ্য করলেন তাঁর দু'টি হাতেই প্রচুর কাদামাটি লেগে রয়েছে। গবেষণার ফল সম্ভবতঃ। সদারঙ্গবিহারীলাল ব্রজেশ্বরবাবুর মুখের দিকে চেয়ে ক্ষমা-প্রার্থনা-ব্যঞ্জক অদ্ভুত রকম ছোট্ট হাসি হাসলেন একটা। যেমন হারমোনিয়ামের একটা 'রীড'কে গ্যাঁক করে টিপে দিলে কে একবার। ব্রজেশ্বরবাবু গম্ভীরভাবে মাথা নাড়লেন কেবল। তাঁর মুখে কোমলতার কোনও আভাস ফুটল না।

“আপনার মাথায় চোট লেগেছে অবশ্য, কিন্তু আপনার বাইকটা চোট থেকে বেঁচেছে”

“নিশ্চয়, আর কোনও ক্ষোভ নেই আমার—একদম না। ছোঁড়াটা গেল কোন দিকে? ছোঁড়া?”

ব্রজেশ্বরবাবু ঘাড় নাড়লেন।

"এ অঞ্চলের ছোঁড়া ছুঁড়ি সব পাজি। আপাদমস্তক। পরশু দিন বাইকটা রাস্তায় রেখে একজনের বাড়িতে গেছি ইতিমধ্যে একটা ছোট্ট ছুঁড়ি এসে হর্ণ টা বাজাতে সুরু করেছে। আর একটা গ্যাং বাইকটা ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে। আমাকে দেখেই দে ছুট। হা-হা-হা—"

"এটা ছোঁড়া। আমার ধমক খেয়ে ছুটে পালাল"

"পালিয়ে বুদ্ধিমানের কাজই করেছে"—পাশের ঘন ঝোপটার দিকে চেয়ে সদারঙ্গবিহারীলাল বললেন। এমনভাবে বললেন যেন ছোঁড়াটা পাশের ঝোপেই লুকিয়ে আছে এবং তাঁর কথা শুনছে।

"প্রত্নতত্ত্ববিভাগের উচিত এই সব হতভাগা ছোঁড়াদের এখানে ঢুকতে না দেওয়া। এখানে গরু চরাচ্ছে, ছাগল চরাচ্ছে—যা তা। একদিন দেখি একটা ছোঁড়া দমাদ্দম্ কাঁটি ঠুকছে মন্দিরের গায়ে—একটা চমৎকার বিষ্ণুমূর্ত্তি ছিল সেখানে—বিষ্ণুর কপাল ফেটে চৌচির—দেখবেন? আসুন না। প্রত্নতত্ত্ববিভাগে লেখা উচিত। লিখব ভাবছি। একে ধর্ষণ করলে কিচ্ছু অন্যায় হয় না। হয়?"

বলা বাহুল্য সদারঙ্গবিহারীলাল একটা আলঙ্কারিক উপমা মাত্র দিয়েছিলেন। এই আগন্তুক ভদ্রলোক কিন্তু যেভাবে সেটা নিলেন তা অপ্রত্যাশিত। রীতিমত ঘাবড়ে গেলেন সদারঙ্গবিহারীলাল। দ্বিতীয়বার যেন তাঁর মাথা ঠুকে গেল।

"হয়"—ব্রজেশ্বরবাবু বললেন—"আপনি যখন প্রশ্ন করলেন তখন আমাকে বলতেই হচ্ছে আপনার সঙ্গে আমার মতের মিল নেই।"

অপ্রস্তুত সদারঙ্গবিহারীলাল সবিস্ময়ে এই খদ্দরপরিহিত ব্যক্তিটির আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করলেন বার দুই। আশ্চর্য্য! বাইরে থেকে বোঝবার উপায় নেই যে আসলে ইনি এতবড় একটি কালাপাহাড়।

"মিল নেই? সত্যি? প্রত্যাশা করি নি। ভারী আশ্চর্য্য কিন্তু"

"আপনাদের মতো লোকই কেবল এসব জায়গায় আসতে পারবে, অন্য কেউ পারবে না—এটা খুব যুক্তিযুক্ত মনে হয় না আমার"

"হয় না ? আশ্চর্য্য কাণ্ড। এটা নিশ্চয়ই আপনাকে মানতে হবে অতীতের এই গৌরবময় মন্দিরে এমন লোকের প্রবেশ করা উচিত নয় যারা এর মূল্য সম্বন্ধে সচেতন নয় এবং সেই জন্যেই যারা সশ্রদ্ধ নয়, মানে, এককথায় চাষার স্থান এ নয়। চাষারা এখানে এসে যে কি কাণ্ড করে—উঃ কি সাংঘাতিক জানেন ? কে একজন হারাধন বসাক ছুরি দিয়ে নিজের নাম খোদাই করেছে একটা মূর্ত্তির পেটের উপর। চোয়াড়ের দল সব! স্বচ্ছন্দে সরে' থাকলেই পারে। অতীতের প্রতি যাদের শ্রদ্ধাই নেই তাদের এখানে দরকার কি—তারা আসবেই বা কেন! হারাধন বসাকের দল যখন এসবের দফা নিকেশ করে' দেবে তখন কি হবে বলুন তো? আর কি ফিরে পাওয়া যাবে? এসব কি বাজারে পাওয়া যায় যে আর একটা কিনে এনে বসিয়ে দিলেই চলবে? আমার মতে এমন কোনও বাজে লোককে এখানে ঢুকতে দেওয়া উচিত নয় যারা এসবের মর্ম্ম বোঝে না, এসবকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখে না—"

সদারঙ্গবিহারীলালের কণ্ঠস্বরে উষ্মা যথেষ্ট ছিল, কিন্তু আসলে যে সুর তাতে বাজছিল তার উদ্দেশ্য এই অদ্ভুত প্রকৃতির আগন্তুকটিকে স্বমতে আনয়ন করা।

ব্রজেশ্বরবাবু মন্দিরের ভগ্নস্তূপের দিকে অতিশয় তাচ্ছিল্যপূর্ণ দৃষ্টিতে চাইলেন একবার। তারপর পরিষ্কার শান্তকণ্ঠে বললেন, "মাপ করবেন, এই সব চুণ-সুরকির স্তূপকে শ্রদ্ধা করতে আমি প্রস্তুত নই"

তিনি আরও কি বলতে যাচ্ছিলেন কিন্তু বললেন না। মুখ ফিরিয়ে নিয়ে অন্যদিকে চাইলেন। সদারঙ্গবিহারীলাল নাকের মাঝখানটা চুলকুলেন একবার এবং যেন কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লেন হঠাৎ। নির্ব্বাক হয়ে গেলেন ক্ষণকালের জন্য। লোকটা বলে কি!

ব্রজেশ্বর পুনরায় মুখ ফেরালেন এবং নিজের দৃষ্টিকে ধীরে ধীরে পুনঃস্থাপিত করলেন সদারঙ্গবিহারীলালের রশ্মিবিকিরণশীল চশমার উপর। একটা অতি

ক্ষীণ হাসি—যা ঠিক হাসি নয়, হাসির আভাষ—তাঁর অধরে ফুটি ফুটি করেও যেন ফুটল না।

"না"—নিজের চিন্তাধারাকে বাঙ্ময় করে' তিনি যেন বললেন—"এমন সব মন্দির আছে যার গায়ে আঁচড়টি পর্য্যন্ত কাটতে পারে না কেউ—ধ্বংস করা দূরে থাক। কিন্তু সে সব মন্দির হাতে-তৈরি চুণ-সুরকির মন্দির নয়। বিজ্ঞানের মন্দির, সাহিত্যের মন্দির, যে সব মন্দিরে পূজারীরা জ্ঞানলাভ করে' প্রকৃত আনন্দ পান সেই সব মন্দিরই পবিত্র, সেই সব মন্দিরকেই আমি শ্রদ্ধা করি। একটা পচা পুরোনো শিবমন্দির বা বিষ্ণুমন্দির"—ভগ্নস্তূপের দিকে হস্ত প্রসারিত করলেন তিনি—"থাকল বা গেল কি এসে যায় তাতে। একটা হাত পা ভাঙা মূর্ত্তির চেয়ে জীবন্ত হারাধন বসাক ঢের বেশী শ্রদ্ধেয় আমার চোখে—"

সদারঙ্গবিহারীলাল ঈষৎ ব্যায়তআননে দাঁড়িয়ে রইলেন, কোন জবাব দিলেন না। অদ্ভুত লোক! আর একবার কৌতূহলভরে আড়চোখে চেয়ে দেখলেন দীর্ঘাকৃতি লোকটির দিকে। এদেরই কি গোঁয়ার-গোবিন্দ বলে? অসম্ভব নয়। সরু লম্বা মুখখানা। মনে হয় ছেলেবেলায় সমস্ত মুখখানা ধরে' লেবুর মতো নিংড়ে দিয়েছে কেউ যেন। ছুঁচলো থুতনিটাতে ফুটে উঠেছে ভদ্রলোকের চরিত্র —ঠিক দৃঢ়তা নয়—একগুঁয়েমি। চোখ দু'টি কিন্তু ঠিক উলটো। আশ্চর্য্য! যদিও বসা কিন্তু চোখে একগুঁয়েমি বা রুক্ষতার কোনও চিহ্ন নেই। বরং দৃষ্টি থেকে যা ক্ষরিত হচ্ছে তা স্নিগ্ধ। সদারঙ্গবিহারীলাল এ-ও লক্ষ্য করলেন ভদ্রলোক পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন খুব। খদ্দরের জামাকাপড় ধপধপ করছে। পোষাকে আড়ম্বর নেই, কিন্তু মার্জ্জিত রুচির পরিচয় আছে। এঁকে দেখে তো মনে হয় না যে ইনি কোনও মূর্ত্তি নষ্ট করতে পারেন বা কোনও অনুসন্ধিৎসু ঐতিহাসিকের গবেষণায় বাধা দিতে পারেন। মোটেই মনে হয় না। অথচ কথাবার্ত্তা থেকে—! আশ্চর্য্য!

এ কথাটা ব্রজেশ্বরবাবুরও মনে হল সম্ভবতঃ। কারণ এর পরই তিনি যা

বললেন তার স্বর অন্যরকম। বেশ নরমই—অনেকটা ক্ষমাপ্রার্থনার মতো শোনাল।

“আমার মতামত তা বলে’ জোর করে’ চাপাতে চাই না আপনার ঘাড়ে। প্রত্যেকেরই নিজের মত পোষণ করবার অধিকার আছে”

“তা আছে বই কি! বাঃ। ভাল লাগল এ কথাটা—” চশমাটা ঠিক করে’ নিয়ে ঘুরে দাঁড়ালেন সদারঙ্গবিহারীলাল হাস্যোদ্ভাসিত মুখে।

ব্রজেশ্বরবাবু বলেন, “খাপছাড়াভাবে আমার অভিমতটা শুনে আপনার একটু বেখাপ্পা ঠেকছে বোধহয়। একটু হকচকিয়ে গেছেন মনে হচ্ছে। যদি আপত্তি না থাকে আপনাকে একটু পরিষ্কার করে’ বুঝিয়ে বলি”

“আপত্তি? মোটেই না, ভারী ইন্‌টেরেস্টিং বরং”—

“আপনার কি ধর্ম্মবাই আছে? কারণ ও ব্যাধি আক্রমণ করেছে যাঁকে তাঁর কাছে যুক্তির অবতারণা করা বৃথা। তিনি চাইবেন সকলে তাঁর প্রলাপকে যুক্তিযুক্ত বলে’ মেনে নিক”

সদারঙ্গবিহারীলালের হাসি আকর্ণবিস্তৃত হয়ে উঠল।

“বিপক্ষের যুক্তিকে সবাই প্রলাপ বলে’ প্রতিপন্ন করতে চায়। সে কথা যাক্। আপনি কি বলতে চাইছেন বলুন না। বেশ লাগছে”

“দেখুন”—ধীরে ধীরে সুরু করলেন ব্রজেশ্বরবাবু—“যে আধ্যাত্মিকতা, অর্থাৎ, যে সূক্ষ্ম আত্মোপলব্ধি প্রত্যেক ধর্ম্মেরই মূলকথা, তার সঙ্গে এই পাথরের স্তূপের সম্পর্ক নির্ণয় করা একটু কঠিন নয় কি? ধর্ম্মটা হল আত্মিক ব্যাপার—আর এগুলো—পাথরের শিব-লিঙ্গই হোক বা সোনার ষাঁড়ই হোক—হাতে তৈরি স্থূল ব্যাপার—”

“এক মিনিট”—সোৎসাহে বলে’ উঠলেন সদারঙ্গবিহারী—“থামুন—বাঃ চমৎকার জমবে মনে হচ্ছে। কিন্তু গোড়াতেই একটা কথা জিগ্যেস করে নি। আপনার এবং আমার ধর্ম্মমত কি এক”

“হওয়া সম্ভব বলে’ মনে হয় না”

"ব্রাহ্ম না কি আপনি"

ব্রজেশ্বর ঘাড় নাড়লেন।

সদারঙ্গবাবু তাঁর মুখের দিকে ক্ষণকাল নির্নিমেষে চেয়ে থেকে আবার যেন সঞ্জীবিত হয়ে উঠলেন।

"তা হোক্। হিন্দু বলে' পরিচয় দেন নিশ্চয় নিজেকে"

"নিশ্চয়"

"ভারতীয় বলেও"

"অবশ্য"

"তাহলে, মানে, শুনুন আপনার কাছ থেকেও এরকম আচরণ তো প্রত্যাশা করা যায় না। সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিকতার তর্ক তুলব না—রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ পড়ে দেখুন গিয়ে—তুললে অনেক সময় নষ্ট হবে। আমি শুধু এই কথা বলছি যে এটা প্রত্যাশা করা যায় না আপনার কাছ থেকেও যে হিন্দু হয়ে আপনি হিন্দুত্বের গায়ে কাদা ছিটিয়ে বেড়াবেন, ভারতীয় হয়ে ভারতের গৌরব সম্বন্ধে উদাসীন থাকবেন। হারাধন বসাককে আপনি অলরেডি শ্রদ্ধার চক্ষে দেখছেন, যে ছোঁড়াটা আমার বাইক ফেলে দেবার চেষ্টা করছিল তাকেও দলে টানবেন না কি!"

হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল সদারঙ্গবিহারীলালের মুখ। চোখ দুটো বুজে গেল।

ব্রজেশ্বরবাবু উত্তর দিলেন, "টানতে আপত্তি নেই। আমি যদি বুঝতে পারতাম যে আপনি ওই সুড়ঙ্গের ভিতর ঢুকে ভারতীয় হিন্দুত্বের পরিচয় দেবার চেষ্টা করছেন, তাহলে মৃদু প্রতিবাদস্বরূপ আমি নিজেই হয়তো আপনার সাইকেলকে লাথি মেরে ফেলে দিতাম"

"দিতেন? বাঃ, চমৎকার তো! ব্যাপার কি বলুন দেখি! আপনার মনোভাবটা বুঝতে পারছি না ঠিক"

"সংক্ষেপে তা হচ্ছে এই। আপনি যখন একটা ভাঙা কার্নিস বা অন্ধকার সুড়ঙ্গ নিয়ে আপনার হিন্দুশক্তি ব্যয় করেন তখন ভেবে দেখেন না যে আরও

কত দরকারি কর্ত্তব্য অকৃত রয়েছে। দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে, পাপের বিরুদ্ধে, তামসিকতার বিরুদ্ধে কত যুদ্ধ করতে হবে—"

"ঠিক। এ সব তো জানিই—বাঃ"—উচ্ছ্বসিত হয়ে উর্দ্দুকথা বলে' ফেললেন সদারঙ্গ—"ওসবের বিরুদ্ধেই তো আমারও জেহাদ। আমিও যোদ্ধা একজন, পলাতক নই, রোজ যুদ্ধ করছি। কিন্তু এটা হচ্ছে বিশ্রাম—অবসর বিনোদন—ইংরেজিতে যাকে 'রিল্যাক্‌সেশন' বলে"

"কিন্তু আপনার এই অবসর বিনোদন দেশের অনিষ্ট করছে তা জানেন? যা আপনি মুগ্ধনেত্রে দেখছেন তাই প্রেরণা জাগাচ্ছে আপনার শত্রুপক্ষকে—সেই শত্রুপক্ষকে যারা কুসংস্কারের বেড়াজালে ঘিরে, ধর্ম্মের ভয় দেখিয়ে, নানারকম আইন অজুহাত খাড়া করে' লক্ষ লক্ষ লোকের শ্বাসরোধ করে' মেরে ফেলছে। তাদের সংস্কার-ধর্ম্ম-আইনও এই ধ্বংসস্তূপের মতো সেকালে, কিন্তু একটু তফাত আছে—ধ্বংসস্তূপের মতো নিষ্ক্রিয় নয় সেগুলো, কারাগারের মতো ভীষণ। ভেবে দেখেছেন এসব কথা কখনও?"

সদারঙ্গবিহারীলাল কি একটা বলতে যাচ্ছিলেন কিন্তু ব্রজেশ্বরবাবু তাঁকে থামিয়ে দিয়ে উচ্চতর কণ্ঠে বললেন, "আপনারা অতীত অতীত বলে' লাফিয়ে বেড়ান, কিন্তু ইতিহাস উল্টে দেখুন অতীতে আনন্দজনক তেমন কিছু নেই। ডাকাতদের লোমহর্ষণ কাহিনী কেবল। আমার মতে অতীতের অধিকাংশই পুঁছে ফেলা উচিত, উপড়ে ফেলা উচিত, বর্ত্তমানের জীবনযাত্রায় অতীতের ছায়া-পাত অসহ্য। অতীতের যেটুকু শ্রদ্ধেয় তার কথা আগেই বলেছি—সাহিত্য আর বিজ্ঞান। এই সব ইটের টুকরো, সুরকির গুঁড়ো, প্রথার হুমকি, কুসংস্কারের দাসত্ব—এরা প্রাণহীন মৃত এবং সেই জন্যেই অনিষ্টকর। এদের ঝেঁটিয়ে পুড়িয়ে ফেলে দিলে তবে আমাদের বর্ত্তমান জীবন হালকা ঝরঝরে হবে"

"সর্ব্বনাশ! আপনি কি সোশালিষ্ট?"

"নিশ্চয়। যদিও এই লেবেল গায়ে এঁটে দেশের সর্ব্বনাশ করে বেড়াচ্ছেন অনেকে"

"অ্যাঁ? আপনার চেয়েও বেশী ঝাঁঝালো সোশালিষ্ট আছে না কি! ও বাবা"

মৃদু হাসি ফুটে উঠল ব্রজেশ্বরের মুখে। চোখ দুটো মিটমিট করতে লাগল।

"কোন বিষয়েই বেশী ঝাঁঝ আমি ভাল মনে করি না। আমি—"

কি একটা বলতে গিয়ে ইতস্তত করে থেমে গেলেন তিনি। নিজের কথা বলতে সঙ্কোচ হল বোধ হয়।

"কিছু যদি মনে না করেন, একটা কথা বলতে লোভ হচ্ছে"

"কি বলুন"

"প্রগতিশীল নামে আজকাল একটা যে দল হয়েছে আপনাকে সেই দলে ফেলতে ইচ্ছে করছে আমার। ভুল করলাম বোধ হয়, না?"

"না মারাত্মক ভুল হয় নি। তবে এটাও ঠিক, তেমন প্রগতি হয়নি আমার। বেশী প্রগতি বরদাস্তই হয় না। কাজ করার চেয়ে হাততালির লোভ যাঁদের বেশী তাঁদেরই প্রগতি হুহু করে' বেড়ে যায়। হাঁপিয়েও পড়েন তাঁরা চট করে'। পেছিয়ে যান শেষে—প্রগতি পশ্চাৎ-গতি হয়ে দাঁড়ায় শেষটা। সত্যি যারা কর্ম্মী তারা হুড়োহুড়ি করে' এগিয়ে যেতে চায় না, পেছিয়েও পড়ে না। আমি কোনটাই করি নি"

"ও। যাক আপনাকে দেখে খুশী হয়েছি খুব। মানে, খুব। আমি রাজনৈতিক কর্ম্মী নই—সে যোগ্যতাই নেই সম্ভবতঃ আমার। কিন্তু রাজনীতি বিষয়ে কৌতূহল আছে,—ভীষণ। আমি আমার ভাঙা তক্তাপোষের উপর বসেই রাজাউজির লাটবেলাট গান্ধি জহরলাল সব্বাইকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলছি হরদম!"

সদারঙ্গবিহারীলালের হাসি আকর্ণবিশ্রান্ত হয়ে উঠল আবার।

"আমার মতামত কিন্তু সেকেলে—নিতান্ত সেকেলে। আমি আভিজাত্যকে শ্রদ্ধা করি, ঠাকুর দেবতা মানি, অতীতকে ঝেঁটিয়ে বিদেয় করবার পক্ষপাতী নই—

কুসংস্কারাচ্ছন্নই বলতে পারেন—হা-হা-হা—। আপনাকে দেখে খুব খুশী হয়েছি, ভারী আনন্দ হচ্ছে, মনে হচ্ছে তর্কটা বেশ জমবে। কিন্তু তর্ক করবার আপনার সময় নেই হয়তো—”

“দেখুন”—একটু ইতস্তত করে’ লঘু হাস্যসহকারে ব্রজেশ্বরবাবু বললেন—“আমি আমার মতামত জোর করে’ কারও ঘাড়ে চাপাতে চাই না। এর পর এ-ও আপনি যেন না মনে করেন যে আমি লোক দেখলেই তাড়া করে’ তার সঙ্গে তর্ক করি। মোটেই তা নয়। ঘটনাচক্রে এটা হয়ে গেল—”

“না—না—বাঃ মোটেই না”—উচ্ছ্বসিত উচ্চকণ্ঠে প্রতিবাদ করলেন সদারঙ্গ-বিহারীলাল—“আপনার সঙ্গে আলাপ হওয়াতে বাস্তবিকই খুশী হয়েছি আমি। বাস্তবিক বলছি। অত্যন্ত। কাউকে স্বমতে আনবার চেষ্টা করা বাতুলতা, তা জানি, কিন্তু আলোচনা করে’ একটা সুখ আছে, কি বলেন, অপ্রিয় হলেও বেশ লাগে। অনেকটা ঝাল খাওয়ার মতো, নয়? শিক্ষাও হয়, অনেক সময়। আলো কখন কোন ফাঁক দিয়ে এসে পড়ে কে বলতে পারে। তাছাড়া আমরা পাড়াগাঁয়ে থাকি, প্রগতিশীল লোকের নাগাল পাই না তো বড় একটা। তাঁরা কি ভাবেন তা জানবার খুব আগ্রহ আমার। প্রচণ্ড। কাগজে যা পড়ি তাতে তৃপ্তি হয় না, মনে হয় ভেজাল আছে। আজকাল ঘি থেকে আরম্ভ করে’ খবর পর্য্যন্ত সব ভেজাল—হা—হা—হা—”

“এ বিষয়ে আপনার সঙ্গে মতদ্বৈধ নেই আমার। আসল প্রগতিশীলদের মতবাদ শুনতে পান না আপনারা। যাঁরা প্রকৃত প্রগতিশীল তাঁরা কর্ম্মে আস্থাবান, বাক্যে নয়। তাই তাঁদের কথা শুনতে পান না। কিন্তু এটা জেনে রাখুন সত্যিকার প্রগতিশীল আছেন এবং থাকবেনও চিরকাল”

“বাঃ, চমৎকার!”

সদারঙ্গবিহারীলাল উত্তেজনাভরে চশমাটা খুলে পরলেন আবার। হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে গেল তাঁর। একটা মোক্ষম কুঠার তো আছে তাঁর হাতে। হ্যাঁ, ঠিক তো। কোপটি মারবার জন্যে প্রস্তুত হলেন পরমুহূর্ত্তেই।

"আপনি আশা করি দক্ষিণপন্থীদেরই প্রগতিশীল বলবেন"

"নিশ্চয়ই"

"আপনি বোধ হয় একটা কথা জানেন না যে দক্ষিণপন্থীরা আসলে সুবিধাপন্থী—যেদিকে ছাট সেইদিকে ছাতা—এই হলো তাঁদের মন্ত্র"

"কে বললে আপনাকে একথা !"

"দেখুন আপনাদের জন্যে দুঃখ হয় আমার"—বলে' চললেন সদারঙ্গবিহারীলাল—"সত্যি দুঃখ হয়। আপনাদের মধ্যে অনেকেই হয় তো সাঁচ্চা লোক, কিন্তু আপনাদের নেতারা যে ক্রমাগত আপনাদের ধাপ্পা দিয়ে চলেছেন এ খবরই রাখেন না আপনারা, রাখা সম্ভবও নয়, কাগজে তো এসব খবর বেরোয় না—"

"আপনি জানলেন কি করে'! নেতাদের মধ্যে যে এত গলদ আছে আমি তা ঘুণাক্ষরে জানি না তো"

"জানবার কথাও নয়"—ঠোঁটে ঠোঁট চেপে মুচকি হেসে খুব মুরুব্বিয়ানা সহকারে বললেন সদারঙ্গবিহারীলাল—"আমি এত জোর করে' বলতে পারছি কারণ মুরগির ঠিক পেটের তলা থেকেই ডিমটি পেয়ে গেছি কিনা। পেয়ে যাবার সুযোগ হয়ে গেল হঠাৎ। আমার এক দক্ষিণপন্থী বন্ধুর সঙ্গেই কথা হচ্ছিল ; তিনি নিজে একজন নামজাদা দক্ষিণপন্থী, তিনি নিজে আমাকে বললেন—দলকে দল তাঁরা ছাতা ঘাড়ে করে' ওৎ পেতে বসে আছেন, যেদিকে ছাট আসবে সেইদিকে ছাতা খুলবেন বলে"

"বলেন কি !"—সবিস্ময়ে বলে উঠলেন ব্রজেশ্বর দে—"আমি তো কিচ্ছু জানি না। দক্ষিণপন্থীদের ভিতরের খবর আমিও রাখি কিছু কিছু। এরকম কথা তো কখনও শুনিনি। আপনার এই বন্ধুটির নাম জিগ্যেস করতে পারি কি ?"

"না, মাপ করবেন, নামটা বলা ঠিক হবে না। ক্ষতি হতে পারে তাঁর। আপনি যদি কাউন্সিলার হতেন তাহলে বুঝতে পারতেন হয় তো, মানে—"

"ও কথা যখন তুললেন তখন আমাকে পরিচয় দিতেই হচ্ছে। আমিও একজন কাউন্সিলার"

"ও!"

নির্ব্বাক বিস্ময়ে একটু মুখ ফাঁক করে' চেয়ে রইলেন সদারঙ্গবিহারী।

"দক্ষিণপন্থী?"

"হ্যাঁ"

"ও বাবা, তাহলে এ নিয়ে বেশী কথা বলা উচিত হবে না আর"

"যতটা বলেছেন ততটা বলাও কি উচিত ছিল?"

"তার মানে?"

"রাগ করবেন না, কিন্তু এটা কি আপনার ভাবা উচিত ছিল না যে আপনার বন্ধুর এই খবরটি সম্পূর্ণ ভিত্তি-হীন হতে পারে"

"তিনি সাধারণ লোক হলে তাই ভাবতাম। কিন্তু তিনি একজন নামজাদা ব্যক্তি। তিনি নিজের মুখে বললেন আমি শুনলাম। স্বকর্ণে। এতে অবিশ্বাসের প্রশ্ন উঠতেই পারে না"

"আপনার কথা বিশ্বাস করলে এই কথাই আমাকে তাহলে বলতে হয় যে তিনি আপনার বন্ধু হতে পারেন, কিন্তু পার্টির বন্ধু নন"

"আসল কথা বোধ হয়"—বলে উঠলেন সদারঙ্গবিহারীলাল—"অনেকের চেয়ে আপনি একটু বেশী গোঁড়া। যাঁর কথা আমি বলছি, তাঁর সঙ্গে অবশ্য এই আমার প্রথম আলাপ হল। কাল রাত্রে। যদিও তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে বহুদিন আগে থাকতেই আলাপ ছিল। তিনি স-স্ত্রীক এইখানে একটা হোটেলে রাত কাটাচ্ছিলেন কাল। আমি হঠাৎ গিয়ে পড়েছিলাম সেখানে। তাঁর স্ত্রীই আমাদের পরিচয় করিয়ে দিলেন। চমৎকার লোক, ভারী মন-খোলা, দেমাক-অহঙ্কার কিছু নেই। ঢাক ঢাক গুড়গুড়ও নেই—খাশা। অবশ্য তিনি একথাও বললেন যে প্রকাশ্যে তিনি এসব কথা স্বীকার করতে পারবেন না। কিন্তু তাঁর কথাবার্ত্তা থেকে যতটুকু বুঝলাম—পার্টির অধিকাংশ লোকেরই উপর আস্থা নেই তাঁর"

"ও বুঝেছি"—ব্রজেশ্বরবাবুর একটা কথা যেন মনে পড়ে গেল—"বুঝেছি। আপনাকে আর বলতে হবে না। আপনি যাঁর কথা বলেছেন তিনি শিগ্‌গিরই বোধহয় রিজাইন করবেন"

"কই সেকথা তো কিছু বললেন না"—সদারঙ্গবিহারীলালের কণ্ঠস্বরে বিস্ময় এবং ক্ষোভ দুইই ফুটে উঠল—"আশ্চর্য্য তো! তাঁর স্ত্রী অন্তত নিশ্চয় বলতেন আমাকে ও কথাটা। বলা উচিত ছিল"

"আপনি মৃন্ময় ঘোষালের কথা বলছেন তো"

"না। আচ্ছা বলছি আপনাকে তাহলে নামটা, কিন্তু দেখবেন যেন কথাটা বেশী চাউর না হয়। অধ্যাপক ব্রজেশ্বর দে"

ব্রজেশ্বর দের হাতে একটা লাঠি ছিল। তিনি দুহাত দিয়ে লাঠির মাথাটা চেপে ধরে' সামনের দিকে ঝুঁকে পড়লেন একটু। তারপর সামলে নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন আবার। তাঁর গম্ভীর মুখে শাণিত ইস্পাতের দীপ্তি যেন চকমক করে' উঠল, চোখের দৃষ্টিতে খেলে গেল ব্যঙ্গের বিদ্যুৎ। একটু হেসে তিনি বললেন, "কেউ আপনাকে ঠকিয়ে গেছে। এটা আমি নিশ্চিত জানি যে অধ্যাপক ব্রজেশ্বর দে—যিনি কাউন্সিলার—কাল রাত্রে তিনি এ অঞ্চলে ছিলেন না, থাকতে পারেন না"

"আরে কি যে বলেন মশাই আপনি। জলজ্যান্ত আমি তাঁকে দেখলাম স্বচক্ষে, ওকথা বললে শুনব কেন! আমি তাঁদের দু'জনকে—"

"সে ভদ্রলোক কেন নিজেকে ব্রজেশ্বর দে বলে' পরিচয় দিয়েছেন তা জানি না, কিন্তু এটা আমি ঠিক জানি কাল রাত্রে ব্রজেশ্বর দে কোলকাতায় ছিলেন"

"কোলকাতায় ছিলেন? বললেই মান্‌ব? মানতেই পারি না একথা"—সদারঙ্গবিহারীলালের কণ্ঠস্বরে উষ্মার উত্তাপ ফুটে উঠল একটু—"আমি আপনাকে গোড়াতেই বলেছি যে ভদ্রলোক স-স্ত্রীক ছিলেন। তাঁর স্ত্রীকে আমি চিনি বহুকাল থেকে—তিনি যখন সান্ত্বনা পাল ছিলেন তখন থেকে। একটা নাইট স্কুলে পড়াতেন বউবাজারে। আমি এম-এ দিচ্ছি যেবার সেইবারই আলাপ—"

"এসব ঠিকই বলছেন। নাইট স্কুলে মাস্টারি করবার সময়ই তাঁর বিয়ে হয় ব্রজেশ্বর দের সঙ্গে—"

"আপনিও তো জানেন তাহলে। ওই সান্ত্বনা দেবীই কাল রাত্রে তাঁর স্বামীর সঙ্গে ফাৎনাফিরিঙ্গিপুরে হরিমটর পান্থনিবাসে ছিলেন। তাঁর স্বামীর সঙ্গে ইতিপূর্ব্বে আলাপ হয় নি, কারণ বিয়ের সময় যেতে পারি নি আমি। শুনলাম তাঁরা মোটরে করে' কোলকাতা থেকে আসছিলেন। কিন্তু রাস্তায় মোটর বিগড়ে যাওয়াতে রাত্রে তাঁদের আশ্রয় নিতে হয়েছিল গোঁসাইজির হোটেলে। আজ সকালে তাঁরা মুচুকুন্দকুণ্ডলেশ্বরী গেছেন রায় বাহাদুর দিগ্বিজয় সিংহরায়ের বাড়িতে। দেখুন, এত কথা জানি আমি"

বিজয়গর্ব্বে চাহিলেন তিনি ব্রজেশ্বরবাবুর দিকে। ভদ্রলোকের কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়-ভাব দেখে নিজের বিজয় সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র সন্দেহ রইল না তাঁর।

ব্রজেশ্বরবাবুর ভ্রূযুগল কুঞ্চিত হয়ে গেল ক্রমশ। চোখ দুটোও ছোট হয়ে এল। মনে হল মনে মনে হিসেব করছেন তিনি যেন কিছু।

প্রতিপক্ষকে কবলে পেয়ে নিরস্ত হবার লোক সদারঙ্গবিহারীলাল নন। রাজনৈতিক তর্ক-দ্বন্দ্বে তিনি একজন দক্ষিণপন্থীকে কাবু করে' ফেলেছেন, ভাঁওতা দেবার চেষ্টা করে' লোকটা হাতে-নাতে ধরা পড়ে গেছে, এই উপভোগ্য অনুভূতিটা সঞ্চারিত হচ্ছিল তাঁর দেহের শিরায় উপশিরায়।

বক্তব্যটা আরও জোরালো করবার জন্যে তিনি আবার বললেন, "আপনি বলছেন আপনি সান্ত্বনা দেবীকে জানেন। কিন্তু আমি যতটা জানি ততটা যদি আপনার জানা থাকে—তাহলে এটা আপনি নিশ্চয়ই মানবেন যে পর-পুরুষকে নিজের স্বামী বলে' চালাবার চেষ্টা আর যে-ই করুক, তিনি করবেন না, করতে পারেন না। আন্‌থিঙ্কেবল্"

"তা ঠিক। তাঁর সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ নেই আমার"

"শুনে সুখী হলাম। তাঁর সম্বন্ধে আমার ধারণা খুবই উচ্চ। খুবই। একবার তাঁর বদনাম রটেছিল অবশ্য, কিন্তু সে সব বাজে রটনা। মূলে ছিল বোধহয়

ঈর্ষা সে এক যাচ্ছেতাই কাণ্ড। এই সব বখেড়ায় পড়ে ভদ্রমহিলা প্রায় সন্ন্যাসিনী হয়ে যাবার মতো হয়েছিলেন—কারও সঙ্গে মিশতেন না পর্য্যন্ত—একদিন গিয়ে দেখি 'পিল্‌গ্রিম্‌স্‌ প্রগ্রেস' পড়ছেন—গোপনে গোপনে জনহিতকর কাজ করে' বেড়াতেন ক্রমাগত। এই সময়ে আমি কোলকাতা থেকে চলে আসি। তারপর 'ফরচুনেট্‌লি' ব্রজেশ্বরবাবুর সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেল তাঁর। ওয়াণ্ডারফুল লোক। আশ্চর্য্যরকম ভাল লাগল কাল। গুজব শুনেছিলাম লোকটা গাধাগোছের, কিন্তু দেখলাম, না, তা নয়, দামী কাকাতুয়া—মানে জানোয়ারের উপমা যদি দিতে হয়"

আবার আকর্ণ হাসি হাসলেন সদারঙ্গবিহারীলাল।

আসল ব্রজেশ্বরবাবু ছড়ি দিয়ে নিজের জুতোর ডগায় টোকা মারলেন দু'একবার অধীরভাবে। তারপর ঘাড় ফিরিয়ে চেয়ে দেখলেন চারদিকে। মনে হল ভদ্রলোক যেন দ্বিধাগ্রস্ত হয়েছেন।

সদারঙ্গবিহারীলালের কিন্তু আনন্দের সীমা ছিল না। তাঁর মনে হচ্ছিল ভদ্রলোককে নিয়ে এখন যা খুশী করা যায়।

"আমি যা বললাম তাতে যদি আপনার সন্দেহ না ঘোচে তাহলে আমি আরও বিস্তৃত বিবরণ দিতে পারি"—বলতে লাগলেন সদারঙ্গবিহারীলাল—"ওঁরা কাল রাত্রে ফাৎনাফিরিঙ্গিপুরে যে হরিমটর পান্থনিবাসে ছিলেন আপনি সেখানে খোঁজ করতে পারেন ইচ্ছে করলে। এখান থেকে বেশী দূর নয়। সেখানে অনেক কিছু ঘটেছিল কাল ওঁদের কেন্দ্র করে'। রাতদুপুরে ব্রজেশ্বরবাবুকে বিছানা ছেড়ে উঠতে হয়েছিল তাঁদের কুকুরটাকে খুলে দেবার জন্যে। কুকুরটা গোয়াল ঘরে বাঁধা ছিল। কাঁদছিল খুব। খুলে দেবামাত্র কুকুরটা অন্ধকারে কোথা সরে' পড়ল। রাত্রে তো পেলেনই না, সকালেও পাওয়া গেল না। একটু আগে আমি সেটাকে পেলাম রাস্তায়, নিয়ে গিয়ে দিয়েও এসেছি তাঁদের। হিন্দু-পান্থনিবাসের মালিক গোঁসাইজি রাত্রে অদ্ভুত শব্দ শুনে উঠে পড়েছিলেন—শব্দটা সম্ভবত কুকুরটাই করেছিল—শব্দ শুনে উঠে তিনি ব্রজেশ্বরবাবুদের ঘরে যান।

গিয়ে দেখেন ওরা দু'জন পাশাপাশি শুয়ে ঘুমুচ্ছেন। আপনি যখন সান্ত্বনা দেবীকে জানেন বলছেন, তখন এর বেশী বলা নিষ্প্রয়োজন। শুধু তাই নয়, মনে হচ্ছে ব্রজেশ্বরবাবুকেও আপনি আমার চেয়ে ভাল করে' চেনেন। সুতরাং—"

একটু হেসে নিজের বাইসিক্‌লের দিকে অগ্রসর হলেন সদারঙ্গবিহারীলাল।

বিস্ফারিতচক্ষে চেয়ে রইলেন ব্রজেশ্বরবাবু। তাঁর চোখের দৃষ্টিতে যে অমায়িকতা ছিল এতক্ষণ তা যেন 'উপে' গেল। ভ্রূকুঞ্চিত করে' চেয়ে রইলেন তিনি। তাঁর গম্ভীর মুখমণ্ডলে ক্রোধের কোনও চিহ্ন ফুটে উঠল না। বরং মুখের উপর ক্ষীণ হাসির একটা আভাষ ফুটেই মিলিয়ে গেল। মনে হল যেন তাঁর জটিল মনে কৌতুকজনক কিছু একটা জেগেছে। সদারঙ্গবিহারীলালের মনোযোগ পুনরায় আকর্ষণ করবার জন্যে তিনি হাতটা একবার তুললেন; কিন্তু তুলেই থেমে গেলেন এবং ধীরে ধীরে আবার চেপে ধরলেন লাঠির মাথাটা। সদারঙ্গবিহারীলাল ঝুঁকে বেঁকে উবু হয়ে হেঁট হয়ে নানাভাবে তাঁর বাইকটি পর্য্যবেক্ষণ করছিলেন। তাঁর দিকে নীরবে চেয়ে রইলেন ব্রজেশ্বরবাবু—লোকে যেমন নিস্পৃহভাবে তীরে দাঁড়িয়ে ভাসমান পালতোলা নৌকোর দিকে চেয়ে থাকে। তারপর হঠাৎ সজাগ হয়ে উঠলেন।

"এইবার চলি তাহলে—"

"ও চললেন, আচ্ছা,"—ঘাড় ফিরিয়ে হেসে সদারঙ্গ বললেন—"আমরা পাঁয়তারাই করলুম অনেকক্ষণ ধরে' আসল তর্কটা আর হল না"

ব্রজেশ্বর মুচকি হাসলেন এবং ছড়ি ঘুরিয়ে অগ্রসর হলেন ষ্টেশনের দিকে।

"দেখবেন মশায়"—দুষ্টুমিভরা দৃষ্টিতে তাঁর দিকে চেয়ে বললেন সদারঙ্গবিহারী—"ব্রজেশ্বরবাবুর সঙ্গে যদি দেখা হয় এসব কথা বলবেন না যেন। আর দেখুন পলিটিক্‌সকে অত সিরিয়াস্‌লি নেবেন না, কেউ নেয় না। আচ্ছা, নমস্কার"

"নমস্কার"

ব্রজেশ্বরবাবু এগিয়ে গেলেন এবং স্বগতোক্তি করলেন—"স্বপ্ন দেখছি নাকি!" —তারপর সোজা হন হন করে' এগিয়ে গেলেন ষ্টেশনের দিকে। গিয়েই

পেয়ে গেলেন একটা ট্যাক্সি। আর কালবিলম্ব না করে' ষ্টেশন থেকে নিজের জিনিসপত্র নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন তিনি। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সদারঙ্গবিহারীলালও হাজির হলেন ষ্টেশনে এবং ট্যাক্সি-আরূঢ় ব্রজেশ্বরকে দেখতে পেলেন। ট্যাক্সিটা তাঁর চেনা ট্যাক্সি। এ অঞ্চলের সমস্ত ট্যাক্সিওলাই তাঁর চেনা। কৌতূহল হল। কে ভদ্রলোকটি ? কাউন্সিলার ? গেলেন কোথায় ? খোঁজ ক'রতেই যে কুলিটা তাঁর জিনিসপত্র ট্যাক্সিতে তুলে দিয়েছিল সে বলল—"নাম ঠিক জানি না বাবু"

"গেলেন কোথায়"

"ট্যাক্সিওলাকে তো বললেন ফাৎনাফিরিঙ্গিপুর যেতে"

"ফাৎনাফিরিঙ্গিপুর ?"

"আজ্ঞে। তাই তো শোনলাম"

নিপুণভাবে একটি বিড়ি ধরিয়ে কুলিটি চলে গেল।

"ফাৎনাফিরিঙ্গিপুরে কি প্রয়োজন থাকতে পারে ভদ্রলোকের ? অদ্ভুত ঠেকছে তো ! মতলব কি ওঁর !"

সদারঙ্গবিহারীলাল পুনরায় আরোহণ করলেন তাঁর মোটরবাইকে। স্টার্ট করতেই পিস্তলের মতো আওয়াজ হল গোটা দুই। কুণ্ডলীকৃত হয়ে একটা কুকুর কাছেই নিদ্রাসুখ উপভোগ করছিল। চমকে উঠে পালাল সে। সদারঙ্গবিহারীলাল এই অদ্ভুতপ্রকৃতির কংগ্রেসকর্ম্মীটির পশ্চাদ্ধাবন করলেন।

(১৯)

ছিপছররামারি সন্নিহিত সেই পোস্টাফিসে সুশোভন হন্তদন্ত হয়ে ঢুকল পুনরায়। দেখে মনে হল যেন ডাকাতে তাড়া করেছে তাকে। পোস্টমাস্টার তার দিকে এক নজর চেয়ে যখন তাকে সেই তার্কিক মেয়েটির এবং গুঁফো ড্রাইভারটির সঙ্গী বলে' চিনতে পারলেন তখন তাঁর মনোভাব বেশ একটু উষ্ণ হয়ে উঠল। মুখে কিছু বললেন না বটে, কিন্তু চোখের কোণে আগুনের ঝলক দেখা গেল।

"কোলকাতায় আমি এক্ষুণি একটা ফোন করতে চাই। কোলকাতা পেতে সাধারণত কত দেরি হয় বলুন তো—"

পোস্টমাস্টার যে আড়ময়লা খাতাটির মধ্যে টিকিট রাখেন সেটি তুলে টেবিলের ড্রয়ারে ঢোকালেন। ড্রয়ারটা বন্ধ করতে গিয়ে আটকে গেল সেটা, টানাটানি করে' আবার খুললেন, আবার ঢোকাবার চেষ্টা করলেন, আবার আটকে গেল। আবার টানাটানি করে' খুললেন। সম্পূর্ণ ড্রয়ারটাই বার করে' ফেললেন এবার। ড্রয়ারের ভিতরের প্রত্যেকটি জিনিস পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখলেন, গোছালেন, তারপর টেবিলের যে ফাঁকে ড্রয়ারটা বসানো ছিল সেখানে ফুঁ দিলেন বারকয়েক। তারপর ড্রয়ারটাকে ঢোকাবার চেষ্টা করলেন। কয়েকবার চেষ্টা করে' সফলকাম হলেন অবশেষে। ঝড়াস্ করে' ড্রয়ারটা ঢুকে বসে গেল স্বস্থানে। আবার টেনে দেখলেন 'জাম্' হয়ে গেল কিনা। 'জাম্' হয়েছে। আবার টেনে বার করলেন, আবার ঢোকালেন, আবার টানলেন। বেশ সড়গড় হয়ে যাবার পর টিকিটের খাতাটি পুনরায় বার করে' টেবিলের উপর রাখলেন। তারপর চোখের কোণ থেকে আর এক ঝলক উষ্ণতা বিকিরণ করে' চাইলেন সুশোভনের দিকে।

"দেরি··· ?"

"হ্যাঁ, কোলকাতা পেতে কত দেরি হয় সাধারণত"

"কি ভাবে পেতে চান ?"

"ফোনে, মশাই। তা ছাড়া আর কি ভাবে পাব ? আপনি কি ভাবছেন আমি এখান থেকে সুড়ঙ্গ কেটে কোলকাতা যেতে চাইছি ? দোহাই আপনার, দাঁড় করিয়ে রাখবেন না আমাকে, আমার তাড়া আছে—"

পোস্টমাস্টার টিকিটের খাতাখানি ঘুরিয়ে অন্যভাবে রাখলেন আবার।

"ফোনে কোলকাতা কতক্ষণ লাগে বলছেন ?"

"হ্যাঁ মশাই। এই সোজা কথাটা আপনার বুঝতে এত দেরি হচ্ছে ?"

"বুঝেছি। ঢুকেছে মাথায়, কিন্তু কি জবাব দেব তাই ভাবছি। কত দেরি হয় তা কি বলা যায় ? কখনও সাঁৎ করে' চলে' যায় আবার কখনও যুগযুগান্ত

কাটে—। কত দেরি হবে তা কি বলা যায় ঠিক ?—যায় না। অথচ প্রত্যেকেই এসে ওই এককথা জানতে চাইবে। আমার যদি জানাবার সামর্থ্যই থাকবে—"

আর অধিক বিতণ্ডায় লিপ্ত না হয়ে সুশোভন এগিয়ে গিয়ে ফোনটা তুলে নিলে। ভয়ানক দুশ্চিন্তা হচ্ছিল তার। তার নিজের গাফিলতির জন্যে অনীতা বেচারী হয়তো কত কষ্ট পাচ্ছে, এই চিন্তাটা পাগল করে' তুলেছিল তাকে। অনীতার সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে যে সব সম্ভাব্য দুর্গতি তার কপালে নাচছে সে কথা মনেই হচ্ছিল না তার। অনীতা হয়তো তার একটি কথাও বিশ্বাস করবে না, এ কথা জেনেও সে ফোন করবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল। ঠিক করেছিল, তার সঙ্গে কথা না কওয়া পর্য্যন্ত এইখানেই সে দাঁড়িয়ে থাকবে। স্থানটা যদিও সুখকর নয়—তার উপর ওই পোস্টমাস্টার—সাংঘাতিক লোক—বেশীক্ষণ ওর সাহচর্য্যে থাকলে ক্ষেপে যেতে হবে, ক্ষেপে হয়তো খুনও করে' ফেলতে পারে —কিন্তু না, আত্মসম্বরণ করা দরকার। যে চিঁড়ে সে মেখেছে, তাই তোলাই দুষ্কর হয়ে উঠেছে—সেটাকে আর জটিলতর করে' লাভ নেই। পোস্টমাস্টারের কথায় কর্ণপাত না করে' সে ফোনে কর্ণ সংলগ্ন করে' দাঁড়িয়ে রইল ধৈর্য্যভরে।

ফোনে নানা রকম আওয়াজ হচ্ছে। মনে হচ্ছে কেনেরি পাখী ডাকছে—ফট ফট করে' পিস্তলের মতো আওয়াজ হ'ল বার কয়েক—সোঁ সোঁ সোঁ—আবার কেনেরি—!

অনেকক্ষণ পরে সুশোভন ক্ষীণ কণ্ঠস্বর শুনতে পেলে একটা। ক্ষীণ হলেও স্পষ্ট। অনীতার সেই চাকরাণীটি। যে সব ক্ষমা-স্নিগ্ধ চরিত্র পৃথিবীতে মানব জাতির মর্য্যাদাবৃদ্ধি করেছে অনীতা দেবীর দাসী কুসুমের চরিত্র ঠিক সে ধরণের নয়। সুশোভনের সম্বন্ধে তার নিজস্ব এমন একটি ধারণা আছে যার তুলনায় স্বয়ম্প্রভা দেবীর ধারণা নিতান্ত নিষ্প্রভ। সুশোভন যে তাকে ফোন করতে পারে এ আশা কুসুম করে নি অবশ্য। কিন্তু যখন সুযোগটা পেয়ে গেছে তখন নিজের কেরামতিটুকু নিজস্ব ঝাঁঝসহযোগে জাহির করতে সে ছাড়লে না। আনাড়ী পল্লীবালা নয় সে, কোলকাতার ঘাগী ঝি। ফোন-ধরা অভ্যাস আছে।

নিজের মনোভাব সরাসরি প্রকাশ না করে' সুশোভনকে বেশ বিশদভাবে বুঝিয়ে দিলে ফিরে এসে তাকে কি নিদারুণ পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হবে। একাকিনী ভগ্ন-হৃদয়া অনীতার হৃদয়-বিদারক প্রত্যাবর্ত্তনের করুণ কাহিনী বর্ণনা করলে সে। স্বয়ম্প্রভার আবির্ভাবের কথা জানালে সবিস্তারে। তিনি কি কি অনুসন্ধান ও আবিষ্কার করেছেন তা বললে এবং পরিশেষে নিপুণভাবে বর্ণনা করলে সমস্ত পরিবারের উত্তেজিত অভিযান-কাহিনী। টেলিফোনের তার বাহিত হয়ে শ্রীমতী কুসুমের জিঘাংসা-ক্রূর কণ্ঠস্বরে যে উল্লাস উদ্বেলিত হয়ে উঠল তা অবর্ণনীয়।

সে কোথায় আছে তা স্বয়ম্প্রভা জানলেন কি করে? তিনি জানবেন না তা কে জানবে! তাঁর চোখে ধুলো দিয়ে কি পার পেয়েছে কেউ আজ পর্য্যন্ত? স্বয়ম্প্রভা দেবীর মহতী বুদ্ধি সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করার জন্য কুসুমের কণ্ঠস্বরে ঈষৎ ভৎর্সনার সুর ধ্বনিত হল যেন। কি করে' স্বয়ম্প্রভা তার গতি-পথ আবিষ্কার করেছেন তার সাড়ম্বর বর্ণনা করে' গেল সে।

টেলিফোন রেখে দিলে সুশোভন। পোস্টমাস্টারের দিকে দশটাকার একটা নোট ছুঁড়ে দিয়ে ছুটে বেরিয়ে পড়ল সে পোস্টাফিস থেকে। ওরা আসছে! সর্ব্বনাশ। রাস্তার এ মোড় থেকে ও মোড় পর্য্যন্ত ছুটোছুটি করে' বেড়ালে যদি একটা ট্যাক্সি পেয়ে যায়। পাওয়া গেল না একজন খবর দিলেন, এখানে 'বাইক' ভাড়া পাওয়া যায়!

কোথায়? ওই যে দোকানটায়। ছুটল সেদিকে সুশোভন। দরদস্তুর করবার সময় ছিল না। সুশোভন এ অঞ্চলে পরিচিত ব্যক্তিও নয়। বাইকওয়ালা বেশ একটু চড়া দরই হাঁকলে। ঘণ্টা পিছু দুটাকা। বাইকের দামটাও দোকানে জমা করতে হবে। তাতেই রাজি হয়ে গেল সুশোভন। বাইকের 'সীট্'টি উষ্ট্রাকৃতি। তা হোক্, তার উপরই চড়ে বসল সে অবিলম্বে এবং ধাবিত হল হরিমটর হিন্দু-পান্থনিবাসের উদ্দেশে। ক্ষুধায় ক্লান্তিতে সমস্ত শরীর ভেঙে পড়ছিল, কিন্তু সে সব দিকে মন দেবার অবসর ছিল না তার। সে ছুটছিল যদি স্বয়ম্প্রভাকে এড়িয়ে

কোনক্রমে অনীতার দেখা পেয়ে যায় এই আশায়। স্বয়ম্প্রভার সঙ্গেই যদি যাওয়া মাত্র দেখা হয়ে যায়, তাহলে আর রক্ষে নাই। অনীতার সঙ্গে দেখা হলে তাকে বুঝিয়ে বলতে পারে, যদি বোঝান সম্ভব না হয় কাকুতিমিনতি করতে পারে। অনীতাকেই যে সে ভালবাসে, তাকে ভালবাসবার পর অপরকে ভালবাসা যে অসম্ভব, একথাটা কি অনীতা বুঝবে না? অক্ষয় অকৃত্রিম প্রেম কি কেতাবেরই বুলি কেবল? তাকে বোঝাতেই হবে যেমন করে' হোক্—। প্রাণপণে 'বাইক' চালিয়ে ছুটে চলল সুশোভন। তার মানসপটে কিন্তু স্বয়ম্প্রভার ছবিটাই ফুটে উঠতে লাগল কেবল। 'অ্যাডমিশন রেজিস্টার' পর্য্যবেক্ষণ শেষ করে' সিঁড়ি দিয়ে এইবার উঠছেন হয়তো শয়নকক্ষ পরিদর্শন-মানসে। কি ভয়ানক! যথাসম্ভব দ্রুতবেগে 'প্যাডল' চালাচ্ছিল সে, মাঝে মাঝে 'ফ্রি-হুইল' করছিল ক্লান্ত পদদ্বয়কে কিঞ্চিৎ বিশ্রাম দেবার জন্য, আবার খুব জোরে চালাচ্ছিল দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য হ'য়ে। ভাগ্যে রাস্তায় ভীড় ছিল না বিশেষ। সঙ্কীর্ণ উবড়ো-খাবড়ো রাস্তা, কাদায় ভরতি, কিন্তু ভীড় ছিল না। একটু পরে সুশোভন দেখতে পেলে কে একজন আসছে যেন তার দিকে। তাকে দেখতে পেয়ে রাস্তার একধার ঘেঁসে সরে' দাঁড়াল লোকটা। দ্রুতগামী বাইক থেকে আত্মরক্ষা করবার অন্য কোন উপায় ছিল না আর। সুশোভন তাকে যখন অতিক্রম করে' গেল, তখন ঘাড় ফিরিয়ে দেখলে তার দিকে চেয়ে। আরে, এ যে ফদকা! বাইক থেকে নেবে পড়ল সে।

"ফদকা নাকি—"

আসবার সময় সুশোভন প্রচুর বখশিস দিয়ে এসেছিল তাকে।

দন্তপাতি বিকশিত করে' ফদকা এগিয়ে এল।

"হাঁ বাবু"

"কোথা যাচ্ছিস"

"গোঁসাইজিকে ডাকতে"

"কেন? কোথায় তিনি"

"নিতাই বৈরাগির বাড়ি"

"তাহলে হোটেলে নেই তিনি ?"

"বললাম যে তিনি নিতাই বৈরাগির বাড়ি গেছে। তেনাকে ডাকতেই তো যাচ্ছি"

গোঁসাইজি হোটেলে নেই শুনে সুশোভন আশ্বস্ত হল খানিকটা।

"তাঁকে ডাকতে যাচ্ছিস কেন"

"বুড়ি ডাকছে"

"বুড়ি ? অ্যাঁ ?"

সুশোভন সম্মুখে প্রসারিত কর্দ্দমাক্ত রাস্তাটার দিকে চাইলে একবার সভয়ে।

"কোথায় আছে সে বুড়ি"

"ওপরে শোবার ঘরে"

"ওপরে শোবার ঘরে ! সর্ব্বনাশ ! গোঁসাইজিকে ডাকছে কেন ? শোন ফদকা, গোঁসাইজিকে কষ্ট দিয়ে আর কি হবে আমিই তো যাচ্ছি সেখানে, বুড়িকে যা বলবার আমিই বলব এখন"

মনোভাব প্রকাশ করবার মতো মুখ যদিও ফদকার নয়, তবু তাতে যেন বিস্ময়ের একটু আভাস ফুটে উঠল।

"আজ্ঞে না বাবু, আপনাকে দিয়ে হবে না। গোঁসাইজি ছাড়া তেনাকে সামাল দিতে পারবে না কেউ। গোঁসাইজি নেই শুনে যা কাণ্ড করছে—"

"তা'তো করবেই। কিন্তু আমি দেখিই না কি করতে পারি। আমাকে দিয়েই যদি হয়ে যায়, তাহলে গোঁসাইজিকে আর কষ্ট দিবি কেন শুধু শুধু। হাজার হোক্ বুড়ো মানুষ তো। তোকেও আবার যেতে হবে এতটা। বুড়ি কি চায় আমি জানি। গোঁসাইজিকে পেলে ভয়ানক কাণ্ড করবে ও। গোঁসাইজি যে হোটেলে নেই, ভালই হয়েছে এক হিসেবে"

"আজ্ঞে না, গোঁসাইজিকে ডাকতেই হবে। আমার মনে হচ্ছে, বুড়ি হয়তো বাঁচবে না। দেখে ভয় লাগছে বাবু"

"বাঁচবে না? যাঃ—কি বলছিস যা তা। যদিও আমি—মানে, ওকে দেখে ওই রকমই মনে হয়, মনে হয় বুঝি মাথার শিরটির ছিঁড়ে যাবে এখনই—ও কিছু নয়"

"আজ্ঞে না বাবু, গতিক সুবিধার নয়। বিড়বিড় করে' কি বকছে, চোখ দুটো ঘুরপাক খাচ্ছে"

"ওরে বাব্বা! ভয়ানক কাণ্ড করছে তো তাহলে! তোকে কিছু জিগ্যেস করেছিল?"

"আমাকে? না তো। কেবল বললে গোঁসাইজি কোথা, বাইরে চলে গেছে কেন, ডেকে আন এক্ষুণি গিয়ে, এক্ষুণি যাও—"

সুশোভন গুম হয়ে দাঁড়িয়ে রইল মিনিট খানেক।

"বুঝেছি। ওই রকমই করে। চিনি তো"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, যবে থেকে এসেছেন তবে থেকে ওই রকমই"

"তার আগে থেকেও। তুই সবটা তো জানিস না। অসুখ টসুখ নয়। ধরণ-ধারণই ওই রকম"

"আজ্ঞে না। অসুখ করেছে, সেটা মিথ্যে নয়। আমার ভয় মরে না যায় শেষটা"

"কি বলিস যে! মরবে কেন"

"একদিন না একদিন তো মরতে হবেই ওনাকে"

হঠাৎ দার্শনিক উত্তর দিয়ে ফেললে ফদকা।

"তাতো হবেই। কিন্তু এখন ভগবান তা কি করবেন? ছোট ছেলেদের গল্পের বইতে ও সব হয়, বুঝলি। আজ উনি কিছুতেই মরবেন না, আমার ভাগ্যই সে রকম নয়"

"আমাকে ডাক্তার ডেকে আনতে বলছে যখন—"

"ডাক্তার? কে ডাক্তার ডাকতে বলছে?"

"তিনি। ওই বুড়ি"

"তিনি বললেন, তাঁর একজন ডাক্তার চাই? তাহলে নিশ্চয় হয়েছে কিছু। অ্যাঁ, বলিস কি? কষ্টটা কি?"

"তা তো আমায় বললেন না। হাঁপ বোধ হয়"

"হাঁপ? হাঁপাচ্ছে? সর্ব্বনাশ। এসে থেকেই হাঁপাচ্ছে না আসবার পর হয়েছে? ওঁর সঙ্গে আরও দু'জন আছে নয়? গোঁপ-ওলা ভদ্রলোক একটি, আর মেয়েছেলে একজন—"

"না, উনি তো একাই এসেছেন, একাই আছেন। ওঁর আপন লোক কেউ নেই বোধ হয়"

"তা' না থাকাই সম্ভব। কিন্তু তাঁর স্বামী, মানে জিতুবাবু বলে' একটি ভদ্রলোক সঙ্গে নেই?"

"না"—ফদকা সজোরে মাথা নেড়ে বললে—"কেউ নেই ওঁর সঙ্গে"

"ওঁর মেয়ে? ওঁর মেয়ে আমার, মানে—আচ্ছা, ক'টার সময় এসেছিল বল্ তো"

ফদকা ভুরু কুঁচকে ভাববার চেষ্টা করলে একটু।

"সন্ধ্যে হয়ে গেছল। সাতটা বোধ হয়"

"কি বলছিস যা তা। সে সময়ে আসতেই পারে না"

"ঠিক মনে নেই"—দাঁত বার করে' বললে ফদকা—"অনেক দিন হয়ে গেল কিনা। তবে সন্ধ্যে—"

"অনেক দিন? মানে?"

"আজ্ঞে, তা মাস খানেক হবে বই কি"

"কে এসেছে মাসখানেক আগে"

"ওই দোতলায় আছেন যে মা ঠাকরুণ। আপনি যে ঘরে ছিলেন, ঠিক তার পাশের ঘরেই তো আছেন"

"ও..."

সুশোভনের উর্দ্ধোৎক্ষিপ্ত ভ্রূ সেইভাবেই স্থির হয়ে রইল খানিকক্ষণ।

"তাঁর অসুখ করেছে ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ"

"ও, যাক্—আর কেউ আসে নি তাহলে ?"

ফদকা মাথা নাড়লে শুধু।

"বাঁচা গেল"—বাইকের উপর চড়ে বসল আবার সুশোভন—"তুই গোঁসাইজিকে গিয়ে বেশী ঘাবড়ে দিস না যেন। গোঁসাইজি বেরিয়ে গেছেন বলেই বুড়ি চটেছে সম্ভবত। তিনি ধীরে সুস্থে এলেও চলবে। তুই বরং ডাক্তারকে খবর দে আগে"

ফদকা ঘাড় নেড়ে চলে গেল। তার দৃঢ়বিশ্বাস, গোঁসাইজি না এসে পড়লে বুড়ি বাঁচবে না।

"যাক্—কেউ তাহলে আসেনি এখনও পর্য্যন্ত"—বাইকে ভাবতে ভাবতে চলল সুশোভন—"গোঁসাইজিও নেই। ফদকাও চলে গেল। গুড্। আমিই বোধহয় প্রথমে হাজির হব সেখানে। এক ঘরে শোওয়ার ব্যাপারটা কোনরকমে যদি চাপা দিয়ে ফেলতে পারি, তাহলে বাকিটা সামলে নিতে বেগ পেতে হবে না বিশেষ। গোঁসাইজি এসে পৌছবার আগে যদি ওদের এখান থেকে বার করে' ফেলতে পারি তাহলে তো কথাই নেই। ইতিমধ্যে তাদের আবার সেই সৎরঙ্গবাবু নাকি—তার সঙ্গে দেখা হয়ে গেলেই তো হয়েছে। যাক আপাতত যতটা দেখা যাচ্ছে, হতাশজনক নয় খুব—"

প্রাণপণে বাইক চালাতে লাগল সে।

(২০)

হোটেলের সামনের দরজাটি আস্তে আস্তে খুলে সুশোভন খুব সন্তর্পণে ভিতরে গলাটি ঢুকিয়ে চেয়ে দেখলে। কোনও সাড়া-শব্দ নেই। ঢুকে পড়ল পা টিপে টিপে। সামনের ঘরে কেউ নেই। সিঁড়ি দিয়ে উঠল খানিকটা। উপরে একটা অস্পষ্ট গোঙানির শব্দ শোনা যাচ্ছে। হাঁপানি-রোগীর শ্বাসকণ্ঠের শব্দ। নেবে

এসে দেখলে ওদিকের বারান্দার বেঞ্চিতে গোকুল শুয়ে আছে। স্বপ্নাচ্ছন্নের মতো। চোখ চেয়ে আছে কিন্তু স্বপ্নাচ্ছন্ন ভাব। সুশোভনকে দেখে সে হাসল একটু, তারপর কি মনে হওয়াতে হাত তুলে নমস্কার করলে। হোটেলের কিছু দূরে যে তাড়িখানাটা আছে গোকুল সেখানকার চাকর। ঝুনুকে খোঁজবার সময় সকালে ওর সঙ্গে ভাব হয়েছিল সুশোভনের। সুশোভনের কাছ থেকে মোটা রকম বখশিস পাওয়ার পর ভাবটা বেশ গাঢ়রকমই হয়েছিল।

"গোকুল যে, এখানে কেন"

"ফতু আমায় বসিয়ে রেখে গেল"

'ফতু' শুনেই সুশোভন বুঝলে গোকুল তাড়ি খেয়েছে।

"আমি আবার ফিরে এলাম গোকুল"

"আজ্ঞে। কিন্তু ফতু যে নেই, আপনার খাওয়া দাওয়ার কি ব্যবস্থা হবে। ঠাকুর নেই, গোঁসাইজিও নেই"

"ঠাকুর কোথা গেল"

"হাটে গেছে বোধ হয়"

"খাব না এখন কিছু। দেখ গোকুল, এখানে কয়েকজনের আসবার কথা আছে। শুনছি তারা তোমাদের তাড়ির দোকান খানাতল্লাস করবার মতলবে আসছে। আমাকেও ওই সঙ্গে জড়াবার মতলব তাদের। গোঁসাইজিকেও জড়াতে চায় শুনলাম। ওরা যদি এসে তোমাকে কোনও কথা জিজ্ঞাসা করে—বোলো, আমি কিছু জানি না। বুঝলে"

"আজ্ঞে"

সুশোভন পকেট থেকে ব্যাগ বার করে' আর একটি টাকা গোকুলের হাতে দিলে। গোকুল টাকাটা নিয়ে চোখ মিটি মিটি করে' তাকাতে লাগল।

সুশোভন আবার বললে, "বলবে আমি কিছু জানি না"

"আজ্ঞে"

দূরে একটা মোটরের শব্দ শোনা গেল। আসছে বোধ হয়।

"ওই আসছে বোধ হয় বুঝলে"

"আজ্ঞে"

"যদি কিছু জিগ্যেস করে, স্রেফ বলবে আমি কিছু জানি না"

"আজ্ঞে"

"শুয়ে ঘুমোও তুমি, বুঝলে"

মোটরটা এসে থামল। সুশোভন তাড়াতাড়ি পাশের ঘরে গিয়ে জানলার কপাটটা একটু ফাঁক করে' দেখলে। বেশ দীর্ঘাকৃতি বলিষ্ঠ একটি লোক মোটর থেকে নেবেছেন। হরিমটর পান্থনিবাসের দিকে একনজর চেয়ে ড্রাইভারকে কি যেন বললেন। এগিয়ে এলেন তারপর।

"ডাক্তার এল"—সুশোভন ভাবলে—"এত শিগ্‌গির ডাক্তার এসে পড়বে তা'তো ভাবি নি। এতে জট আরও না পাকিয়ে যায়"

একটা গম্ভীর বে-পরোয়া ভাব মুখে ফুটিয়ে দাঁড়িয়ে রইল সে। বাইরের কপাট খুলল, বন্ধ হল। তারপর পায়ের শব্দ পাওয়া গেল। বেশ দৃঢ় পদ-ক্ষেপ। তারপর যে ঘরে সে দাঁড়িয়েছিল সেই ঘরের কপাটটা 'ঝড়াম্' করে' খুলে গেল।

"ও"—ব্রজেশ্বরবাবু বললেন। গম্ভীর ধীর স্থির প্রকৃতির লোক ব্যস্ত হলে যেরকম দেখায় ব্রজেশ্বরবাবুকে সেই রকম দেখাচ্ছিল।

"নমস্কার"—এগিয়ে এল সুশোভন।

"এই হোটেল কি আপনার"

"না"

"হোটেলের মালিক কোথায়"

"তিনি বেরিয়ে গেছেন। যে রোগীটিকে দেখতে এসেছেন তিনি আছেন ওপরে। একটু গিয়ে বাঁ ধারে সিঁড়ি। উঠে ডান হাতে একটা ঘর, তার পরের ঘরটাই। উঠলে শব্দই শুনতে পাবেন"

ব্রজেশ্বরবাবুর তাড়া ছিল যদিও—তবু ধীরভাবে দাঁড়িয়ে তিনি সুশোভনের

অনাবশ্যক কথাগুলো শুনলেন শেষ পর্য্যন্ত। সকলের সব কথা শেষ পর্য্যন্ত শোনাই তাঁর স্বভাব। স্থশোভনের কিন্তু অস্বস্তি লাগছিল।

"আমি তো রোগী দেখতে আসি নি"—মৃহু হেসে বললেন ব্রজেশ্বরবাবু সব শুনে।

"ও"

"আপনি কি এই হোটেলে থাকেন"

"না, থাকি না। তবে—মানে—এসে পড়েছি—"

"এই হোটেলের বিষয়ে হু'চারটে খবর জানতে চাই। কার কাছ থেকে জানা যায় বলুন তো। কাউকে তো দেখতে পাচ্ছি না। কোন সাড়াশব্দও নেই"

"আর কিছুক্ষণ সবুর কর দাদা"—মনে মনে বলল স্থশোভন—"সাড়া এবং শব্দ হুইই প্রচুর পরিমাণে পাবে।"

তারপর স্বাভাবিক কণ্ঠে হেসে বললে—"গোঁসাইজি হলেন এই হোটেলের মালিক। তিনি কার সঙ্গে যেন দেখা করতে বেরিয়েছেন। আজ বিকেলটা ছুটি নিয়েছেন আর কি। কিন্তু দোতলায় যে ভদ্রমহিলাটি থাকেন তিনি অস্থস্থ হয়ে পড়েছেন হঠাৎ। তাই এই হোটেলের চাকর ফদকা ছুটেছে গোঁসাইজিকে আর একজন ডাক্তারকে ডেকে আনতে। তাই আমি আপনাকে ডাক্তার ভেবেছিলাম"

ব্রজেশ্বরবাবু গম্ভীরভাবে মাথা নাড়লেন।

"গোঁসাইজি আর ফদকা ছাড়া হোটেলে আর কেউ থাকে না?"

"ঠাকুর হাটে গেছে। ওইদিকে বেঞ্চিতে শুয়ে আছে একজন। তবে সে লোকটা—"

"তাকে দিয়েই কাজ চলে যাবে আমার। ধন্যবাদ"

ব্রজেশ্বরবাবু ভিতরের দিকে এগিয়ে গেলেন।

"না, শুনুন—আমার মনে হয় চলবে না। মানে, সে লোকটা একটু—"

ব্রজেশ্বরবাবু দাঁড়িয়ে পড়লেন। বাধা পেয়ে তাঁর মুখভাবে ঈষৎ বিরক্তিও ফুটে উঠল।

"এ হোটেলের কিছু কিছু খবর আমিও বলতে পারব। কি জানতে চান বলুন না"

"না, তার দরকার নেই। ধন্যবাদ। আমিও যে খবর জানতে চাই তা একটু গোপনীয়। বাইরের লোকের কাছে বলা চলবে না। কোনদিকে লোকটি শুয়ে আছে বললেন ?"

অনিচ্ছাসহকারে সুশোভনকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে হল।

"এইদিক দিয়ে সোজা চলে যান। বেঞ্চিতে শুয়ে আছে। কিন্তু গোকুলের কাছ থেকে কোনও খবর জোগাড় করা কঠিন এখন। নিজেই সেটা বুঝতে পারবেন এখুনি। যান—সোজা ঢুকে পড়ুন—"

ব্রজেশ্বর ভিতরের দিকে চলে গেলেন। সুশোভনের এই উক্তিতে তাঁর মুখ-ভাবে ঈষৎ অপ্রসন্নতা ফুটে উঠল আবার। ভাবটা যেন—আরে বাপু, আমাকে দেখতেই দাও না, তুমি ফপরদালালি করছ কেন।

"গোপনীয় খবর ?"

ঈষৎ উৎসুক হয়ে সুশোভন চলে এল বাইরে। লোকটার চাল-চলন মোটেই ভাল লাগছিল না সুশোভনের। হরিমটর পান্থনিবাসে কি গোপনীয় খবর সংগ্রহ করতে এল লোকটা। উকীল টুকীল নয় তো ? না, উকীলের চেহারা এরকম হতেই পারে না। ডিটেকটিভ ? সুশোভন আস্তে আস্তে আবার ভিতরের দিকে গেল। কাণ পেতে রইল দরজার কাছে, যদি কিছু শোনা যায়।...কিচ্ছু শোনা গেল না। আবার বাইরে চলে এল সে। জানলাটা খুলে বাইরের দিকে চেয়ে দেখলে। যে মোটরে ভদ্রলোক এসেছিলেন সেটি দাঁড়িয়ে আছে। ড্রাইভারটি সিগারেট টানছে বসে' বসে'। মোটরের পিছনে ভদ্রলোকের স্যুটকেস বিছানাপত্র বাঁধা রয়েছে। সুশোভন সেই দিকেই এগিয়ে গেল ধীরে ধীরে।

"তুমিই কি গোকুল"

ব্রজেশ্বরবাবু তাঁর ঈষৎ অনুনাসিক অথচ দৃঢ়কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন।

গোকুল চমকে উঠল।

"আজ্ঞে হ্যাঁ—"

ব্রজেশ্বরবাবু তাঁর ছড়িটির উপর দুহাতে ভর দিয়ে সামনের দিকে ঈষৎ ঝুঁকে দাঁড়িয়েছিলেন।

"হোটেলের মালিক শুনছি বাইরে গেছেন। তোমারই উপর সব ভার দিয়ে গেছেন নাকি"

গোকুল ফ্যাল ফ্যাল করে' একবার চাইলে তাঁর মুখের দিকে। স্বভাবতই চোখের দৃষ্টি তার সজল। বিস্ফারিত হওয়াতে জোলো-ভাবটা আরও স্পষ্ট হয়ে উঠল। হঠাৎ খুব কুণ্ঠিত হয়ে ঘাড় চুলকোতে লাগল সে।

"তোমারই ওপর সব ভার নাকি"

"জানি না"

"এ অঞ্চলে এটি ছাড়া আর হোটেল আছে কি"

"জানি না"

"কাল রাত্রে এখানে কে কে ছিল বলতে পার"

"জানি না"

"তোমার জ্ঞান খুব সীমাবদ্ধ দেখছি। ক'আনায় এক টাকা তা জান কি"

"জানি না—আজ্ঞে না, সেটা জানি"

ব্রজেশ্বর পকেটে হাত ঢুকিয়ে মণিব্যাগটি বার করলেন।

"বাইরে ওই যে ভদ্রলোকটি রয়েছেন উনি কে বলতে পার"

"জানি না"

ব্রজেশ্বর মণিব্যাগটি পকেটে ঢুকিয়ে ফেললেন।

"জানি না, সত্যি"

"উনি কি কাল রাত্রে ছিলেন এখানে"

"জানি না—হয় তো ঠিক মনে পড়ছে না"

"ওঁর সঙ্গে কি—"

হঠাৎ থেমে গেলেন ব্রজেশ্বর। কথাটা আটকে গেল যেন মুখে। তারপর প্রাণপণে শক্তি সংগ্রহ করে' এগিয়ে এলেন তিনি আর একটু। অনাবশ্যক উচ্চকণ্ঠে প্রায় ধমকের স্বরে প্রশ্ন করলেন—"ওঁর সঙ্গে কি কোনও মেয়েছেলে ছিল?" ইতস্তত করতে লাগল গোকুল। বোকার মতো একটু হেসে ঘাড়টা আর একবার চুলকে ব্রজেশ্বরবাবুর দৃষ্টি এড়িয়ে অন্যদিকে চাইবার চেষ্টা করতে লাগল।

"উত্তর দিচ্ছ না কেন"

"ওনাকেই আপনি জিগ্যেস করুন না"

মেয়েলোকটি কোথায় এখন"

"তা কি ক'রে বলব"

"মেয়েটি দেখতে কি রকম ছিল"

"এই মেয়েরা যেমন হয়"

"ভদ্রলোকের মেয়ের মতো"

"তা বলতে হবে বই কি"

"তার সঙ্গে কি একটা কুকুর ছিল"

"আজ্ঞে—তা—"

হঠাৎ থেমে গেল গোকুল। ব্রজেশ্বরবাবুর যে হাতটি পকেটের ভিতর মণিব্যাগ ধরে' ছিল সেই দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ হল তার।

"তা ঠিক বলতে পারছি না"

ব্রজেশ্বরবাবু পকেট থেকে হাত বার করে' নিলেন। বার করে' নিজের থুতনীতে হাত বুলোতে লাগলেন। গোকুলের দৃষ্টিও তাঁর পকেট থেকে থুতনীর দিকে গেল। গোকুল মুখটা ভাল করে' দেখল এইবার। লম্বা গোছের মুখ। তার মনে হল মুখে রাগের ভাব তো নেই, বরং একটু চিন্তিতই যেন। হাত কিন্তু আর পকেটের দিকে নামল না।

"আজ্ঞে তা ঠিক বলতে পারছি না"

ব্রজেশ্বরবাবু আর কোনও প্রশ্ন করলেন না। গভীর চিন্তামগ্ন হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন কয়েকমুহূর্ত। তারপর নিজের বিবেকেরই বিরুদ্ধে শক্তিসংগ্রহ করে' ফেললেন সহসা যেন সম্ভবত। পকেট থেকে ব্যাগ বার করে' গোকুলকে একটি টাকা দিয়ে তিনি বললেন, "এই হোটেলের আপিসটা কোথায় তা আমাকে দেখিয়ে দিতে পার"

"ওই যে—"

"তালাবন্ধ রয়েছে দেখছি। চাবি কোথায়"

টাকা পেয়ে গোকুল পুলকিত হয়েছিল। আপিস ঘরের চাবি যে হুকটিতে গোঁসাইজি টাঙিয়ে রাখতেন তা গোকুলের জানা ছিল। সে তাড়াতাড়ি চাবি এনে ঘর খুলে দিয়ে বললে, "এই যে, আপনি বসুন এসে। গোঁসাইজি এসে পড়বেন এখুনি। কেউ যদি এসে পড়ে তাকে বসবার জন্যই চাবি রেখে গেছেন তিনি। এখুনি এসে পড়বেন। আপনার কিছু দরকার আছে কি? জলটল—"

"কিছু না। তুমি এস আমার সঙ্গে"

ঠিক এই সময় সুশোভন বাইরে থেকে এসে ভিতরে ঢুকল। ব্রজেশ্বর সুশোভনের দিকে ভ্রূকুঞ্চিত করে' একনজর চেয়ে দেখলেন। তারপর আপিস ঘরে ঢুকে গেলেন।

সুশোভন হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর হেঁট হয়ে বাঁ পায়ের গোছটা একবার চুলকে নিলে। সে যে কি করবে তা ভেবে পাচ্ছিল না—এক কথায় যাকে কিংকর্তব্যবিমূঢ় বলে সেই অবস্থা। তার মনে হচ্ছিল গোঁসাইজিও যদি এখন এসে পড়েন সে যেন বাঁচে। মোটরের পিছনে যে স্যুটকেসটি ছিল তাতে বেশ বড় বড় হরফে লেখা রয়েছে—ব্রজেশ্বর দে। ব্রজেশ্বর দে? সান্ত্বনার স্বামী। সর্বনাশ! সে কি করবে ঠিক করতে পারছিল না প্রথমটা। হোটেলের দিকে ব্যায়ত-আননে চেয়ে ছিল খানিকক্ষণ। বাইরেই দাঁড়িয়ে থাকবে, না হোটেলের দিকে এগিয়ে যাবে, না সরে পড়বে—কিছুই ঠিক করতে পারছিল না।

"গোপনীয় খবর? ব্রজেশ্বর দে গোপনীয় খবর সংগ্রহ করতে এসেছে! সারলে দেখছি! গোঁসাইজিও তো এল বলে'। আর আমিও একটা ঝড়ঝড়ে' বাইক হাঁকিয়ে ঠিক এসে পড়লাম এই সময়ে। লে হালুয়া! কি করা যায় এখন—"

ভ্রূ কুঞ্চিৎ করে' দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ইত্যাকার চিন্তা করলে সে খানিকক্ষণ। তারপর হঠাৎ তার মনে হল গতরাত্রে সে-ই যে সান্ত্বনার সঙ্গে এখানে ছিল তা ব্রজেশ্বরবাবু টের পান নি এখনও। তার আসল নামটাও তো কেউ জানে না এখানে। ব্রজেশ্বরবাবু বড় জোর কারও মুখ থেকে (কে সেই রাস্কেল?) এইটুকু শুনে থাকতে পারেন যে গতরাত্রে তাঁর স্ত্রী কোনও অজ্ঞাতনামা যুবকের সঙ্গে এই হোটেলে রাত কাটিয়ে গেছেন। সে যে সেই যুবক একথা ব্রজেশ্বর বাবু এখনও জানেন না। জানা সম্ভব নয়। এই কথাটা মনে হওয়াতে তার মনে ভরসা হল খানিকটা। মনে হল ব্রজেশ্বরবাবুর এই অনুসন্ধানে একটু সাহায্য করবার ভান করলে ব্রজেশ্বরবাবুর সন্দেহও হয়তো হবে না তার উপর। কিন্তু ব্রজেশ্বরবাবুর ভাবভঙ্গী দেখে ঘাবড়ে গেল সে। একনজর চেয়েই সুশোভন বুঝতে পেরেছিল ভদ্রলোক ব্যাপারটা জেনেছেন কিছু। কিন্তু কতটা? কি ক'রে জানলেন?

ব্রজেশ্বর আপিসের ভিতর ঢুকে গেলেন। সুশোভন বাইরে দাঁড়িয়ে উসখুস করতে লাগল। ভয়ঙ্কর রাসভারী লোক মনে হচ্ছে। দুষ্টুমি ধরা পড়ে গেলে দুষ্টু ছেলের শিক্ষকের সামনে যে রকম মনোভাব হয় সুশোভনের অনেকটা সেই রকম হতে লাগল। মনে হতে লাগল যেন সে ব্রজেশ্বরবাবুর চেয়ে অনেক ছোট, শুধু বয়সে নয়, উচ্চতাতেও! একটু এগিয়ে এসে জানলা দিয়ে আপিসের ভিতর আস্তে উঁকি দিয়ে দেখল সে। ব্রজেশ্বরবাবু 'অ্যাড্‌মিশন রেজিস্টার'খানা ওল্টাচ্ছেন, নামের পর নাম দেখে যাচ্ছেন। হঠাৎ এক জায়গায় আঙুল দিয়ে থেমে গেলেন তিনি। পরিচিত হস্তাক্ষর চিনতে দেরি হল না। নির্নিমেষে গম্ভীরভাবে চেয়ে রইলেন খানিকক্ষণ। মুখের একটি পেশী বিচলিত হল না

কিন্তু। যেন জীবন্ত মানুষের মুখ নয়, মুখোস। বিরাট খাতাটা সশব্দে বন্ধ করে' অন্যদিকে চাইলেন তিনি।

সুশোভন সরে' এল জানলা থেকে। গোকুলই প্রথম আপিস থেকে বেরুল এবং বেরুবামাত্র সুশোভনের সামনে পড়ে' গেল। এই ব্যাটাই সব ফাঁস করে' দিলে না কি! বখশিস টকশিস সব মাঠে মারা গেছে সম্ভবত। গোকুলের একটা গরু-চোর-গোছ ভাব দেখে আরও সন্দেহ হল সুশোভনের।

"কাল রাত্রে আমি যে ওই মেয়েলোকটির সঙ্গে ছিলাম তা' বল নি তো ভদ্রলোককে"—ফিস ফিস করে' জিগ্যেস করলে সুশোভন।

"না"—অনুরূপ ফিসফিসে উত্তর দিলে গোকুল—"আমি বলি নি কিছু। কিন্তু জিগ্যেস করছিল"

"উত্তরে কিছু বলেছ না কি"

"না বলিনি। কিন্তু কতবার জিগ্যেস করেছে যে"—

ঢোঁক গিলে থেমে গেল গোকুল দ্বারের দিকে চেয়ে। ব্রজেশ্বরবাবুর দীর্ঘদেহ আপিসের দ্বারপ্রান্তে দেখা গেল।

সুশোভন সোজা ঢুকে পড়ল সামনের হলটায়।

(২১)

সান্ত্বনা দোতলায় ছিল শব্দ শুনে দ্রুতপদে নাবতে লাগল সিঁড়ি দিয়ে। সামনের হলটায় দিগ্বিজয় সিংহ রায়, সুরেশ্বরী দেবী, কতকগুলো ভিজে কাপড়, বর্ষাতি প্রভৃতি মিলে যাচ্ছেতাই কাণ্ড হচ্ছিল একটা।

"সান্ত্বনা কই, কোথায় সে"—বারবার জিজ্ঞাসা করছিলেন সুরেশ্বরী দেবী।

"ওগো, তুমি ওই কাদামাখা জুতোটা বাইরে ছেড়ে এস না। গরম জল করতে বলেছি, তোমরা স্নান করে' ফেল সব"

সকলের দিকে চেয়ে বললেন তিনি আদেশের ভঙ্গীতে।

ট্যাঁশ হিন্দিতে উত্তর দিলেন ছকুবাবু—"মরে গেলেও আমি তো আস্নান করছি না বাবা"

"যাঁরা ভিজেছেন তাঁদের বলছি। আপনাকে নয়"

"আমি একটুও ভিজিনি"—সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন দিগ্বিজয়—"ভিজেছ বরং তুমি। তোমারই আগে স্নান করা উচিত"

"গোবর্দ্ধনবাবু, আপনিও তো খুব ভিজেছেন। আপনি করবেন না?"

গোবর্দ্ধনবাবুর দিকে চেয়ে সুরেশ্বরী প্রশ্ন করলেন।

"বেশ তো, করব"—হাসিমুখে তৎক্ষণাৎ রাজি হয়ে গেলেন গোবর্দ্ধন।

"ওমা, এই যে সান্ত্বনা, ওপরে ছিলি বুঝি—"

সান্ত্বনা প্রণাম করতেই সুরেশ্বরী দেবী জড়িয়ে ধরলেন তাকে এবং সকলের সমুখেই চুম্বন করলেন।

দিগ্বিজয়কে প্রণাম করতেই তিনি বলেন, "ছকুবাবুর মুখে যখন শুনলাম যে তোমরা এসেছ তখন কি যে আনন্দ হল। আমার ভয় হচ্ছিল, আমি বুঝি ভুল তারিখ জানিয়েছিলাম তোমাদের—"

"আমি কিন্তু তখনই বলেছিলাম তা জানাও নি"—ঘাড় ফিরিয়ে সুরেশ্বরী বললেন—"তোমার ভুল কখনও হয় না। তারপর, সান্ত্বনা, তুই আছিস কেমন।"

"ভুল করেছি কি না, তার অকাট্য প্রমাণ এখনও পাওয়া যায় নি। সুশোভনদের তো পাত্তাই নেই কারও। সান্ত্বনা তুমি এঁদের চেনো কি—ইনি হলেন ছকুবাবু, আর ইনি হলেন গোবর্দ্ধনবাবু। দুইজনেই সম্পর্কে আমার"—সম্পর্কটা হঠাৎ গুলিয়ে ফেললেন দিগ্বিজয়বাবু—"মানে শ্বশুরবাড়ির সম্পর্কে আত্মীয়"

সুরেশ্বরী বললেন, "আচ্ছা, ব্রজেশ্বর এসেই চলে গেল কেন। ছকুদা বলছিলেন—এসে নাবেন নি পর্য্যন্ত। আর তোর কুকুর নিয়ে কি কাণ্ড হয়েছিল। ভাগ্যে ভদ্রলোক পেয়ে দিয়ে গেলেন। লোকটি খুব ভাল বলতে হবে। ব্রজেশ্বর আবার আসবে তো"

"আসবে বই কি, শিগ্‌গিরই আসবে"—সান্ত্বনা জবাব দিলে চট করে'—"খুব জরুরি একটা দরকারের জন্য চলে যেতে হল। কোথাকার একটা জরুরি ফাইল না কি তাঁর কাছে থেকে গিয়েছিল। সেইটে দিয়েই ফিরে আসবেন"

"দরকারি কাইলটা না দিয়েই চলে এসেছিলা! কি যে সব ভুলো মন তোমাদের হয়েছে আজকাল"—সুরেশ্বরী দেবী তারপর দিগ্বিজয়ের দিকে ফিরে বললেন—"তুমি যদি স্নান না-ও কর, কাপড়-চোপড়গুলো ছাড় অন্তত"

"ছাড়ছি। স্নান করলেও মন্দ হয় না। কিন্তু তুমি নিজে করছ কি! ভিজে সপ সপ করছে যে তোমার কাপড়—"

"কি যে বাজে কথা বল! আমি একটুও ভিজি নি। এ যা দেখছ ওপর-ওপর। তবে এগুলো ছাড়ব, আমি। স্নানও করতে পারি—"

ছকুবাবু পাইপ ধরিয়েছিলেন, দিগ্বিজয়ও মোটা সিগার বার করলেন একটা। গোবর্দ্ধনের দিকে চেয়ে বললেন—"নেবেন না কি"

"ও কি, তোমরা স্নান করে' ফেল আগে। সিগার বার করছ যে মোটা মোটা"

"থাক তবে। স্নান সেরেই খাব"

কুণ্ঠিত গোবর্দ্ধন প্রসারিত হস্ত গুটিয়ে নিলেন।

"টেলিগ্রাম"

দ্বারপ্রান্তে পিওন এসে দাঁড়াল।

দিগ্বিজয় তাড়াতাড়ি গিয়ে টেলিগ্রামটা নিলেন এবং পড়েই সান্ত্বনার দিকে চেয়ে বলে' উঠলেন—'এ কি, ব্রজেশ্বর কোলকাতা থেকে টেলিগ্রাম করছে"

"খুব চট করে' পৌঁছে গেছেন তো"—সান্ত্বনা বললে। টেলিগ্রামটা আর একবার পড়ে' দিগ্বিজয় বললেন, "টেলিগ্রাম করেছে আজ সকালে। লিখছে আজ সাড়ে চারটের ট্রেনে আসছে"

"তা কি করে' সম্ভব—" নিরীহ কণ্ঠে প্রশ্ন করলে সান্ত্বনা। "তাহলে কাল বোধ হয় করেছিলেন আজ এসে পৌঁছল"

"কিন্তু টেলিগ্রামেই তো তারিখ রয়েছে। এই যে নাইন্‌টিন্‌থ। আমি আবার বোধ হয় গোলমাল করে' ফেলছি। দেখ তো, এটা নাইনটিন্‌থই তো মনে হচ্ছে—না এইটিন্‌থ, দেখ তো। কিম্বা কালই বোধ হয় নাইন্‌টিন্‌থ ছিল তাহলে—তা হবে—"

"নেহি"—মাথা নেড়ে ছকু বললেন—"আজই নাইনটিন্থ"

"হ্যাঁ আজই নাইনটিন্থ", দিগ্বিজয় বললেন আবার, "আমাদের নন্দর জন্মদিন নাইন্‌টিন্থ, তাকে চিঠি লিখলাম যে আজ সকালে—"

"কাল হয় তো তার জন্মদিন ছিল", সুরেশ্বরী বললেন।

"না গো না, নাইন্‌টিন্থই তার জন্মদিন"

"তা অস্বীকার করছি না, কিন্তু কাল হয়তো নাইনটিন্থ ছিল। কিন্তু না তুমি তো ভুল করবার লোক নও"

"না, না, থাম, আমারই ভুল হচ্ছে বোধ হয়। গোলমাল করে' ফেলছি, কালই বোধ হয় নাইন্‌টিন্থ ছিল—থাম, ক্যালেণ্ডার একখানা দেখলেই তো চুকে যায়—"

"চল মাসীমা, তুমি কাপড়-চোপড় ছেড়ে ফেলবে চল আগে। টেলিগ্রামের কি আজকাল কোনও ঠিক-ঠিকানা আছে। হয়তো কেরাণীই লেখবার সময় ভুল তারিখ বসিয়ে দিয়েছে, কিম্বা চাকরে হয়তো দেরি ক'রে দিয়েছে। উনি এলেই বোঝা যাবে সেটা। তুমি এখন ওঘরে চল"

সুরেশ্বরীকে প্রায় টানতে টানতে সান্ত্বনা পাশের ঘরে নিয়ে যাচ্ছিল।

"তোরা কোলকাতায় চাকর পেয়েছিস না কি। কোলকাতায় শুনেছি আজকাল চাকর পাওয়াই যায় না। মাস্থদের চিনিস ?"

"ব্যাপারটার কিন্তু একটা 'ফায়সালা' হওয়া দরকার। শুনুন সান্ত্বনা দেবী" ছকুবাবু এগিয়ে এলেন, "আপনার স্বামী আজ সাড়ে চারটের সময় পৌছুচ্ছি বলে' চাকরকে দিয়ে কি করে' টেলিগ্রাম পাঠাতে পারেন তাতো আমার মগজে ঘুসছে না। মোটর না বেগড়ালে তো আপনাদের কালই এখানে পৌছবার কথা। তা-ও ট্রেনে নয়, মোটরে—"

"সত্যি ব্যাপারটা এমন ঘোরালো গোলক ধাঁধার মতো দেখাচ্ছে যে মাথায় কিছু ঢুকছে না আমার"—একটু শুষ্ক হাসি হেসে জবাব দিলে সান্ত্বনা।

"আমারও ঢুকছে না"—দিগ্বিজয় বললেন।

"গোপাল ভাঁড়ের একটা গল্প আছে"—হেসে স্থরু করলেন দিগ্বিজয়, করেই ভ্রূকুঞ্চিত করে' থেমে গেলেন আবার—"দাঁড়াও গোপাল ভাঁড়ের না বীরবলের, আবার গুলিয়ে ফেললাম—"

অপ্রস্তুত মুখে থেমে গেলেন তিনি। স্থরেশ্বরীও এ নিয়ে বাদানুবাদ করবার স্থযোগ পেলেন না। টেলিগ্রামটার দিকে তর্জ্জনী আস্ফালন করে' ছকুবাবু যা বলতে লাগলেন, তাতেই মনোনিবেশ করতে হল তাঁকে।

"আপনি এবং আপনার স্বামী এখানে আসবার জন্য কাল একটা হাওয়া গাড়িতে রওয়ানা হয়েছিলেন কোলকাতা থেকে। হাওয়াগাড়ির কল বিগড়ে যাওয়াতে আপনারা কাল রাতে ধরমশালা না কোথায় রাত কাটিয়েছিলেন। এ খবর আপনার নোকরদের মালুম হ'তে পারে না। তারা এ বিষয়ে তার ভেজতেও পারে না। আপনার স্বামী আজ সমস্ত সকাল আপনার সঙ্গে মহজুদ ছিলেন, এতদূর তক্ এসেছিলেন, তিনিও ও তার ভেজতে পারেন না। তাছাড়া তিনি লিখছেন ট্রেনে করে' আজ সাড়ে চার বাজে পহুঁছ যাউঙ্গে। বড় তাজ্জব লাগছে আমার"

"মরুক গে, চান করে' ফেল সব একে একে। প্রথমে কে ঢুকছে বাথরুমে"

"মাফ কিজিয়ে মালকাইন"—ছকুবাবু স্থরেশ্বরীর দিকে অভিবাদনের ভঙ্গিতে ঈষৎ মাথা ঝুঁকিয়ে সরে গেলেন।

স্থরেশ্বরী দিগ্বিজয়ের দিকে চেয়ে বললেন, "তুমি যাচ্ছ তো বাথরুমে এবার"

প্রকাণ্ড সিগারটার দিকে এক-নজর চেয়ে দিগ্বিজয় উত্তর দিলেন—"হ্যাঁ, এই যে হয়ে গেল আমার। তুমি কিন্তু ভিজে কাপড়ে কেন যে দাঁড়িয়ে আছ এখনও, তা বুঝতে পারছি না"

"তুমি চল মাসীমা ওঘরে"—সান্ত্বনা আর একবার স্থরেশ্বরীকে পাশের ঘরে নেবার চেষ্টা করলে।

"চল যাচ্ছি। ব্রজেশ্বর তাহলে সাড়ে চারটার ট্রেনে আসছে না তো? কি ঠিক হল, সেইরকম ব্যবস্থা তো করতে হবে আবার—"

ছকুবাবু বিস্ফারিত চক্ষে সান্ত্বনার দিকে চেয়ে ছিলেন। এই কথায় এগিয়ে এসে পরিষ্কার বাংলায় তিনি বললেন, "সাড়ে চারটার ট্রেনে আসা কি করে' সম্ভব তাঁর পক্ষে! ঘণ্টা দুই আগে তিনি তো এখান থেকেই মোটরে রওনা হয়েছেন কোলকাতার দিকে"

"কি জানি বুঝতে পারছি না ঠিক। সে যা হয় হবে, চল মাসীমা তুমি ওঘরে, কাপড়টা ছাড়বে চল"

সান্ত্বনা সুরেশ্বরী দেবীকে পাশের ঘরে নিয়ে চলে গেল।

অপস্রিয়মান দুটি নারীমূর্ত্তির দিকে ছকুবাবু বড় বড় চোখ করে' চেয়ে রইলেন খানিকক্ষণ। তারপর কাঁকড়ার মতো পাশ দিয়ে সরে' সরে' ঘরের কোণের টেবিলের কাছে গিয়ে আর এক ডোজ 'ষ্টিংগাহ' পান করে' ফেললেন।

"চীজ বটে মেয়েমানুষ! উফ! বেশ একটি 'ওঝরা' পাকিয়ে ফেলেছে। কিন্তু সেদিকে কারও লক্ষ্য নেই। দিমাগই নেহি হ্যায় কিসি কো"

রায়বাহাদুর দিগ্বিজয় সিগারটি একটি অ্যাশট্রের উপর সন্তর্পণে নাবিয়ে রেখে নিতান্ত অনিচ্ছাসত্বে স্নান করতে যাচ্ছিলেন। ছকুবাবুর শেষ কথাগুলি শুনতে পেলেন তিনি। সুদীর্ঘকাল দাম্পত্যজীবন ভোগ করার ফলে স্ত্রীর সম্বন্ধে তাঁর যে মনোভাব হয়েছিল তা ঠিক বর্ণনা করা শক্ত। অনেকটা অন্ধ বিশ্বাস গোছের। ছকুবাবুর শেষ কথাগুলি শুনতে পেলেন তিনি। পেয়ে বললেন, "ওসব নিয়ে মাথা ঘামিয়ে মরছেন কেন। সুরোর হাতে ছেড়ে দিন, সব ঠিক হয়ে যাবে—"

উন্মুক্ত বাতায়ন-পথে তাঁর এই উপদেশ সান্ত্বনারও কানে ঢুকল। শুধু কানে নয়, মরমেও। অকূল পাথারে পড়ে' সে যে কি করবে ভেবে পাচ্ছিল না, হঠাৎ যেন ভেলা দেখতে পেলে একটা। ঠিক! মাসীমারই শরণাপন্ন হওয়া যাক। ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই তো 'উনি' এসে পড়বেন। ইতিমধ্যে যাহোক একটা ব্যবস্থা করে' ফেলতেই হবে। ওই বেরাল-গুঁফো ছকুবাবুটি মোটেই সুবিধের লোক নয়। সমস্ত ঘটনা উনি যদি জানতে পারেন তাহলে ত্রিভুবনে আর কারও জানতে বাকী থাকবে না। 'ওঁর' সঙ্গে ষ্টেশনেই দেখা করে' আগে থাকতে সব ঘটনাটা

খুলে বলা দরকার, তা না হলে উনিই সব ফাঁস করে' দেবেন এখানে এসেই। মাসীমাকেই সব খুলে বলতে হবে, তাছাড়া উপায় নেই।

সুরেশ্বরী দেবী বাথরুমে ঢুকে গায়ের চাদরটা ছেড়ে বেরিয়ে এসে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুলটা খুলতে লাগলেন। একটা স্মৃতিও ভেসে উঠছিল তাঁর মানসপটে। তাঁর সখী, সান্ত্বনার মা, তাঁর চুল বেঁধে দিতে কি ভালোই না বাসত!

"মাসীমা, আসলে কি হয়েছে জানেন"

"কি"

"উনিই ওই টেলিগ্রাফ করেছেন"

"ব্রজেশ্বর? কিন্তু সে তো বলছিস একটু আগে মোটরে করে'—"

"মোটরে উনি ছিলেন না"

"কে ছিল তবে"

"সুশোভনবাবু"

"অ্যাঁ! বলিস কি"

তাঁর পিঠের উপর সাদা রেশমের মতো একরাশ চুল আলুলায়িত হয়ে পড়েছিল। ঈষৎ বেঁকে চিরুণী চালাচ্ছিলেন তিনি তাতে। সান্ত্বনার কথা শুনে চক্ষু বিস্ফারিত হয়ে গেল, সোজা হ'য়ে ঘুরে দাঁড়ালেন তিনি সান্ত্বনার দিকে।

"সব খুলে বলছি শোন না। কি যে বিপদে পড়েছি! আমাকে বাঁচাও তুমি মাসীমা"

সুরেশ্বরীর হাতের চিরুণী দ্রুততর বেগে চলতে লাগল। সান্ত্বনা বলতে লাগল সব। সুরেশ্বরী দেবী কেবল মাঝে মাঝে অস্ফুটকণ্ঠে কাতরোক্তি করে' উঠছিলেন, মনে হচ্ছিল বুঝি চুলের জটে চিরুণী আটকে গিয়ে লাগছে তাঁর। অবিরাম চিরুণী চালনায় হয় তো সত্যিই লাগছিল।

সান্ত্বনা কিছু গোপন করলে না। যা যা ঘটেছিল পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণনা করে' গেল সব। সুরেশ্বরী দেবীও ঘাড় বেঁকিয়ে চিরুণী চালাতে চালাতে সব শুনলেন।

"এই হয়েছে। এখন কি করি বল মাসীমা। আমাকে উদ্ধার কর তুমি এখন কোনও রকমে—আমি মনে করলুম আগে পৌঁছে যাব—তাই"—সান্ত্বনার গলার স্বর কেঁপে গেল।

"তোর বয়স কি কোনদিনই বাড়বে না পোড়ারমুখী, বুদ্ধি কি কোনদিন হবে না! এই সেদিনই এত কাণ্ড হয়ে গেল, আবার তুই এই করলি—"

ক্ষিপ্রহস্তে চিরুণীটা টেবিলে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আবার ঘুরে দাঁড়ালেন সুরেশ্বরী। মাথার সমস্ত চুল বিস্রস্ত, চোখের দৃষ্টি জলন্ত। সে এক অদ্ভুত মূর্ত্তি হল তাঁর।

"কি হবে এখন"—ঘুরে দাঁড়িয়ে বল্লেন তিনি।

"কিচ্ছু হবে না, যদি ব্যাপারটা গোপন রাখা যায়। ওই ছকুবাবুর কাছ থেকে গোপন রাখলেই হবে"

"ব্রজেশ্বর যদি শোনে কি মনে করবে সে"

"সব শুনলে কি আর মনে করবে। মেশোমশায়ের মতো লোক উনিও, মহাদেব তুল্য—"

"তা যদি হয় তাহলে ভাবনা নেই। কিন্তু আমি তোর আক্কেলের কথা ভাবছি কেবল। কি বলে' তুই সুশোভন-বাবুর সঙ্গে একা এলি! তার বউ যদি শোনে কি ভাববে। ছি, ছি, এতটুকু হুঁস নেই তোদের। একঘরে শুতে গেলিই বা কি করে'। মনে পাপ ছিল না মানলাম না হয়, কিন্তু দৃষ্টিকটু তো। ছি ছি ছি! আর ওই সুশোভনই বা কি রকম ছেলে। তারও তো ভাবা উচিত ছিল। আজকালকার ছেলেমেয়ে কি যে হচ্ছ মা তোমরা। সেদিন এত কেলেঙ্কারি হল, আবার তুই এই করলি—"

"আমি তোমার কাছে তাড়াতাড়ি এসে পড়ব বলেই তো ওঁর সঙ্গে ট্যাক্সিতে এলাম। আমি ইচ্ছে করে' তো আর কিছু করি নি, হয়ে গেল কি করব"

অভিমানে সান্ত্বনার গলার স্বর কেঁপে উঠল একটু। সুরেশ্বরী একনজর তার দিকে তাকালেন। মা-হারা মেয়েটা! একেবারে ছেলেমানুষ এখনও।

"তুমি ভিজে সেমিজ কাপড় ছেড়ে ফেল আগে। ঠাণ্ডা লেগে যাবে তোমার"

"আমার অত সহজে ঠাণ্ডা লাগে না। গরম বোধ হচ্ছে। তুই এখন কি করতে চাস বল"

"আমি গাড়ি করে' ষ্টেশনে যাই। আর কারও সঙ্গে দেখা হওয়ার আগে আমার সঙ্গে ওঁর দেখা হওয়া দরকার। তারপর উনি আবার হঠাৎ এত শিগগির কি করে' ফিরে এলেন তার কারণ একটা বার করা যাবে দু'জনে মিলে"

"মিছে কথা বলবি ?"

"বলব না ?"

"না। মোটামুটি সত্যি কথাটাই বলতে হবে সকলকে। কিন্তু এমনভাবে বলতে হবে যাতে—ওই যে কি একটা কথা আছে—সাপও না ভাঙে—না না ঠিক উলটো বুঝি"

"সাপও মরে, লাঠিও না ভাঙে ? কিন্তু কি করে' করবে সেটা"

"তা জানিনা মা। তারই বা দরকার কি। এখানে সবই তো ঘরের লোক"

"ছকুবাবু ?"

"ওঁকে বলে' দিলে উনি কাউকে কিছু বলবেন না। উনি সম্পর্কে আমার দাদা—"

সান্ত্বনা মাথা নাড়লে।

"না, ওঁকে বিশ্বাস হচ্ছে না আমার। আচ্ছা, ওঁকে বিকেলে কোনও রকমে সরিয়ে ফেলতে পারা যায় না বাড়ি থেকে ঘণ্টা খানেকের জন্যে ?"

"তুমি কোথায় কি কাণ্ড করে' এসেছ তার জন্যে আমি ওঁকে কোথায় তাড়াই, বল এখন"

"তাড়াতে বলছি না তো। সরিয়ে দিতে বলছি। তুমি কাপড় সেমিজ ছেড়ে ফেল না আগে"

আলনা থেকে একটা শুকনো সেমিজ এবং শাড়ি নিয়ে জোর করে' স্বরেশ্বরীর হাতে গুঁজে দিল সে।

"এই বাড়িতেই যদি ওঁকে কোনও ঘরে অন্যমনস্ক করে' রাখতে পার তাহলেও হবে"

"চেষ্টা করব"

কাপড় এবং সেমিজ নিয়ে পাশের ঘরে গেলেন স্বরেশ্বরী। সেখান থেকেই কথা বলতে লাগলেন।

"ছি ছি এতটুকু বুদ্ধি কি নেই! এই সেদিন এত কেলেঙ্কারি, আবার এই! আমারই শুনে কেমন করছে! আর কারও ব্যাপার হলে বিশ্বাসই করতাম না যে এর মধ্যে কোনও কুমতলব নেই! একথা বাইরের লোক যদি শোনে তোকে কি ছেড়ে কথা কইবে এবার। চিনি তো সবাইকে। সেবার কিছুই ছিল না তাতেই অত—"

"আমার নিজের জন্যে হলে আমি কোনও তোয়াক্কাই করতাম না," এ ঘর থেকে জবাব দিলে সান্ত্বনা, "আমার খালি ভয় হচ্ছে ওঁর স্বনামে যদি কোন আঁচড় লাগে। আমার জন্যে যদি ওঁর বদনাম হয় তাহলে আমি গলায় দড়ি দেব"

"হয়েছে হয়েছে, খুব হয়েছে। চুপ কর"

"তখন থেকে কেবল বকে' যাচ্ছ আমায়"

স্বরেশ্বরী কোনও উত্তর দিলেন না। কিন্তু তাঁর চোখের দৃষ্টি থেকে স্নেহ উপচে পড়তে লাগল। সেমিজ কাপড় ছেড়ে পাশের ঘর থেকে যখন বেরিয়ে এলেন তখন একেবারে আলাদা লোক।

"আচ্ছা, যা হয়েছে হয়েছে। এখন কি করা যায়—"

"তুমি যা বলবে তাই করব"

"কিন্তু কি বলব তাই যে ভেবে পাচ্ছি না। ব্রজেশ্বর আর স্বশোভনের স্ত্রী যদি জিনিসটাকে ভালভাবে নেয় তাহলে ব্যাপারটা সোজা হয়ে যায়। তারপর

ওই লোকটাকে সামলাতে হবে—বজরং না কি নাম—সে বোধহয় মোটর সাইকেল ছুটিয়ে ছিপছররামারিতে গিয়ে বক্তৃতা করছে এতক্ষণ”

তাঁর এ অনুমান মোটেই মিথ্যা নয়।

“যাক গে। এখন ওঁকে ব্যাপারটা বলা দরকার। আমিই বলি। উনি কি বলেন শোনা যাক। তারপর দু'জনে মিলে উপায় বার করতে হবে একটা। করতেই হবে”

হঠাৎ যেন একটা প্রেরণা পেলেন সুরেশ্বরী দেবী। বিপদের সময় এই ধরণের প্রেরণা পান তিনি মাঝে মাঝে। সেবার যেমন হল। এক হাঁড়ি পোলাওয়ের তলা ধরে' গেল। সবাই যখন মহা চিন্তিত কি হবে—মান্য অতিথিরা খেতে বসেছেন—তখন সুরেশ্বরীই উপায় বার করলেন। বললেন—থাক, নেড়ো না, একটা হাঁড়িতে ঘি গরম মশলা চড়িয়ে দাও—আর পোলাওটা উপর উপর থেকে ঢেলে দাও তাতে। তাই করা হল। টের পর্যন্ত পেল না কেউ।

সুরেশ্বরী ‘ওঁকে’ বলতে গেলেন। ব্যাপারটা খুব সহজে হল না কিন্তু। দিগ্বিজয় ব্যাপারটা বুঝতে প্রথমত অনেক দেরি করলেন। বারম্বার সব গুলিয়ে যেতে লাগল তাঁর। তারপর অনেক কষ্টে যদি বুঝলেন, বিশ্বাস করতে চান না। সুরেশ্বরী যখন তাঁকে অবশেষে বোঝাতে সক্ষম হলেন যে অবিশ্বাস্য হলেও ব্যাপারটা সত্য, তখন সমস্ত দোষটা সুশোভনের ঘাড়ে চাপাবার চেষ্টা করে' অনেকক্ষণ সময় নষ্ট করলেন তিনি। কিন্তু সুরেশ্বরী যেই বললেন যে তাঁর মতে সান্ত্বনার দোষও কিছু কম নয় অমনি তিনি সায় দিয়ে বললেন, “হ্যাঁ, সান্ত্বনারই তো সব দোষ!”—তখন সুরেশ্বরীকে বাধ্য হয়ে আবার সুশোভনের দোষকীর্ত্তন করে' সান্ত্বনার অপরাধ লঘু করবার প্রয়াস পেতে হল। আধ ঘণ্টার মধ্যে অবস্থা এমন দাঁড়াল, যাকে খবরের কাগজের ভাষায় ‘সঙ্কটজনক পরিস্থিতি’ বলা যেতে পারে। সুরেশ্বরী প্রথম যা বলেছিলেন দিগ্বিজয় বদ্ধপরিকর হয়ে তাই সমর্থন করতে লাগলেন এবং সুরেশ্বরী নানাভাবে প্রমাণ করতে লাগলেন যে

দিগ্বিজয় প্রথমে যা বলেছিলেন তাই ঠিক, ভুল সুরেশ্বরীরই হয়েছিল। কেউ এক-ইঞ্চি হঠতে রাজি নন।

এ সমস্যা অমীমাংসিত রেখে সুরেশ্বরী তখন দ্বিতীয় প্রসঙ্গে মনোনিবেশ করলেন। ছকুবাবুর কৌতূহল কি করে' ভিন্নমুখী করা যায়। দিগ্বিজয় বললেন ছকুবাবুর কৌতূহল ভিন্নমুখী করতে হলে ওঁকে ভিন্ন স্থানে চালান করে' দেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। এ বাড়িতে রেখে ওঁকে সামলানো অসম্ভব। এর থেকে নূতন একটা প্রেরণার উদ্ভব হল। প্রেরণাটা আসলে দিগ্বিজয়ের মনেই প্রথমে উদ্ভূত হয়েছিল, কিন্তু দিগ্বিজয় কৌশলে কৃতিত্বটা সুরেশ্বরীর উপরই আরোপ করলেন। সুরেশ্বরীও মেনে নিলেন সেটা। কারণ এর সঙ্গে সামান্য একটু মিথ্যা জড়িত ছিল। স্বামীর নাম তার সঙ্গে জড়াতে ইচ্ছা হল না তাঁর এবং বুদ্ধি করে' সে কথাটা চেপে গেলেন তিনি। প্রকাশ করলে মুশকিল হ'ত। দিগ্বিজয় যদি ঘুণাক্ষরে টের পেতেন যে তাঁকে বাঁচাবার জন্যে সুরেশ্বরী নিজের ঘাড়ে এই মিথ্যা-দুষ্ট প্রেরণার কৃতিত্ব নিতে চাচ্ছেন তাহলে নিজেই দাবী করে' বসতেন সেটা। আর একটা সঙ্কটজনক পরিস্থিতির উদ্ভব হত।

রীতিমত একটা নাটকের অভিনয় করবার সুযোগ পেয়ে দিগ্বিজয় মনে মনে খুব উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন (যৌবনে তিনি সত্যিই ভাল অভিনেতা ছিলেন একজন) এবং এমন একটা অপ্রস্তুত-ভাব মুখে ফুটিয়ে বৈঠকখানায় প্রবেশ করলেন যার অকৃত্রিমতায় সন্দেহ করার ক্ষমতা ছকুবাবুর অন্তত ছিল না।

"ও মশায়, ভারী একটা মুশকিলে পড়ে গেছি"

"মুশকিল? কিস্ কিসিম্ কি?" ভ্রূযুগল উত্তোলন করে' প্রশ্ন করলেন ছকুবাবু।

"কি হল"—ক্ষুধার্ত্ত গোবর্দ্ধনবাবু বললেন। তাঁর ভয় হল জলযোগ ব্যাপারেই গোল-যোগ হল বুঝি বা।

"আমারই দোষ। ছি ছি, কি যে করা যায় এখন"

"আরে বাতাইয়ে না জনাব ক্যা হুয়া"

"আপনার হুইস্কি আনা হয় নি"

"অ্যাঁ—"

বাংলায় চীৎকার করে' উঠলেন ছকুবাবু। তারপর দম নিয়ে বললেন, "বলেন কি!"

"একদম ভুলে গেছি। আমার নিজের তো অভ্যাস নেই। অবশ্য বীরু সার কাছে লোক পাঠালে এখনও পেয়ে যাব"

"তবে আর দেরি করছেন কেন। ভেজিয়ে, জল্‌দ্ ভেজ দিজিয়ে"

"কাকে পাঠাই। মুশকিল সেইখানেই। আমি নিজেই যেতাম কিন্তু আমার গোটা দুই জরুরি চিঠি লিখতে হবে এক্ষুণি। সাড়ে পাঁচটায় ডাক বেরিয়ে যায়। চিঠি লিখে যেতে গেলে বীরু সা দোকান বন্ধ করে' চলে যাবে"

"বীরু সার দোকান কতদূর"

"তা মাইল ছয়েক। বগেন্দ্রপুর। গাড়িটা নিয়ে যেতে হবে, মানে বগিটা। মোটরে তেল আনতে গেছে। যোগেন সাধারণত করে এসব—কিন্তু সে বেরিয়ে গেছে পীরনগরের হাটে। কোচোয়ানটা বিয়ে করতে গেছে আজও ফিরল না। পরেশ ছাড়া বাড়িতে দ্বিতীয় চাকর নেই। তা ছাড়া পরেশ বগি হাঁকাতে পারে না"

"আরে আমি তো পারি"—বলে উঠলেন ছকুবাবু।

"না, না, আপনার শরীর খারাপ—আপনার যাওয়াটা কি ঠিক হবে"

"শরীর খারাপ! পোখমনবাবুর সঙ্গে যখন থাকতাম তখন ১০৪ জ্বর নিয়ে বুনো রাস্তা দিয়ে দশ মাইল বগি হাঁকিয়ে গেছি"

"তবু আপনার একলা যাওয়া ঠিক হবে না। তবে গোবর্দ্ধনবাবু যদি সঙ্গে যান। বগেন্দ্রপুরের রাস্তা চেনেনও উনি—"

"বেশ তো জলযোগ করে নি। যাব সঙ্গে—"

"তাহলে সমস্যাটার সমাধান হয়ে যাবে। ছকুবাবু নিজে গেলে বীরু বাজে জিনিস দিতে পারবে না"

এই কথায় ছকুবাবুর চোখে মুখে অবজ্ঞা ও ব্যঙ্গ মিশ্রিত এমন একটা হাসির আভা ছড়িয়ে পড়ল যার অর্থ বীরু তো ছেলে মানুষ বীরুর উর্দ্ধতন চতুর্দ্দশ পুরুষ যদি সমবেতভাবে চেষ্টা করেন তাহলেও ছকুবাবুকে বাজে জিনিস গছাতে পারবেন না।

মুখে তিনি বললেন—"আজকাল বাজারেই ভাল জিনিস নেই। সমস্ত আফ্রিকান মাল—"

"আপনার যেতে কষ্ট হবে না তো, দেখুন। আমারই উচিত ছিল আনিয়ে রাখা—ছি ছি—"

"আরে না, না,—কুচ ভি নেহি—ইয়ে তো মামুলি বাত হায়—"

"আপনার বাতটা বেড়েছে শুনলাম"

"বাত? না। লিভারটা গড়বড়িয়ে ছিল, কিন্তু এখন আর কিছু নেই। আর দেরি করবেন না। গোবর্দ্ধনবাবু তৈরি হন—"

"জলখাবারটা আসুক। জলযোগটা সেরেই বেরুই"

"আরে জলযোগ পরে করবেন মশাই। জলের অভাব কোনও দিন হবে না। নিন তৈরি হয়ে নিন। চটপট—"

জলখাবার এসে পড়ল।

দিগ্বিজয় বগির ব্যবস্থা করতে বেরিয়ে গেলেন।

---

(২২)

ধীর দৃঢ় পদক্ষেপে ব্রজেশ্বরবাবুও যখন 'হল'-ঘরে প্রবেশ করলেন তখন প্রমাদ গণতে হল সুশোভনকে। কি বলবে ভগবানই জানেন। সরে পড়ারও উপায় নেই কোনও। ব্রজেশ্বর 'হলে' ঢুকেই পকেট থেকে রুমাল বের করে' হেঁট হয়ে পায়ের গোছ আর জুতো থেকে ধূলো ঝাড়লেন। তারপর স্থিরদৃষ্টিতে

সুশোভনের দিকে চাইলেন তিনি। সুশোভনের দৃষ্টি অবশ্য স্থির ছিল না মোটেই। একটা জিনিস কিন্তু তার মনে হল। ভদ্রলোকের ভাবভঙ্গী বেশ ভদ্রই, শত্রুতার কোন আভাস তো পাওয়া যাচ্ছে না। দৃষ্টি থেকে যা বিকীর্ণ হচ্ছে তা বেশ ভদ্র। বিস্মিত হল।

"মশায়ের নামটি কি জানতে পারি"—আচমকা যদিও প্রশ্নটা করলেন তিনি, কিন্তু শান্তভাবে।

যথাসম্ভব সাহস সংগ্রহ করে' মুখে একটু হাসি ফুটিয়ে সপ্রতিভ হবার চেষ্টা করলে সুশোভন, তারপর জবাব দিলে, "কেন বলুন তো"

"যতদূর মনে হচ্ছে আপনি আমার স্ত্রীর বন্ধু একজন। কৌতূহলটা সুতরাং অহেতুক নয় নিতান্ত"

"আমার নাম সুশোভন নন্দী"

"ও, নমস্কার"

সুশোভন এটা প্রত্যাশা করে নি। প্রতি-নমস্কার করলে সে।

"আমার স্ত্রীর সঙ্গে কতদিন থেকে আলাপ আপনার। অনেক দিনের, নয় ?"

হ্যাঁ, তা হবে বই কি"

"আমার পরিচয় দেবার প্রয়োজন নেই, আশা করি"

"না। আপনার নাম তো আপনার বাক্সেই লেখা রয়েছে"

"ও, ওটা আমারই বাক্স তাহলে"

ব্রজেশ্বরবাবুর বাম ভ্রূটা ঈষৎ নড়ে উঠল উপরের দিকে।

"ওটা আপনার বাক্স নয় ?"

"কি জানি ! হয় তো ওটাও আপনি দাবী করে' বসবেন এখনি স্বচ্ছন্দে"

পুনরায় উর্দ্ধোৎক্ষিপ্ত হল বাম ভ্রূ।

কাছে-পিঠে অপ্রত্যাশিত গন্ধ ছাড়লে আমরা যেমনভাবে নাক কোঁচকাই, সুশোভন তেমনি করলে দু'একবার ! কোনও জবাব দিলে না।

ব্রজেশ্বরবাবু বললেন, "দেখুন, গত চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে এমন একটা কাণ্ড হয়ে গেছে যার কোনও কারণ খুঁজে পাচ্ছি না আমি। আপনি হয়তো কিঞ্চিৎ আলোকপাত করতে পারবেন। মনে হচ্ছে—আমার স্ত্রী কাল তাঁর গন্তব্য স্থানে পৌঁছতে পারেন নি এবং এখানে কাল রাতটা কাটিয়ে গেছেন। আপনিও ছিলেন না কি তাঁর সঙ্গে?"

"থাকবার বাধাটা কি"—হঠাৎ বেখাপ্পা এবং ঈষৎ অভদ্র জবাবটা বেরিয়ে পড়ল স্থশোভনের মুখ থেকে।

"ছিলেন তাহলে?"

"ছিলাম"

"ছিলেন। কেন?"

"থাকবার বাধাটা কি"—আবার বললে স্থশোভন। ব্রজেশ্বরের ভ্রূটা আবার নড়ে উঠল উপরের দিকে।

"বাধা কোনও নেই জানি। আমার প্রশ্নটা সে সম্পর্কে নয়। আমি শুধু জানতে চাইছি আমার স্ত্রী এবং আপনি কি করে' এই হোটেলে এসে পড়লেন একসঙ্গে"

"কারণ আমরা দুজনে একসঙ্গে একই ট্রেন ফেল করেছিলাম"

"ও, তাই বুঝি? তারপর"

"আমরা দুজ'নে ট্রেন ফেল করলাম। কিন্তু আমার স্ত্রী করল না"

"আপনার স্ত্রী"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, আমার স্ত্রী। আমারও স্ত্রী আছে"

"ও"

এই 'ও'টার মধ্যে স্থশোভন একটা প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গের স্বর শুনতে পেলে যেন। চটে গেল তৎক্ষণাৎ।

"আজ্ঞে হ্যাঁ, আমারও স্ত্রী আছে একটি, নেহাৎ খারাপও নয়। আশা করি আমার স্ত্রী থাকায় আপত্তি নেই আপনার"

"মোটেই না। কিন্তু ঘটনাটা কি শুনি! আপনার স্ত্রী ট্রেন ফেল করেন নি, কিন্তু আপনি করেছিলেন। আমার স্ত্রীও করেছিলেন"

"হ্যাঁ। আমরা সবাই দিগ্বিজয় সিংহরায়ের নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যাচ্ছিলাম। আমি ট্রেন ফেল করে' একটা ট্যাক্সি ভাড়া করলাম, আপনার স্ত্রীও আসতে চাইলেন আমার সঙ্গে। এখান থেকে মাইল দুই দূরে ট্যাক্সিটা বিগড়ে গেল। তখন কি আর করি—খবর পেলুম এখানে এই হোটেলটা আছে—দুজনে এসে আশ্রয় নিলাম এখানে। মোটামুটি এই হল ব্যাপার। আর কিছু জানতে চান কি"

"বেশী কিছু না। এইটেই যদি আর একটু বিশদ করে' বলেন বাধিত হব"

ব্রজেশ্বর ভ্রূ কুঞ্চিত করে' নিজের লাঠিটার দিকে চেয়ে রইলেন। সুশোভনের মনে হল লাঠির গাঁটের মতো লোকটির ভ্রূতেও গাঁট পড়ে গেল যেন। বিশদ-ভাবে শুনতে চায় সব! মানে? সুশোভনের বুকের ভিতরটা কেমন যেন জ্বালা করতে লাগল। আচ্ছা কাঠখোট্টা বেরসিক লোক তো! বিশদ করে' বলা যায় না কি সব! সান্ত্বনার মতো মেয়ে কি করে' এই নীরস লোকটাকে পছন্দ করে' বিয়ে করেছে! আশ্চর্য্য।

"আপনি নিজে যখন বিবাহিত"—ব্রজেশ্বর বললেন ধীরে ধীরে—"তখন আমার মনোভাব নিশ্চয়ই আপনি বুঝতে পারছেন। এই অপ্রত্যাশিত দুর্ঘটনার ফলে আমার স্ত্রীর কোনও অসুবিধা হয়েছিল কি না তা জানতে চাওয়াতে আশা করি আপনি রাগ করছেন না। এখানে তো দেখছি স্থানাভাব খুবই। আপনাদের শোওয়ার খাওয়ার কষ্ট হয় নি তো"

"সে আমরা ব্যবস্থা করে' নিয়েছিলাম একরকম করে'"—সুশোভন যতটা সম্ভব ভদ্রভাবে বলল।

"ব্যবস্থা করে' নিয়েছিলেন? নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। এখানে ঘর তো মোটে নেই দেখছি। একটিমাত্র স্পেয়ার রুম, শোবার যায়গাও পেয়েছিলেন?"

"হ্যাঁ"—ব্যাপারটা যেন কিছুই নয়, এমনই একটি ভাব দেখিয়ে সুশোভন এগিয়ে গেল জানলার দিকে।

"পেয়েছিলেন? আপনাকে তাহলে গোঁসাইজির সঙ্গে শুতে হয়েছে বলুন। কারণ দ্বিতীয় ঘরটিতে তো একটি অসুস্থ মহিলা রয়েছেন। তৃতীয় ঘর তো আর চোখে পড়ল না। তাহলে আপনি—"

প্রত্যুত্তরে সুশোভন বোঁ করে' ঘুরে এমন কয়েকটা কথা বলে' ফেললে যা অনুত্তেজিত অবস্থায় সে বলতো না হয় তো।

"বিশ্বাস করুন মশাই, কোনও রকম নোংরামির মধ্যে ঢুকি নি আমরা। সান্ত্বনা দেবীর মতো সতীলক্ষ্মী স্ত্রীকে আপনার যদি সন্দেহ হয়, তাহলে এ-ও আমি বলব যে আপনি ওরকম স্ত্রীর যোগ্য নন"

ব্রজেশ্বরের মুখভাবে কোনও রকম উষ্মার লক্ষণ দেখা গেল না। তাঁর শান্ত চোখ দুটি একটু প্রদীপ্ত হয়ে উঠল শুধু। মনে হল ক্ষণিকের জন্য যেন তিনি ঈষৎ অসংযত হলেন যখন এগিয়ে গিয়ে সুশোভনের কাঁধে হাত রেখে বললেন, "চটবেন না—"

"কোনও রকম নোংরামি ছিল না, বিশ্বাস করুন"

"নোংরামির কথা বারবার বলছেন কেন। ও কথা তো আমি একবারও ভাবি নি। আমার স্ত্রীকে আমি চিনি ভাল করে'"

সুশোভন ক্ষণকাল হাঁ করে' চেয়ে রইল একথা শুনে।

"ভালোভাবে চেনেনই যদি, তাহলে আর এত জেরা করবার মানেটা কি!"

"তাহলে আর এত সব খোঁজ নেওয়ার প্রয়োজনটা কি বলুন"—না বলে' পারলে না সে।

"ব্যাপারটা কি ঘটেছে জানতে চাই। সব খুলে বলুন দিকি"

"খুলে বলবার তো কিছু নেই। আপনি অনর্থক এরকম একটা গোয়েন্দা-গোয়েন্দা ভাব নিয়েছেন কেন বুঝতে পারছি না। এরকম ঠেস দিয়ে দিয়ে কথা বলবারই বা মানে কি। আপনার স্ত্রীর যাতে কোনওরকম কষ্ট বা অসুবিধা

না হয় আমি তার জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। প্যাঁচেও পড়েছি তার জন্যে, বেশ কিছু ঘোল খেয়েছি, খাচ্ছি এবং আরও কিছু খেতে হবে সম্ভবত। আর এতক্ষণ পরে আপনি এসে অনুসন্ধান করছেন! আপনি কি মনে করেন যে সুবোধ বালকেরা যেমন দাঁড়িয়ে স্কুলে গড়গড় করে' পড়া বলে' যায় তেমনি করে' আমি কালকে রাত্রে যা যা ঘটেছে তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা করে' যাব? তা করলে সান্ত্বনার প্রতি একটু অবিচার করা হবে না কি?"

মাথাটি ঈষৎ ঝুঁকিয়ে ব্রজেশ্বর বললেন, "মানছি—আপনার কথা। যতটুকু খোঁজ করেছি তাতে বুঝেছি যে শোওয়ার ব্যাপার নিয়ে বিপদে পড়েছিলেন আপনারা। হয় তো আমার অজ্ঞাতসারে এমন দু' একটা কথা আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়েছে যা আপনার 'ঠেস' বলে' মনে হচ্ছে, মাপ করবেন সে জন্যে। আপনার অবস্থাটা বুঝতে পারছি আমি, আপনিও আমার অবস্থাটা বুঝুন। কি হয়েছিল বলুন দেখি সব খুলে"

উত্তরে সুশোভন অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জনীর মধ্যে নাকের ডগাটা ধরে' কচলালে একটু। তারপর ঢোঁক গিলে বললে, "বললে আপনি বিশ্বাস করবেন কি"

"খুব যদি অবিশ্বাস্য হয়"—গম্ভীর কণ্ঠে বললেন ব্রজেশ্বর—"তাহলে স্ত্রীর মুখ থেকে সমস্ত না শোনা পর্যন্ত খুব সম্ভব বিশ্বাস করতে পারব না। তবু শুনিই না, শুনতে তো ক্ষতি নেই"

"ছাড়বেন না যখন শুনুন"—আবার নাকটা চুলকুলে সুশোভন—"কিন্তু আগেই বলে রাখছি বিশ্বাস হবে না। মনে হবে বানিয়ে বলছি"

"বলুনই তো"

দু'জনে বসলেন দুটো চেয়ারে।

"কিন্তু দেখুন, বলবার আগে, মানে আমি আবার জিগ্যেস করতে চাই আপনাকে—সান্ত্বনার, মানে আপনার স্ত্রীর সম্বন্ধে যে মনোভাব আপনি এইমাত্র প্রকাশ করলেন, অর্থাৎ তাকে ভালোভাবেই চেনেন আপনি, সেটা ঠিক তো,

মানে তার চরিত্রের সম্বন্ধে আপনার কিছুমাত্র সন্দেহ যদি হ'য়ে থাকে তাহলে মশাই আমি—কারণ—"

"দেখুন অনেক বিষয়েই হয় তো আপনার সঙ্গে আমার মতের গরমিল হবে। ধরুন যেমন, শোওয়ার ব্যাপারটা সম্বন্ধে, যতদূর বুঝতে পারছি, আপনার ব্যবস্থাটা হয় তো স্ববুদ্ধিসঙ্গত মনে হবে না আমার। কিন্তু যে বিষয়ে সামান্যতম মতদ্বৈধ হবার সম্ভাবনা নেই তা নিয়ে আপনি অত মাথা ঘামাচ্ছেন কেন। আপনি যদি বারম্বার বলেন যে আমি আমার স্ত্রীর চরিত্র সম্বন্ধে সন্দিহান, তা হলেই বরং আপনার সঙ্গে ঝগড়া হয়ে যেতে পারে আমার। আমি যখন বলেছি যে আমি আমার স্ত্রীকে ভালোভাবে চিনি তখন তাই কি যথেষ্ট নয়"

"বেশ, বলছি তবে সব। দেখুন, 'লোকতঃ ধর্ম্মতঃ' বলে' যে কথাটা আছে তার ধর্ম্মতঃ অংশটুকু ঠিক আছে, লোকতঃ অংশটুকু হয় তো নেই। ওটুকু বাঁচাতে গিয়ে যথেষ্ট দুর্ভোগ ভুগতে হয়েছে, তবু হয় তো বাঁচাতে পারি নি, তা আগে থাকতেই বলে দিচ্ছি। এতে যদি আপনি চটে ওঠেন তাহলে—"

"আহা, আপনি স্থরুই করুন না—"

স্থরু করাটাই শক্ত মনে হতে লাগল স্থশোভনের। তবে ব্রজেশ্বরবাবুর কথাবার্ত্তা থেকে মনে বল পেয়েছিল সে। ভদ্রলোক শত্রুভাবাপন্ন নন মোটেই। তবু কাহিনীর যে অংশটুকু ঈষৎ 'ইয়ে'-গোছের সেখানটায় সে বারম্বার হোঁচট খেতে লাগল। ব্রজেশ্বর গম্ভীরভাবে শুনে যেত লাগলেন। মুখের একটি পেশীও বিকম্পিত হল না তাঁর। স্থশোভন গোপনও করলে না কিছু, একাধিক স্থানে হোঁচট খেতে হল যদিও, তবু গোড়া থেকে সমস্ত ব্যাপারটার বিশদ বর্ণনা করে গেল সে। ব্রজেশ্বর দেওয়ালের দিকে চেয়ে নির্ব্বিকারভাবে শুনলেন সব।

সমস্ত বলবার পর স্থশোভন হাত উলটে বললে, "এই হয়েছে। বিরাট জগাখিচুড়ি পাকিয়ে গেছে একটা। এর জন্যে আপনি আমাকেই যদি দায়ী করতে চান—চাইবেন নিশ্চয়ই—তাহলে তাই করুন"

ব্রজেশ্বরবাবুর চোখ দেওয়ালেই নিবদ্ধ হয়ে রইল। কেবল বিস্ফারিত হল ঈষৎ।

একটু থেমে তিনি বললেন, "হ্যাঁ। দায়ী আপনাকেই আমি করব। কিন্তু জগাখিচুড়ির চেয়ে ঢের বেশী গুরুতর জটিলতার সৃষ্টি করেছেন আপনি। উপযুক্ত কথা খুঁজে পাচ্ছি না"

"খুবই দুঃখিত আমি, সত্যি বলছি"—এ ছাড়া আর অন্য কোনও কথা জোগাল না সুশোভনের মুখে।

"দেখুন, আমার পরিবার, মানে সান্ত্বনাদেবী"—ব্রজেশ্বর ধীরে ধীরে চেয়ারে ঠেস দিয়ে বসলেন এবং এতক্ষণ পরে সুশোভনের দিকে চাইলেন—"অত্যন্ত সহৃদয় মহিলা। চলতি বাংলায় যাকে 'বুঝদার' বলে। তার জন্যে কারও কোনও কষ্ট বা অসুবিধা হচ্ছে এ সে কিছুতেই সহ্য করতে পারে না। কিন্তু তার এই কোমলতার সুযোগ নেওয়াটা আপনার উচিত হয় নি"

"আমি নিই নি তো"

"নিয়েছেন বৈ কি। যাক্, আমরা দু'জনে এখনই মুচুকুন্দ-কুণ্ডলেশ্বরী যাচ্ছি, সান্ত্বনার সঙ্গে দেখা হলে একথা তাকে বলবেন না যেন। তার এই সদয় সহানুভূতিপূর্ণ ব্যবহারে যে আমি আপত্তি করেছি এ কথা যেন সে না শোনে"

"আরে, গ্র্যাণ্ড লোক তো"—হঠাৎ বেরিয়ে পড়ল সুশোভনের মুখ থেকে। তারপর সামলে নিয়ে বললে, "সত্যি, চমৎকার লোক আপনি মশাই। সাধারণত, এরকমটা চোখে পড়ে না। বাঃ, গ্র্যাণ্ড"

সুশোভনের ভীতু-ভাবটা কেটে গেল।

"আমি ভাল লোক কিনা জানি না, তবে আমি যুক্তিকে অনুসরণ করতে ভালবাসি। যুক্তিকে অনুসরণ করতে ভালবাসি বলেই একটা অনুরোধ আপনাকে করছি, আশা করি তা আপনি প্রত্যাখ্যান করবেন না"

"নিশ্চয় না। কি বলুন"

"আপনি চলুন আমার সঙ্গে মুচুকুন্দ-কুণ্ডলেশ্বরীতে। আর একটা কথাও বলছি, ক্ষমা করবেন, আপনি এতক্ষণ যা বললেন তা এমনই অদ্ভুত যে আমার স্ত্রীর মুখ থেকে তার সমর্থন না পাওয়া পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে পারছি না"

হঠাৎ ব্রজেশ্বরবাবুর মুখভাব ঈষৎ কঠিন হয়ে উঠল।

"বেশ তো"—সুশোভন হেসে উত্তর দিলে বটে, কিন্তু তার হাসিটা কাষ্ঠ-হাসির মতো দেখালো—"বেশ, চলুন যাই আপনার সঙ্গে"

"দেখুন সুশোভনবাবু, আপনি যা বললেন তার সঙ্গে সান্ত্বনাদেবীর বর্ণনা যদি না মেলে অর্থাৎ আমি যদি বুঝতে পারি যে আপনি জোর করে' তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তার সহৃদয়তার সুযোগ নেবার চেষ্টা করেছেন, তাহলে হয়তো হঠাৎ আমি মধ্যযুগীয় হয়ে পড়ব অর্থাৎ আপনাকে নাগালের মধ্যে পেলে খুশী হব"

"ভয় নেই পালাব না আমি, কারণ একটি কথাও আমি গোপন করি নি"

"ধন্যবাদ। এ ব্যবস্থায় আপনার আপত্তি নেই জেনে সুখী হলাম"

"কিছু আপত্তি নেই। কিন্তু একটা কথা আছে। আমার স্ত্রী এবং শ্বশুর-বাড়ীর লোকদের সঙ্গে দেখা না হওয়া পর্য্যন্ত এখানে অপেক্ষা করতে হবে আমাকে। আপনার যদি আপত্তি না থাকে আমার স্ত্রীকেও আমি তুলে নিতে পারি আমাদের সঙ্গে। আমার স্ত্রী হয় তো বেঁকে দাঁড়াবে প্রথমটা, যেতে চাইবে না, কারণ আমার শাশুড়ী ঠাকরুণ নানা কথা বলে' এতক্ষণ তাকে হয় তো এমন করে' তুলেছেন যে"—

"আপনার শাশুড়ী ঠাকরুণ কি সব ঘটনা জানেন?"

"এখনও জানেন না। কিন্তু জেনে ফেলবেন"

"আমার মনে হয় যতক্ষণ না আপনি আপনার স্ত্রীর সঙ্গে একা দেখা করছেন ততক্ষণ তাঁকে, মানে আপনার শাশুড়ী ঠাকরুণকে, ব্যাপারটা পুরোপুরি জানতে না দেওয়াই ভালো"

"তাতো বুঝছি। কিন্তু ঠেকাব কি করে'"

"বলছি। আমি একজনের কাছ থেকে খবর পেয়ে তবে এখানে এসেছি, তা না হলে তো আমি এখানে আসতামই না। এখন বুঝতে পারছি তিনি অপর কেউ নন, তিনি আপনাদের বন্ধু সদারঙ্গবিহারীলাল"

"ও, সেই বাক্যবাগীশ লোকটা—

"আপনার স্ত্রী এবং শাশুড়ীর সঙ্গেও তাঁর দেখা হয়ে যাওয়া অসম্ভব নয়। তা যদি হয়ে থাকে তাঁরা হয় তো নানা রকম সন্দেহ করছেন আপনার সম্বন্ধে। আমাদের ধরে' নেওয়াই বোধ হয় ভালো—যে তাঁরা শুনেছেন সব এবং তদনুসারে চলা উচিত"

"কি করে' ?"

"মানে, সত্যকে যদি একটু—"

"তাতে আমার আপত্তি নেই। শাশুড়ীকে ভাঁওতা দেবার জন্যে অনর্গল মিছে কথা বলতে রাজি আছি আমি। কিন্তু তাঁকে আপনি চেনেন না। একটি 'চীজ' যাকে বলে। সহজে তাঁকে বাগানো যাবে বলে' মনে হয় না। অথচ সত্যি কথাও বলা যাবে না, তাতে ভয়ানক বিপদ। আপনি যেমন ভদ্রভাবে ব্যাপারটা নিলেন, উনি তেমনভাবে নেবেনই না। আমি অবশ্য আপনাকে আমার জন্যে মিছে কথা বলতে অনুরোধ করতে পারি না, নিশ্চয়ই নয়, কিন্তু মানে—"

ব্রজেশ্বরবাবু তড়াক করে' উঠে দাঁড়ালেন চেয়ার ছেড়ে। তড়াক করে' ওঠাটা ব্রজেশ্বরবাবুর মতো লোকের পক্ষে বেমানান একটু। মনে হল কোন প্রয়োজনীয় ব্যাপার যেন ভুলে গিয়েছিলেন হঠাৎ মনে পড়ে গেল। তাঁর মুখের ভাবও বদলে গেল। কণ্ঠস্বরে নূতন সুর বাজল একটা।

"দেখুন সুশোভনবাবু, অত্যন্ত ভীত হয়ে আমি এই হোটেলে ছুটে এসেছিলাম। মনে হয়েছিল আবার বুঝি নূতন আর একটা বিপদ ঘনিয়ে এল। সান্ত্বনার সুনামের চেয়ে প্রিয়তর আমার আর কিছু নেই। সে সুনাম ইতিপূর্ব্বে একবার বিপন্ন হয়েছিল। আপনাকে অবশ্য ধন্যবাদ দেওয়ার বিশেষ কিছু নেই, যদিও আপনি আপনার দিক দিয়ে সে সুনাম রক্ষা করবার যথেষ্ট চেষ্টা করেছেন।

অবলম্বন করতে আমি পশ্চাৎপদ হব না—তা সে 'সু' 'কু' যাই হোক—"

"বাঃ, চমৎকার! আমি যে জটটা পাকিয়ে ফেলেছি, বিশ্বাস করুন, তার জন্যে অত্যন্ত দুঃখিত আমি। কিন্তু এ-ও বিশ্বাস করুন সে জট ছাড়াতে প্রাণপণে সাহায্যও আমি করব আপনাকে"

ব্রজেশ্বরবাবু কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হয়েছিলেন। তিনি বললেন, "বেশ, আপনি তাহলে আপনার স্ত্রীকে বুঝিয়ে আমাদের সঙ্গে নিয়ে যাবার চেষ্টা করবেন। তাঁর সঙ্গে কে কে থাকবেন আশা করেন"

"শাশুড়ী তো থাকবেনই, শ্বশুরও হয়তো আছেন। শ্বশুর মশাই লোক ভালো, তিনি কোনও গোলমাল করবেন না, কিন্তু শাশুড়ীকে সামলানোই মুস্কিল।"

"তাঁকে আমি সামলাব"

"ও তাহলে তো বেঁচে যাই। টেলিফোনে আমি যা শুনলাম তাতে তো তাঁদের এতক্ষণ এখানে এসে পড়া উচিত ছিল। কি ভাবে 'প্রসিড্' করব তা আগে থাকতে একটু ঠিক করে' নিলে হত না?"

ব্রজেশ্বরবাবু সম্পূর্ণরূপে প্রকৃতিস্থ হয়েছিলেন।

গম্ভীরভাবে তিনি বললেন, "একটু চায়ের চেষ্টা করা যাক আগে"

"ঠিক বলেছেন"

(২৩)

"এই সেই জায়গা"—স্বয়ম্প্রভা চেঁচিয়ে উঠলেন এবং ড্রাইভারের মনোযোগ আকর্ষণ করবার জন্যে নিজের বেঁটে ছাতার বাঁট দিয়ে মোটরের জানলার কাচে আঘাত করতে লাগলেন।

"থামাও, থামাও গাড়ি, এই ড্রাইভার, শুনতে পাচ্ছে না, না কি। থামতে বল ওকে, ঘুমুচ্ছ না কি তুমি—"

জিতুবাবু ঢুলছিলেন। চমকে উঠে অপ্রস্তুত মুখে বললেন, "কতদূর এলাম আমরা, ঢুল ধরেছিল একটু"

"ফৎমোরংপুর। নাব"—বেশ ঝেঁঝে জবাব দিলেন স্বয়ম্প্রভা।

জিতুবাবু অবিশ্বাসভরে ড্রাইভারের দিকে চাইলেন।

"আমরা এসে গেলাম নাকি"

ড্রাইভারও ঠিক করতে পারছিল না কিছু। হোটেলের মতো কি একটা সে এই মাত্র অতিক্রম করে' এল। পিছন দিকে ঘাড় বেঁকিয়ে সেই দিকেই চাইতে লাগল সে।

জিতুবাবু আবার জিগ্যেস করলেন, "আমরা এসে গেলাম নাকি"

"তাই তো মনে হচ্ছে"

"বেশ দূর আছে তো। সেই কখন চড়েছি—"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, দূর আছে বই কি। যতটা আন্দাজ করেছিলাম তার চেয়েও দূর"

"বাংলা দেশ পার হয়ে এলাম না কি"

"আজ্ঞে প্রায় তাই বটে। রাস্তাও দারুণ খারাপ"

"কি কাণ্ড"—অস্ফুট কণ্ঠে বললেন জিতুবাবু।

"তুমি নাববে কিনা"—ধমকে উঠলেন স্বয়ম্প্রভা এবং অগ্নিবর্ষী দৃষ্টিতে চাইলেন ভর্ত্তার দিকে।

"নাবব, কিন্তু একটু সবুর কর। ড্রাইভার গাড়ি ব্যাক করবে এখুনি। ওহে, গাড়িটা ব্যাক করে' ওই হোটেলটার সামনে নিয়ে চল। নাবছি, একটু সবুর কর না। গাড়ি ব্যাক করার সময় নাবতে গিয়ে একজনের পা ভেঙে গিয়েছিল আমি জানি।"

"তা তো জানবেই। যত সব উজবুক গাড়োলের খবরই তো রাখ তুমি"

স্বয়ম্প্রভার চোখের দৃষ্টি থেকে আর এক ঝলক আগুন নির্গত হল।

"দেখে দেখো"—জিতুবাবু ড্রাইভারকে বললেন—"আর একখানা মোটর রয়েছে। ধাক্কা মেরো না যেন"

ড্রাইভার নানা রকম কৌশল করে' অবশেষে গাড়িটা ব্রজেশ্বরবাবুর মোটরের পিছনে এনে লাগালে। স্বয়ম্প্রভা অবতরণ করলেন এবং নাক কুঁচকে এমনভাবে নিশ্বাস টানতে লাগলেন যেন তাঁকে আস্তাকুড়ের মাঝখানে নাবিয়ে দেওয়া হয়েছে। অনীতাও নাবল। জিতুবাবু ড্রাইভারকে কি যেন বলছিলেন। বলতে বলতে ভীতভাবে একবার স্ত্রীর দিকে চাইলেন। ব্যাপারটা বুঝতে স্বয়ম্প্রভার দেরী হ'ল না।

"কি ? থাকতে চাইছে না ও ? আচ্ছা, আমি ওর সঙ্গে কথা কইছি। গাড়ি থেকে ব্যাগটা নাবিয়ে নাও, আর তুমি দয়া করে' সরে' থাক একটু"

দৃঢ় পদবিক্ষেপে স্বয়ম্প্রভা এগিয়ে গেলেন মোটরের দিকে এবং সম্মুখ সমরে আহ্বান করলেন ড্রাইভারকে।

জিতুবাবু সরে' এসে ঘাড় উঁচু করে' হোটেলের সাইনবোর্ডটা পর্য্যবেক্ষণ করতে লাগলেন। অনীতা হোটেলের কপাটটা খোলা দেখে ঢুকে পড়ল ভিতরে। ভিতরে বাঁহাতি একটা ঘর, তার কপাটটাও খোলা। ঘরে ঢুকেই কিন্তু চেঁচিয়ে উঠল সে, পিছন থেকে কে যেন জড়িয়ে ধরল তাকে। ঘাড় ফিরিয়ে, দেখে সুশোভন।

"তুমি ! ওঃ—" সুশোভনের ঘাড়ে মাথা রেখে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল সে।

"বস, বস, লক্ষ্মীটি—এই চেয়ারটায় বস। ক্লান্ত হয়ে পড়েছ নিশ্চয়ই, যা রাস্তা। একটু জিরিয়ে নাও আগে, তারপর সব বলছি। চা আনাব ?"

"না, তুমি বস। কোথাও যেও না তুমি"

"ও, আচ্ছা—"

পিছনের দিকের কপাটটি সন্তর্পণে ঠেলে দীর্ঘাকৃতি ব্রজেশ্বরবাবু ঢুকলেন। ঢুকেই বেরিয়ে গেলেন।

"উনি কে"—চোখ বড় বড় করে' জিগ্যেস করলে অনীতা।

"ব্রজেশ্বরবাবু। আমাদের বন্ধু একজন। উনিও প্যাঁচে পড়েছেন। ওঁর স্ত্রীই তো ষ্টেশনে কলার খোলায় পা পিছলে পড়ে যান এবং তাঁকে তুলতে গিয়েই তো ট্রেনটা ছেড়ে গেল। ছি, ছি, কি কাণ্ড"—একটু থেমে—"রাগ করেছ তো খুব?—"

অনীতার রাগ আর ছিল না। মুখে বরং হাসি ফুটেছিল। যে স্ত্রীলোকটির সঙ্গে সুশোভনকে জড়িয়ে কত কথাই না সে ভাবছিল তার স্বামীর সঙ্গে সুশোভনের বন্ধুত্বও যখন অক্ষুণ্ণ আছে তখন ভাববার কিছু নেই।

পিছনের দরজায় দু' তিনটি টোকা শোনা গেল। সুশোভন উঠে গেল এবং দরজা খুলে বললে, "আসুন না আপনি ভিতরে, অনীতার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই"

"না, আমি জিগ্যেস করতে এসেছি, চা আনাব কি?"

"সে সব পরে হবে এখন ভিতরে আসুন"

ব্রজেশ্বরবাবু ভিতরে এলেন। অনীতা দাঁড়িয়ে উঠল। নমস্কার বিনিময় হল। কি বলবেন ভেবে না পেয়ে স্মিতমুখে দাঁড়িয়ে রইলেন ব্রজেশ্বরবাবু। বাম ভ্রূটা ঈষৎ লাফিয়ে উঠল একবার।

"ও! তুমি এখনও এখানে আছ"

স্বয়ম্প্রভা দ্বারপ্রান্তে আবির্ভূত হয়েছিলেন এবং বরবপু দিয়ে সমগ্র দ্বার-পথটা প্রায় অবরুদ্ধ ক'রে পরিস্থিতিটা হৃদয়ঙ্গম করবার চেষ্টা করছিলেন। মনে হচ্ছিল হাতে একটা বায়নাকুলার থাকলে আরও যেন মানাত। তাঁর গাম্ভীর্য্য কিন্তু অটুট রইল না, মনে হল পিছন থেকে কেউ ঠেলছে তাঁকে।

সুশোভন এগিয়ে এল তাড়াতাড়ি।

"হ্যাঁ। আপনারা আসছেন খবর পেয়ে ফিরে এলাম আবার এখানে। আপনারা এসে পড়েছেন খুব ভাল হয়েছে, এমন আনন্দ হচ্ছে আমার। আসুন পরিচয় করিয়ে দিই। ইনিই অধ্যাপক ব্রজেশ্বরবাবু—আমার একজন বন্ধু—"

স্বয়ম্প্রভা দু'পা এগিয়ে এলেন এবং গম্ভীরভাবে দায়-সারা-গোছ নমস্কার করলেন একটা।

"বাবা কোথায় গেলেন, তাঁর সঙ্গেও পরিচয় করিয়ে দি এঁর"

"ভিতরে এস না তুমি, বাইরে কি করছ"—আদেশ করলেন স্বয়ম্প্রভা।

"ঢুকতেই পারছি না যে। সর একটু"

স্বয়ম্প্রভা পথ করে' দিতে জিতুবাবু ভিতরে প্রবেশ করলেন।

"কপাট বন্ধ করে' দাও"

"দিচ্ছি দিচ্ছি"

স্বয়ম্প্রভা ব্রজেশ্বরবাবুর দিকে ফিরে বললেন—"ইনি আমার স্বামী"

ব্রজেশ্বরবাবু নমস্কার করলেন।

সুশোভন অনীতার পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল।

"গোড়াতেই একটা কথা জানিয়ে দেওয়া দরকার"—সুশোভন বললে—"যে মহিলাটির সঙ্গে হাওড়া ষ্টেশনে আমার দেখা হয়েছিল এবং যাঁর জন্যে শেষ পর্য্যন্ত আমাকে ট্রেন ফেল করতে হল তিনি এই ভদ্রলোকটির স্ত্রী"

এই সংবাদে স্বয়ম্প্রভা একটু মুষড়ে পড়লেন যেন। কি ভাষায় সুশোভনকে তিনি আক্রমণ করবেন তা এতক্ষণ মনে মনে ভাঁজছিলেন। অনেকগুলি তীরই সুশাণিত করে' রেখেছিলেন তিনি, কিন্তু এই কথা শুনে সব যেন গুলিয়ে গেল তাঁর।

"সুশোভনবাবুর স্ত্রী যে কত অসুবিধায় পড়েছিলেন তা আমি শুনেছি। এ জন্য আমি অত্যন্ত দুঃখিত এবং লজ্জিত"—এই কথাগুলি উচ্চারিত হল ব্রজেশ্বরবাবুর মুখ থেকে। আড়চোখে একবার অনীতার দিকে চেয়ে একটু থেমে এবং ঈষৎ হেসে আবার বললেন তিনি—"আমার দিক দিয়ে অবশ্য খুবই সুবিধা হয়ে গিয়েছিল, উনি সান্ত্বনাকে মোটর করে' নিয়ে এসেছিলেন। সুশোভনবাবু ট্রেন ফেল করে' একটা ট্যাক্সি ভাড়া করেছিলেন—সময় মতো যাতে গিয়ে

পড়তে পারেন, মিসেস নন্দী যাতে অপরিচিত স্থানে গিয়ে অসুবিধায় না পড়েন। আমি পরে আর একটা মোটরে এঁদের অনুসরণ করি”

সুশোভন সবিস্ময়ে চেয়েছিল। এই মার্জ্জিত মিথ্যকটি শুদ্ধ সংক্ষিপ্ত ভাষায় ব্যাপারটাকে বেশ গুছিয়ে এনেছেন তো। অনীতার চোখ মুখ দিয়েও আনন্দের আভা ফুটে বেরুচ্ছিল। জিতুবাবুও অস্ফুট ভাঙা-ভাঙা জোড়া-তালি লাগানো বাক্যাবলীর দ্বারা নিজের সন্তোষ প্রকাশ করছিলেন। স্বয়ম্প্রভা বাম হস্ত উত্তোলন করে' নীরব করে' দিলেন তাঁকে এবং ফোঁস করে' নিশ্বাস টেনে নিলেন সজোরে।

“ও। কিন্তু একটা কথা আমার মাথায় ঢুকছে না। আপনার স্ত্রী আপনার সঙ্গে এলেন না কেন। তিনি তো অপেক্ষা করতে পারতেন একটু”

“নিশ্চয় পারতেন। অপেক্ষা করতে চাইছিলেনও, কিন্তু আমারই আসার ঠিক ছিল না যে। এসেম্ব্লীর ব্যাপারে আমাদের কংগ্রেসের পার্টি মিটিং হবার কথা ছিল একটা, যদিও শেষ পর্য্যন্ত হল না সেটা”

“আপনিই কি বিখ্যাত কংগ্রেসকর্ম্মী অধ্যাপক ব্রজেশ্বর দে!”—জিতুবাবু সসম্ভ্রমে বলে' উঠলেন।

“হ্যাঁ, উনিই”—মাথা নেড়ে সমর্থন করলেন সুশোভন।

ব্রজেশ্বরবাবু বিনীত ভাবে নমস্কার করে' বললেন—“আমি বিখ্যাত কিনা জানি না, তবে আমি কংগ্রেসের একজন কর্ম্মী বটে, অধ্যাপনাও করে থাকি”

জিতুবাবু হঠাৎ কামিজের গলার বোতামটা লাগিয়ে নিয়ে বিস্ফারিত চক্ষে দেখতে লাগলেন লোকটিকে।

স্বয়ম্প্রভার চিবুক ও স্কন্ধযুগল অস্থির হয়ে উঠেছিল। “ও, আপনি বুঝি শুনলেন তারপর—যে আমার জামাইয়ের সঙ্গে আপনার স্ত্রী চলে এসেছেন”

ঘাড়টি ঈষৎ কাৎ করে' সসম্ভ্রমে উত্তর দিলেন ব্রজেশ্বরবাবু।

“আজ্ঞে হ্যাঁ। আমি এ খবর পেলাম পরে যে, পথে ওঁদের মোটরে কি একটা ‘অ্যাক্‌সিডেন্ট’ হয়েছে এবং ওঁরা এই হোটেলটায় এসে আশ্রয় নিয়েছেন। শুনে আমিও চলে এলাম একটা ট্যাক্সি নিয়ে”

"ভাগ্যে এসেছেন"—মৃদুকণ্ঠে বলতে হল স্বয়ম্প্রভাকে—যদিও সুশোভনের দিকে একটা অর্থপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন তিনি। সুশোভনের মনে হল তাঁর নাকের ডগাটা কাঁপছে। ঠাণ্ডায় না রাগে গবেষণা করতে লাগল সে মনে মনে।

"কি যে সব কাণ্ড"—জিতুবাবু বললেন—"তখনই বলেছিলাম আমি। হোটেলওলা কোথা?"

"তিনি বেরিয়ে গেছেন। হোটেলে কেউ নেই"—সুশোভন বললে।

"কে একজন যে উঁকিঝুঁকি মারছিল"

"ও গোকুল। পাশে ওর তাড়ির দোকান আছে। ওকে বসিয়ে রেখে হোটেলের চাকরটা শুদ্ধ বেরিয়ে গেছে"

"কেন, কি করবে তুমি ওকে নিয়ে"—স্বয়ম্প্রভা চোখ পাকিয়ে জিগ্যেস করলেন জিতুবাবুকে।

"না, কিছু নয়। ওকে বলব ভাবছিলাম যে আমাদের কিছু চাই না"

"কি দরকার তা বলবার"

ব্রজেশ্বরবাবুর দিকে ফিরে তারপর স্বয়ম্প্রভা বললেন, "দেখুন মেয়েকে নিয়ে আমরা এমনভাবে এসে পড়লাম এখানে, কারণ আমরা খবর পেয়েছিলাম যে সুশোভন নাকি"—একটু ইতস্তত করে' থেমে গেলেন তিনি, ঠিক কথাগুলো মুখে জোগাল না। উপরের ঠোঁট দিয়ে নীচের ঠোঁটটাকে চেপে সামনের দিকে চেয়ে রইলেন তিনি।

"আমাদের সঙ্গে আছেন?"—ব্রজেশ্বরবাবু ধীরকণ্ঠে বাক্যটা সম্পূর্ণ করবার প্রয়াস পেলেন। স্বয়ম্প্রভা তথাপি নিরুত্তর হয়েই রইলেন। তিনি ঠিক কেন যে তাঁর মেয়েকে নিয়ে এতদূর ধাওয়া করেছেন তা এই শান্ত গম্ভীর লোকটির কাছে প্রকাশ করা উত্তরোত্তর কঠিন হয়ে পড়ছিল।

সুশোভন নীরবতা ভঙ্গ করলে। সে আর আত্মসম্বরণ করতে পারছিল না। "এদের সঙ্গে থাকাটা কি গর্হিত বলে' বিবেচনা করছেন আপনি?"

স্বয়ম্প্রভার ইতস্তত-ভাবটা কেটে গেল।

"না, বাবা তা মনে করছি না। কিন্তু আমরা শুনেছিলাম যে তুমি নাকি অনীতাকে ট্রেনে তুলে দিয়ে আর একটি মেয়ের সঙ্গে ট্যাক্‌সি করে' চলে এসেছ এবং এখানে নাকি রাত কাটিয়েছ। কিন্তু মনে করো না বাবা, কিন্তু তোমার বিষয়ে যে সব কানাঘুসো শুনি তাতে এই খবর শুনে আমাদের—"

"ও"—সুশোভন এর বেশী আর বলতে পারলে না কিছু।

ব্রজেশ্বরবাবু বললেন—"যাক এখন আপনাদের ভুল ধারণাটা ভেঙে গেছে আশা করি। আমি এখন দিগ্বিজয়বাবুর ওখানে যেতে চাই। সুশোভনবাবু যদি সস্ত্রীক সেখানে যেতে চান আমার মোটরে আসতে পারেন"

এই শুনে অনীতা বললে, "কিন্তু আমি কাপড়-চোপড় যে কিছু আনি নি। এ অবস্থায় সেখানে যাওয়া চলে কি"

"তাতে কি হয়েছে"—সুশোভন বললে—'ফোনে বলে' দিলে কাপড়-চোপড় কালই চলে আসবে। এক রাত্রে এমন আর কি এসে যাবে। কাপড়-চোপড় আনবার জন্যে এখন কোলকাতা ফিরে যাওয়া যায় না তো"

অনীতা সুশোভনের দিকে চেয়ে দেখলে একবার ভুরু কুঁচকে। মায়ের সঙ্গে আবার কোলকাতা ফিরে যেতে তারও ইচ্ছে করছিল না। কিন্তু একজন ভদ্রলোকের বাড়িতে এক কাপড়ে যাওয়া যায় কি ?

"ওপরে ক'খানা শোবার ঘর আছে"—হঠাৎ জিগ্যেস করলেন স্বয়ম্প্রভা।

"দু'খানা"—সুশোভন জবাব দিল।

"নীচে থেকে দেখে তো মনে হয় না। খুব ছোট ঘর বুঝি"

"খুবই ছোট। শোবার খুব কষ্ট হয়েছে আমাদের"—ব্রজেশ্বরবাবু বললেন।

"হুঁ"

ওষ্ঠ দিয়ে অধরকে পুনরায় নিষ্পিষ্ট করতে লাগলেন স্বয়ম্প্রভা।

"আমাকে এবার যাওয়ার ব্যবস্থা করতে হয়। আপনারা যাচ্ছেন না তাহলে"—একটু ব্যস্ত হয়ে উঠলেন ব্রজেশ্বর।

"না আমাদের যাওয়া হবে না। অনেক ধন্যবাদ"—মৃদু হেসে জবাব দিলে অনীতা।

"আচ্ছা আমি তাহলে ওপর থেকে ঘুরে আসি"

ব্রজেশ্বরবাবু কপাটটা ভেজিয়ে দিয়ে ভিতরের দিকে চলে গেলেন।

"কোথা গেলেন উনি ? দোতলায় উঠলেন মনে হচ্ছে"—সুশোভনকে প্রশ্ন করলে অনীতা।

"দোতলার ভদ্রমহিলাটি কোথাও যেতে পারবেন না এখন। কাল রাত্রে তাঁর একেবারে ঘুম হয়নি, সমস্ত রাত বসে' কেটেছে। তিনি এখনই আবার মোটরে যেতে চাচ্ছেন না। তিনি ব্রজেশ্বরবাবুকে বলছেন—মোটরে করে' দিগ্বিজয়বাবুর কাছে গিয়ে একবার ঘুরে আসতে। একেবারে না গেলে বড় খারাপ দেখাবে। তাঁরা কোনও খবর তো পাননি, ভাবছেন হয়তো। উনি আজ জিরিয়ে কাল ওখানে যাবেন ঠিক করেছেন"

"সে মাগী এখনও আছে নাকি এখানে ?"—প্রশ্ন করলেন স্বয়ম্প্রভা।

"আছেন"

"আর তার স্বামী তাকে এখানে ফেলে যাচ্ছে ?"

"উনিই তো ব্রজেশ্বরবাবুকে জোর করে' পাঠাচ্ছেন"—সুশোভন উত্তর দিলে নিরীহভাবে।

"তেমন কিছু অসুখ হয় নি তাহলে"—অনীতা বললে।

"অসুখ তো হয় নি। ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন।"

"বিছানায় শুয়ে আছে ?"

"হ্যাঁ"

সুশোভনের মুখে মৃদু হাসি ফুটে উঠল একটা।

অনীতা হঠাৎ জিগ্যেস করলে—"আচ্ছা, দিগ্বিজয়বাবুর ওখানে কে কে আছে"

"বিশেষ কেউ না। আমরা আর ব্রজেশ্বরবাবুরা। কেন ?"

"ভাবছি, চল না হয় চলেই যাই তোমার সঙ্গে। ছোট একটা স্যুটকেসে আছে খানকয়েক শাড়ি, তাতেই না হয় চালিয়ে নেব কোনরকমে"

হঠাৎ মত বদলে ফেললে অনীতা। রাগ দুঃখ কিছু ছিল না তার আর। সুশোভন যে তাকে ছাড়া আর কাউকে ভালবাসে না, এর প্রমাণ সে পেয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ব্রজেশ্বরবাবুর স্ত্রীর সম্বন্ধে কথা বলার সময় তার মুখে একটু হাসির আভা ছড়িয়ে পড়বার মানেটা কি! না, চোখে চোখে রাখাই উচিত। ও ডাকিনীর কাছ থেকে যত শীঘ্র সম্ভব দূরে সরে' যাওয়া যায় ততই ভালো। এখানে আর একদণ্ড থাকা নয়।

জিতুবাবুরা যে গাড়িতে এসেছিলেন সুশোভন বেরিয়ে গিয়ে সেই গাড়ির ড্রাইভারকে গোপনে বলে' এল সে যেন তাড়া দিয়ে স্বয়ম্প্রভাকে নিয়ে চলে যায় এক্ষুণি। ক্রমাগত তাড়া দেয় যেন। ড্রাইভারের নিজেরই ফেরবার তাড়া ছিল, সুশোভনের কাছ থেকে কিছু বখশিস পেয়ে সানন্দে রাজি হয়ে গেল সে।

(২৪)

স্বামী সমভিব্যাহারে স্বয়ম্প্রভা দেবী বাইরের ঘরটাতে দাঁড়িয়ে ছিলেন। মোটরের 'গিয়ার' বদলানো হ'ল, হর্ণও শোনা গেল। জানলা দিয়ে মুখ বাড়ালেন। খানিকটা ধোঁয়া এবং ধূলো ছাড়া আর কিছু দেখা গেল না। সুশোভন আর অনীতাকে নিয়ে ব্রজেশ্বরবাবু মোটরে চলে গেলেন। চেয়ারটায় এসে বসলেন স্বয়ম্প্রভা। গুম হয়ে বসে রইলেন খানিকক্ষণ। পরাজয়ের গ্লানিতে সমস্ত চিত্ত পরিপূর্ণ। গ্লানিটা আরও তিক্ত হয়ে উঠল জিতুবাবুর মুখের দিকে চেয়ে। তাঁর বিরক্ত চোখ মুখ যেন নীরব ভাষায় বলছে—তখনই বলেছিলাম।

"হাসছ ?"—হঠাৎ প্রশ্ন করলেন স্বয়ম্প্রভা।

"না তো"

"হাতের নখগুলোকে কামড়াচ্ছ কেন! কি যে মুদ্রাদোষ তোমার"

"দেখ সম্পু, আর মন খারাপ করে' লাভ নেই। বরং যা হয়েছে তাতে আমাদের আনন্দিতই হওয়া উচিত"

"কে মাথা খারাপ করছে"

"সুশোভন ছেলেটি যে ভালো এ আমি বরাবরই জানি, কিন্তু তোমার ধারণা ঠিক উলটো। তোমার ধারণা যে ভুল তাতো প্রমাণ করেছি, এইবার বাড়ি চল"

"তুমি প্রমাণ করেছ? আমি না জোরে করলে কি তুমি বাড়ি থেকে নড়তে?"

"বাজে ব্যাপারে অনেকখানি সময় নষ্ট হয়েছে এবার বাড়ি চল"

"আমি একটু চা খাব"

"তাহলে তো ওই গোকুল না কে—তারই শরণাপন্ন হতে হয়। তাড়ির দোকানে চা-ও বিক্রি করে হয়তো। দেখি—"

"এই ছুতোয় তুমি গিয়ে আবার যেন তাড়ি খেও না"

"আমার একটা কিছু খাওয়ার দরকার কিন্তু। শরীর আর বইছে না। এখানে 'বিয়ার' পাওয়া যাবে কি? তাড়ি জিনিসটাও অবশ্য খারাপ নয়—"

"তুমি কি আপিসে ঘণ্টায় ঘণ্টায় 'বিয়ার' খাও নাকি!"

"জিনিসটা খারাপ নয়। প্রস্রাব সরল রাখে"

"লজ্জা করে না তোমার!"

"লজ্জার কি আছে এতে"—মরীয়া হয়ে উঠেছিলেন জিতুবাবু—"দেখি, চা পাওয়া যায় কি না—"

প্রজ্বলিত-দৃষ্টি জিতুবাবু বেরিয়ে গেলেন।

স্বয়ম্প্রভা চেয়ারে ঠেস দিয়ে চোখ বুজলেন, মনে হল যেন প্রার্থনা করছেন। কিন্তু পরমুহূর্তেই চোখ খুলতে হল। রাস্তায় 'মেশিন গান' এর শব্দ!

"আরে তুমি"

"আরে বাঃ"

জিতুবাবু এবং সদারঙ্গবিহারীলালের কণ্ঠস্বর যুগপৎ ধ্বনিত হয়ে উঠল।

"সম্পুও পাশের ঘরে মজুত"—জিতুবাবু বলছেন স্বয়ম্প্রভা শুনতে পেলেন। 'মজুত'—আহা কথা বলবার কি শ্রী, মনে হল তাঁর। নাসারন্ধ্র বিস্ফারিত হ'ল ঈষৎ।

"তুমি এখানে হঠাৎ। কি মনে করে'? এস ভেতরে এস" সোজা হয়ে বসে' সদারঙ্গবিহারীলালকে আহ্বান করলেন স্বয়ম্প্রভা।

"আমি কিন্তু এখানে আর বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে পারব না মশাই। যেতে হয়তো চলুন, আর আপনাদের দেরী থাকে তো ভাড়া মিটিয়ে দিন আমার"

ড্রাইভার জিতুবাবুকে বললে।

"এক্ষুণি যাব আমরা। একটু সবুর কর"—জিতুবাবু মৃদু হেসে বললেন।

"নিশ্চয় সবুর করবে। তাড়া দিতে মানা কর ওকে। আস্পর্দ্ধা তো কম নয়। ওকে আমরা ভাড়া করে' এনেছি, কাজ শেষ করে' যাব। ওয়েটিং চার্জ যা লাগে তা দেওয়া যাবে। তারপর সদারঙ্গ, তুমি এখানে এলে কোথা থেকে"

সদারঙ্গবিহারীলাল হেঁট হয়ে প্রণাম করলেন। স্বয়ম্প্রভা সম্পর্কে তাঁর দিদি হন।

"আপনিও এখানে! যাচ্চলে—বাঃ—আরে রাম রাম—কল্পনাতীত মানে—বাঃ"

"শ্‌ শ্‌—শ্‌ শ্‌—আস্তে—হ্যাঁ, নিশ্চয়ই"—জিতুবাবুর গলা শোনা গেল বাইরে, ড্রাইভারকে শান্ত করছেন।

"তুমি এখানে এলে হঠাৎ যে"—পুনরায় প্রশ্ন করলেন স্বয়ম্প্রভা।

"আমি? অনেকক্ষণ আগেই আসা উচিত ছিল আমার। বাইকটাই গড়বড়িয়ে দিলে! মিঠ্ঠু যে কেমন করে' সারালে তা জানি না। একটা না একটা ট্রাবল লেগেই আছে। আজকেরটা বোধহয় স্প্রোকেট্‌স্ (Sprokets) গুলোর দরুণই প্রধানত। ম্যাগ্‌নেটোর ভিতর কিছু তেলও ঢুকেছিল।

ম্যাগ্‌নেটোতে তেল ঢুকলেই বাস। সমস্ত খুলে সাফ করতে হল। তারপর থেকে ক্রমাগত লাফাচ্ছি। এমন এক একটা জার্ক দিচ্ছে—”

“বাইকের কথা থাক। এখানে কেন এসেছ—তাই বল”

ড্রাইভারের গলা আবার শোনা গেল।

“ভাড়া করেছেন বলে’ কি সমস্ত দিন থাকতে হবে না কি। মোটর কি আপনার নিজের—”

“আরে চেঁচাচ্ছ কেন বাপু। সম্পু আমরা কতক্ষণ আর—”

“ভেতরে এস। কপাট বন্ধ করে’ দাও”

“ও কেবল জানতে চাইছে আমরা কতক্ষণ—”

“তুমি ভেতরে এস। কপাট বন্ধ করে’ দাও”

“আসছি। এখুনি আসছি”—ড্রাইভারকে আশ্বাস দিয়ে জিতুবাবু ঘরে ঢুকলেন।

“দেখুন, কিন্তু একটা কথা, আমি আপনাদের আটকাচ্ছি না তো! না, না, তার দরকার নেই মোটেই—যাই হোক, আটকাতে চাই না। আমি আর একজনের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলাম। আপনাদের সঙ্গে দেখা হওয়াটা বিনা মেঘে বজ্রপাত গোছ—মানে, প্রায় অ্যাটম্ বম্—”

“কার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলে তুমি”—স্বয়ম্প্রভা জিজ্ঞেস না করে’ পারলেন না।

“দেখা করতে, মানে, অকপটে বলতে গেলে খোঁজেই এসেছিলাম। একটি ভদ্রলোককে খুঁজে বেড়াচ্ছি। সমস্ত ব্যাপারটাই বেশ অদ্ভুত গোছের মনে হচ্ছে। ভদ্রলোকটির সঙ্গে রাউতপুর রুইন্‌সে আলাপ হল। এই হোটেলেই পরশু রাত্রে আর একজন ভদ্রলোক আর তাঁর স্ত্রী এসেছিলেন, আমার সঙ্গে তাঁদেরও আলাপ হয়েছিল। তাঁদের কথা প্রথম ভদ্রলোককে বলতেই তিনি কেমন যেন হয়ে গেলেন; তারপর চট্ করে’ একটা মোটর ভাড়া করে’ ঊর্দ্ধশ্বাসে এইদিক পানে বেরিয়ে এলেন। তাঁরি পিছু পিছু ঘুরে বেড়াচ্ছি আমি, হয় তো

তাঁকে এমন কিছু বলে' থাকব যা হয় তো বলা উচিত ছিল না। একটু কেমন যেন গোলক ধাঁধা-গোছ লাগছে। শুনবেন ব্যাপারটা, যদি অবশ্য আপনাদের যাবার তাড়া না থাকে"

শুনব বই কি। যাবার কিছু তাড়া নেই"—স্বয়ম্প্রভার ভ্রূ কুঞ্চিত হয়ে এসেছিল—"ওগো, তুমি ব'স না। জানলার দিকে হাত নাড়ছ কেন—"

"ড্রাইভারটা জানলার কাছে এসেছে"

স্বয়ম্প্রভার নাসারন্ধ্র থেকে ঘোঁৎ করে' একটা শব্দ বার হল। উঠে দাঁড়ালেন তিনি।

"ভয়ে ভয়েই সমস্ত জীবনটা কাটল তোমার"—এই কথাগুলি বলে' ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন তিনি। দু'মিনিটের মধ্যেই ফিরে এলেন। ড্রাইভার নিজের সীটে গিয়ে বসতে পথ পেল না। কেঁচো হয়ে গেল একেবারে নিমেষের মধ্যে।

"এইবার বল"—স্বয়ম্প্রভা সদারঙ্গবিহারীলালকে আদেশ করলেন।

…কিছুক্ষণ যেতে না যেতেই ড্রাইভারের আত্মসম্মান প্রবুদ্ধ হল আবার। লজ্জাও হল একটু। ছি, ছি, সামান্য একটা মেয়েমানুষের ধমকে ঘাবড়ে গেল সে। নেবে বুকটা একটু চিতিয়ে আবার এগিয়ে গেল সে জানলার দিকে।

…স্বয়ম্প্রভা ঈষৎ ঝুঁকে সদারঙ্গবিহারীলালের কথা শুনছিলেন। স্মিতমুখে একাগ্র দৃষ্টিতে এমনভাবে চেয়েছিলেন তিনি, মনে হচ্ছিল যেন কোন অপরূপ আবির্ভাব প্রত্যক্ষ করছেন। শুধু প্রত্যক্ষ করছেন না, যেন উপভোগও করছেন সেটা।

জিতুবাবু টেবিলের এক কোণে বসে' নিরুপদ্রবে নিবিষ্টচিত্তে নখ কামড়াচ্ছিলেন। সদারঙ্গবিহারী বক্তৃতা করে' চলেছিলেন। হঠাৎ স্বয়ম্প্রভা থামিয়ে দিলেন তাঁকে।

"বুঝেছি। তুমি উপরে গিয়ে দেখে এস কেউ আছেন কি না, আর যদি থাকেন, তিনি তোমার সেই সান্ত্বনা দেবী কি না"

সদারঙ্গ একটু আমতা আমতা করে' বললেন, "একজন ভদ্রমহিলার ঘরে উঁকি দেওয়াটা কি ঠিক হবে—মানে—"

"বাজে কথা বোলো না, যা বলছি কর। যাও, দেখে এস"

সদারঙ্গ তাঁর কোটের গলার বোতামটা খুললেন, আবার লাগালেন। আবার খুললেন।

"করছ কি তুমি, যাও না"

"অন্য কোনও উপায়ে যদি"

অনন্যোপায় সদারঙ্গবিহারীকে যেতে হল। সিঁড়ি দিয়ে উঠে উপরের যে ঘরটিতে গোঁসাইজির অসুস্থা গুরু-ভগ্নীটি হাঁপানিতে কষ্ট পাচ্ছিলেন সেই ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন তিনি। বদ্ধদ্বারে সন্তর্পণে টোকা দিলেন একবার। ভিতর থেকে যে ধরণের শব্দ এল তাতে ভীত হয়ে পড়লেন তিনি। ভব্যতা রক্ষা করা কঠিন হয়ে পড়ল তাঁর পক্ষে। জানলা দিয়ে উঁকি দিলেন।

...যাবার সময় সদারঙ্গবিহারীলাল ঘরের দ্বারটি ঈষৎ খুলে রেখে গিয়েছিলেন। সেই দ্বার-পথে সাহস করে' ড্রাইভারটি এসে ঢুকল। দ্বারের দিকে পিছন ফিরে বসেছিলেন বলে স্বয়ম্প্রভা দেখতে পেলেন না। ড্রাইভারটি কথা বলিতে যাচ্ছিল এমন সময় দাম্পত্যালাপ সুরু হয়ে গেল। ড্রাইভার কথা না বলে' দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনতে লাগল সব।

"শুনলে তো এইবার? বলেছিলাম না?"

"ও সব আমি বিশ্বাস করি না। আমি ফিরে যাচ্ছি—"

"ফিরে যাচ্ছ? আমি কিন্তু যাব না। আমি মুচুকুণ্ডুতে যাব"

"পাগল নাকি! সেখানে কি এমন ভাবে যাওয়া যায়—"

"খুব যায়"

"যাও তাহলে। আমি ফিরে যাচ্ছি। সদারঙ্গ সমস্ত ব্যাপারটা জানে না, কি বুঝতে কি বুঝেছে, কি বলতে কি বলেছে, ওর মধ্যে আমি আর নেই"

"পুরুষ মানুষ হয়ে একথা বলতে লজ্জা করে না তোমার? একটা লম্পটের হাতে নিজের মেয়েকে ফেলে পালিয়ে যাবে তুমি? যেতে চাও যাও, আমি যাব না"

"সুশোভন যে লম্পট তা এখনও প্রমাণিত হয়নি। আর তোমার ওই সদারঙ্গবিহারীও যে অভ্রান্ত যুধিষ্ঠির একথাও মানতে রাজি নই আমি। নিশ্চয়ই কোথাও কোন গোলমাল আছে তাই ব্যাপারটা বোঝা যাচ্ছে না"

"সেই গোলমালটা যে কি—তাই জানতেই তো মুচুকুণ্ডু যেতে চাইছি"

"সে ধীরে সুস্থে পরে জানা যেতে পারে, তার জন্যে একজন ভদ্রলোকের বাড়িতে হুড়মুড় করে' যাওয়ার দরকার নেই"

"আছে"

"কি যে পাগলের মতো করছ তুমি সম্পু"

"পাগল আমি নই, পাগল তুমি। শুধু পাগল নও—পাষাণ। বাপ হয়ে মেয়েকে এমন ভাবে একটা গুণ্ডার হাতে ফেলে পালাতে পার"

"ছি ছি অত চেঁচিও না, লোকে বলবে কি"

"লোকের বলার কি হয়েছে এখন। যখন ঢিঢিক্কার পড়ে যাবে তখন শুনতে পাবে"

"ছি ছি কি করছ তুমি সম্পু! আচ্ছা, এখন ওই দিগিন্দ্রবাবুর ওখানে গিয়ে কি করতে চাও তুমি শুনি"

"আমি অনীতাকে বলতে চাই যে তার স্বামী ওই ব্রজেশ্বরবাবুর স্ত্রীর সঙ্গে একঘরে এক বিছানায় রাত কাটিয়েছে। আমি অনেক কিছু করতে চাই সেখানে গিয়ে। আমি সুশোভনের সঙ্গে দেখা করতে চাই, ব্রজেশ্বরবাবুর সঙ্গেও বোঝাপড়া করতে চাই। ওপরের ঘরে যিনি আছেন তিনি যদি ব্রজেশ্বরবাবুর স্ত্রী না হন—খুব সম্ভবত নন—তাহলে ব্রজেশ্বরবাবুর সঙ্গেও দেখা করতে চাই। এদের আমি বুঝিয়ে দিতে চাই যে যদিও আমরা আমাদের মেয়েকে ভুল করে' একটা পাষণ্ডের

হাতে দিয়ে ফেলেছি, কিন্তু সব কথা জানবার পর আর আমরা তাকে তার কাছে থাকতে দেব না”

“কি করে’ যাবে তুমি মুচকুন্‌পুরে?”

“ওই মোটরে। ওই ড্রাইভারই নিয়ে যাবে”

“না আমি যাব না”—নাটকীয়ভাবে বলে’ উঠল ড্রাইভার দ্বারপ্রান্ত থেকে।

স্বয়ম্প্রভা ঘাড় ফিরিয়ে দেখলেন এবং তড়াক্ করে উঠে দাঁড়ালেন। নাসারন্ধ্র বিস্ফারিত হল’, অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছুটতে লাগল চোখের দৃষ্টি থেকে।

“আমাদের কথা দাঁড়িয়ে শুনছিলে তুমি?”

“শুনছিলাম”

তারপর জিতুবাবুর দিকে ফিরে সে বললে—“আপনি যদি আমার সঙ্গে আসতে চান আসুন। আমি এখুনি ফিরে যাচ্ছি”

জিতুবাবু কেমন যেন দিশাহারা হয়ে পড়লেন।

“সম্পু, ব্যাপারটা ভেবে দেখ, বুঝলে—”

“যাও না তুমি। যাও। ব্যাগটা রেখে চলে যাও”

“না, না, আমি যেতে চাইছি না—কিন্তু—”

“হ্যাঁ, তুমি যেতেই তো চাইছ, তাই তো বলছিলে এতক্ষণ। যাও, আমাকে ফেলে রেখে চলে’ যাও”

“সম্পু, দেখ আমি—”

“আমি মোটর ষ্টার্ট করছি মশাই। এত ফৈজৎ বরদাস্ত হয় না আমার—”

হঠাৎ মনস্থির করে ফেললেন জিতুবাবু।

“বেশ, আমি চললাম তাহলে—”

দ্বারপ্রান্তে একটু ইতস্তত করলেন ভদ্রলোক। গোঁফ ঝুলে পড়েছে, সর্ব্বাঙ্গে ধূলো, চোখে কাতর মিনতি। বড় করুণ দৃশ্য! স্বয়ম্প্রভা কিন্তু বিচলিত হলেন না। জিতুবাবুকে একাই চলে যেতে হল।

সদারঙ্গবিহারীলাল নেমে এলেন।

বললেন, "আমি যা আশঙ্কা করছিলাম তাই। বাঃ—এ যে অদ্ভুত মনে হচ্ছে —মানে"—তারপর একটু থেমে হাত দুটো ঘসে, হঠাৎ বলে উঠলেন—"ছি, ছি, যাচ্ছে-তাই"

"ওপরে কে রয়েছে দেখে এলে? সান্ত্বনাদেবী?"

"সান্ত্বনাদেবী তো নেই। একটি হাঁপানি রুগী রয়েছেন। আপনারা শুনতে ভুল করেন নি তো"

"ভুল? মোটেই না"

"ওকি, মোটরটা ষ্টার্ট করছে দেখছি। চলে যাচ্ছে নাকি"

"উনি ফিরে যাচ্ছেন"

"ও। আর আপনি?"

"আমি মুচুকুণ্ড যাব। তোমাকেও যেতে হবে আমার সঙ্গে"

"মুচুকুণ্ড? মানে, মুচুকুন্দ-কুণ্ডলেশ্বরী? দিগ্বিজয়বাবুর ওখানে?"

স্বয়ম্প্রভা মাথা নাড়লেন।

সদারঙ্গ মাথা চুলকে বললেন, "কিন্তু দেখুন, আমার যেতে ইচ্ছে করছে না সেখানে"

"আমারও করছে না"—দৃঢ়কণ্ঠে স্বয়ম্প্রভা বললেন—"কিন্তু মায়ের কর্ত্তব্য আমাকে করতেই হবে, তা সে যতই না কেন অপ্রিয় হোক"

"ও। কিন্তু আমাকে যদি বাদ দেন, ক্ষতি কি"

"তোমাকে যেতেই হবে। উনি তো আমাকে ফেলে চলে গেলেন। আমার প্রতি অনীতার প্রতি তোমারও তো একটা কর্ত্তব্য আছে। তা ছাড়া তোমার মুখেই খবর পেলাম যে কতবড় ধড়িবাজ ওরা। তুমিই হলে প্রধান সাক্ষী। তোমাকে যেতে হবে"

"চিঠি লিখে দিলে কিম্বা অন্য কোনও উপায়ে যদি—মানে—জনার্দ্দনবাবুকে কথা দিয়েছি ভোটগুলো জোগাড় করে দেব—হনুমানপুরটা সেরে ফেলেছি যদিও—"

"ওসব পরে কোরো। এখন যত শীঘ্র সম্ভব আমাদের মুচকুন্‌পুরে পৌছতে হবে। ওই দুটো লোক আমাকে ভাঁওতা দিয়ে অনীতাকে নিয়ে সরে পড়েছে। অনীতার বিপদ চরমে পৌছবার আগে আমাদের সেখানে পৌছতেই হবে, যেমন করে' হোক"

"পরিস্থিতি ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল দেখছি। দেখুন, দিদি, মাপ করুন আমাকে, আমি, মানে, এসবে নিজেকে জড়াতে চাই না"

"এখুনি বললে ওই লোকটাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি, আবার বলছ এসবে নিজেকে জড়াতে চাই না। বুঝলাম না ঠিক"

"ও ভদ্রলোক যে কে তা তো আমি জানতাম না। এখনও ঠিক জানি না। আমার বিশ্বাস হয় না যে সান্ত্বনা দেবী—না, এখন মনে হচ্ছে, আমি বোধ হয় আসলে সান্ত্বনাদেবীকে রক্ষা করবার উদ্দেশ্যেই বেরিয়েছিলাম। মনে হচ্ছে—"

"বুঝেছি। মেয়েটির যাদু করবার ক্ষমতা আছে দেখছি। বেশ, তাকে রক্ষা করাই যদি তোমার উদ্দেশ্য তা হলেও তো এই সুযোগ। কারণ, আমি তাকেও ছেড়ে কথা কইব না। তুমি যদি রক্ষা করতে চাও তাকে, চল আমার সঙ্গে"

সদারঙ্গবিহারীলাল গলার সাঁকিটায় হাত বুলোতে লাগলেন।

"বেশ"—তিনি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে রাজি হয়ে গেলেন অবশেষে।

"তুমি কোথায় থাক এখানে"

"বেশী দূর নয়, পাঁচ মাইল হবে এখান থেকে"

"সেখানেই চল যাই আগে। সেখান থেকে একটা মটর ভাড়া করতে হবে। তারপর যাওয়া যাবে মুচুকুণ্ডু"

সদারঙ্গ ঘাড় নাড়লেন। তিনি যেখানে থাকেন সেখানকার হালচাল বেশ ভালো ভাবেই জানা আছে তাঁর।

"কিন্তু অত দূরই বা আপনি যাবেন কি করে'। আমি তো হাঁটতে পারব না। একবার চেষ্টা করেছিলাম। ভয়ানক ক্লান্তিজনক! আপনি যাবেন কি করে'। হাঁটতে পারবেন কি"

"দরকার হলে আমি দৌড়তাম"—স্বয়ম্প্রভা বললেন—"কিন্তু এখন দৌড়েও যে কূল পাব না। দৌড়লেও দেরি হয়ে যাবে—"

ঘাড়টা বেঁকিয়ে রাস্তার দিকে চাইলেন তিনি ভ্রূকুঞ্চিত করে'—যেন শত্রুকে নিরীক্ষণ করছেন।

"তোমার পিছনে সেটা নেই ?"

"আমার পিছনে ? মানে ?"

ঘাড় ফিরিয়ে নিজের পিছন দিকটা দেখবার চেষ্টা করলেন সদারঙ্গ-বিহারীলাল।

"তোমার বাইকের পিছনে"

"ও, কেরিয়ার। হ্যাঁ, তা আছে একটা চলনসই-গোছ। আপনি তার উপর চেপে যাবেন বলছেন ? গড ! তাকি সম্ভব ? তা ছাড়া আমার বাইক মোটে আড়াই হর্স পাওয়ার"

"তোমার বাড়ি পর্য্যন্ত যাব"

"কিন্তু সেটাও কি—"

"জিনিস-পত্র এখানেই থাক। রাত্রে এখানেই ফিরে আসব। চল। সময় নষ্ট করলে চলবে না"

"কিন্তু দিদি, শুনুন একটা কথা। সত্যি বলছি—"

"প্রতিবাদ কোরো না, যা ঠিক করে' ফেলেছি তা করবই, কথা বললে সময় নষ্ট হবে খালি। চল। বাইকে চড়। দাঁড়াও তোমার কোটটা খুলে দাও পেতে বসব তার উপর। দেরি করছ কেন, দাও"

সদারঙ্গ তাড়াতাড়ি কোটটা খুলে দিলেন।
বাইরে বাইকের সামনে এসে দাঁড়ালেন দুজনে।
"আমার কেরিয়ারটা তেমন বড়ও নয় তো, মানে—"
"চড়"—আদেশ করলেন স্বয়ম্প্রভা।

(২৫)

শাস্ত্রকারগণ ঠিকই ধরেছিলেন—স্ত্রীলোকেরাই শক্তি। ওঁরাই শক্তির ধারক বাহক—সব। পুরুষরা মাঝে মাঝে যে শক্তির পরিচয় দেন তা স্ত্রীলোকদের গর্ভোদ্ভূত বলেই সম্ভবত। তা না হলে পারতেন কিনা সন্দেহ। হলদিঘাটের যুদ্ধই বলুন আর ক্ষুদিরামের ফাঁসিই বলুন, আসল উৎস নারী।

স্বয়ম্প্রভা মোটর বাইকের পিছনে ঝুলতে ঝুলতে চলেছিলেন। এত কষ্ট স্বীকার করে' তিনি যে সুশোভন আর তার দলকে হাতে-নাতে ধরতে যাচ্ছিলেন তার কারণ এ নয় যে তারা ওঁকে একটু আগে ফাঁকি দিয়ে পালিয়েছে। গোড়া থেকেই তিনি অনুমান করেছিলেন—অনুভব করেছিলেন যে সুশোভনকে বিয়ে করে' অনীতা একটা গুণ্ডার যড়যন্ত্রে পড়েছে। সেই গুণ্ডার দলকে তাড়া করে' ছত্রভঙ্গ করে' ছিন্নভিন্ন করে' উৎখাত করে' তবে তিনি থামবেন। তাদের দেখিয়ে দেবেন যে মেয়েমানুষ বলে' তিনি দুর্ব্বল নন এবং এ মুলুক মগের মুলুক নয়। সদারঙ্গবিহারীলালের মোটর বাইক মফঃস্বলের বন্ধুর রাস্তায় লাফাতে লাফাতে ছুটছিল। বাইকের ঝাঁকানিতে স্বয়ম্প্রভার বলিষ্ঠ-চোয়াল-সংলগ্ন মাংস-মেদ কাঁপছিল থল থল করে'। সমস্ত চোখে মুখে অদ্ভুত রকম ভয়ানক একটা দুর্দ্ধর্ষ শক্তির ব্যঞ্জনা ফুটে উঠেছিল। সদারঙ্গবিহারীর কোমরটা জাপটে ধরেছিলেন তিনি। এতে যে অসুবিধা বা অশোভনতার সৃষ্টি হয়েছিল সে সম্বন্ধে ভ্রূক্ষেপও ছিল না তাঁর। যে কোনও মুহূর্ত্তে যে একটা বিপদ ঘটে যেতে পারে সে আশঙ্কাও ছিল বলে' মনে হচ্ছিল না। একাগ্রচিত্তে একটি কথাই কেবল তিনি ভাবছিলেন —কেমন করে' কত শীঘ্র তিনি মুচুকুন্দ-কুণ্ডলেশ্বরীতে পৌঁছবেন। যদি কেউ

এরোপ্লেনে করে' উড়িয়ে নিয়ে গিয়ে প্যারাসুটে করে' তাঁকে সেখানে নাবিয়ে দিত, তাতেও তিনি রাজী হয়ে যেতেন সানন্দে।

…একটু আগে যে জন্যে ওরা হাত ফসকে পালিয়েছে তাতে এক হিসেবে লাভই হয়েছে বলতে হবে। ঝড়াং। ব্রজেশ্বর লোকটাকে চেনা গেল। ওদেরই দলের লোক নিশ্চয়। সান্ত্বনার স্বামী সেজে এসেছে, কিম্বা…ঝড়াং…ঝড়াং…। কিম্বা হয়তো সান্ত্বনাকে নিয়ে হাল্লা করে সবাই, আজকালকার মেয়েতো কিছুই বলা যায় না—

অনীতাকেও ওই রকম করতে চায়—ভোঁক্—ভোঁক্—উঃ ভাবা যায় না… ঝড়াং…ভোঁ-ও-ও-ক্…মানুষের এত অধঃপতন হতে পারে!

হঠাৎ স্বয়ম্প্রভা উল্টে গেলেন বোঁ করে' এবং মুহূর্তের মধ্যে ডিগবাজি খেয়ে রাস্তার ধারে মাঠের মাঝখানে বসে' পড়লেন একটা ঝোপের ভিতর। কাঁটার ঝোপ। সামনে অপ্রত্যাশিতভাবে একটা গরুর গাড়ি এসে পড়ায় এবং ধাক্কা বাঁচাবার চেষ্টা করায় এই কাণ্ড। গরুর গাড়িতে গোঁসাইজি, ফদকা, আর নিতাই বৈরাগী।

সদারঙ্গবিহারীলাল পড়ে' যান নি। তিনি গাড়ি থেকে নেবে তাড়াতাড়ি ছুটে গেলেন ঝোপটার কাছে।

"ইস্! লাগেনি তো? ওই গরুর গাড়িটা, বুঝলেন। আনাড়ি গাড়োয়ান ষাঁড়ও আনকোরা সম্ভবত। লেগেছে?"

"না"

"যাক। কিন্তু ভারি দুঃখিত আমি। জোরে ব্রেক কসা ছাড়া উপায় ছিল না। দুরন্ত ষাঁড়"

"আমাকে তোল"

"কারও লেগেছে না কি গো"—গাড়ির গাড়োয়ান জিগ্যেস করলে রাস্তা থেকে।

"আমার হাতটা ধরে' নিজেকে একটু টেনে তোলবার চেষ্টা করুন। শক্ত বুঝতে পারছি, ঝোপে আটকা পড়ে' গেলে নিজেকে টেনে বার করা খুবই কঠিন। আমার অভিজ্ঞতা আছে। লাগেটাগে নি তো"

"না"—দাঁতে দাঁত চেপে স্বয়ম্প্রভা বললেন এবং নিজেকে টেনে তোলবার নিষ্ফল প্রয়াস করতে লাগলেন।

"ছি ছি—হ্যাঁ এই রকম—আবার করুন—হেঁইও—"

"জখম হল না কি কেউ গো"—গাড়োয়ান প্রশ্ন করলে আবার।

"না চোট টোট লাগেনি কারও। এইবার—হেঁইও হেঁইও—"

"না পারছি না। চুপ কর, হেঁইও হেঁইও কোরো না"

"ও আচ্ছা। সত্যি ভারি ইয়ে হ'য়ে গেল তো! ছি, ছি কি মুশকিলে পড়ে' গেলেন আপনি। একটু গুঁড়ি মেরে—হামাগুড়ি-দেওয়া-গোছ—পারবেন?"

"না"

"কি করা যায় তাহলে। কোমরে টোমরে লাগে নি তো? ব্যথা করছে কোথাও? অনেক সময় প্রথমটা 'ফীল' করা যায় না। আচ্ছা এক কাজ করুন, আমার দুটো কাঁধের উপর ভর দিয়ে উঠতে পারবেন কি না দেখুন তো"

"না। দিক কোরো না আমাকে"

"ও আচ্ছা। আচমকা পড়ে গেলে অনেক সময় কিচ্ছু জোর পাওয়া যায় না —মানে নার্ভাস-গোছের হয়ে যেতে হয়—তা হয় নি তো"

"না"

"তবে? কিছু একটা হয়েইছে নিশ্চয়। চেষ্টা করুন, পারবেন ঠিক উঠতে। উঠতে হবেই, কারণ একটা ঝোপের ভিতর আর কতক্ষণ বসে' থাকবেন। আমাকে একটু চেষ্টা করতে দিন না, আমি টেনে তুলে দি আপনাকে"

"থাম। কোথাও আটকে গেছি মনে হচ্ছে"

"আটকে? ও, থামুন, বুঝেছি, 'জাম' হয়ে গেছে। এক মিনিট। টানাটানি করলে শাড়ি ছিঁড়ে যেতে পারে—দাঁড়ান। যন্ত্রটন্ত্র জাম হয়ে গেলে তার তলার

দিকটা বেশ করে' লুব্রিকেট করে' দিলে খুলে যায় অনেক সময়—কিন্তু আপনাকে—"

"তুমি চুপ কর। ওদিকে সরে যাও তুমি। আমি নিজেই ঠিক করে নিচ্ছি দূরে সরে' যাও। এদিকে দেখো না"

"ও, আচ্ছা, আচ্ছা। মহাবিপদে পড়া গেল তো! ছি ছি"—মুখ ঘুরিয়ে সদারঙ্গবিহারীলাল রাস্তার দিকে চাহিলেন।

"আরে গোঁসাইজি যে! নমস্কার, নমস্কার। কি কাণ্ড! আপনি এখানে"

"ওদের এখান থেকে সরে যেতে বল"—ঝোপের ভিতর থেকে নিদারুণ -কসরৎ-রতা স্বয়ম্প্রভার তর্জ্জন শোনা গেল।

"আরে, বৈরাগী মশাইও যে। নমস্কার। আপনি এ অঞ্চলে হঠাৎ যে আজ?"

"ওই লোকগুলোকে সরে' যেতে বলবে কি না।"

"মাঠাকরুণের লেগেছে না কি"

গাড়োয়ানটিও গাড়ি থেকে নেমে এসে দাঁড়াল।

"না লাগে নি। আটকে গেছেন। কিন্তু উনি চান না যে—"

"আটকে গেছেন?"

বলিষ্ঠ ঘোঁতন গাড়োয়ান ঈষৎ ঝুঁকে এমন ভাবে এগিয়ে এল যেন তাকেই এ সমস্যার সমাধান করতে হবে। অনেক আটকানো গাড়ির চাকা তুলেছে সে জীবনে।

"আটকে গেছেন? তাতে কি হয়েছে! পাঁজাকোলে করে' টেনে তুলে দিলেই মিটে যায়"

কিন্তু উনি চান না যে আমরা কোন রকম সাহায্য করি—চটে যাচ্ছেন—ঠিক করে' নেবেন এখন নিজেই বোধহয়—হয় তো একটু সময় লাগবে—কিন্তু—"

"চলে যাও এখান থেকে সব"—আবার চেঁচিয়ে উঠলেন স্বয়ম্প্রভা। নিজেকে মুক্ত করবার প্রয়াসে সমস্ত মুখ লাল হয়ে উঠেছিল তাঁর।

ঘোঁতন নীরবে দন্তবিকশিত করে' হাসল একবার। তারপর কোমর বেঁধে মালকোচা মারল। তারপর অগ্রসর হল ধীরে ধীরে।

"ছটফট করবেন না মাঠাকরুণ। সব ঠিক করে' দিচ্ছি। বৈরিগি মশাই একটু সরে দাঁড়ান দিকি"

ঘোঁতনের দক্ষতা সম্বন্ধে সন্দেহ ছিল না কারও। সসম্ভ্রমে সকলেই সরে' দাঁড়ালেন। গোঁসাইজির মুখে নানা ভাবের সংমিশ্রণে বিচিত্র ছবি ফুটে উঠেছিল একটা।

"সদারঙ্গ! এই—এই গাড়োয়ান—খবরদার—খবরদার, আমার গায়ে হাত দিও না বলছি—এ কি আস্পর্দ্ধা—"

ঈষৎ ঝুঁকে ঘোঁতন খপ করে' স্বয়ম্প্রভার কোমরটা জাপটে ধরেছিল। জবাই করবার পূর্ব্বে হাঁস বা মুরগী ঘাতকের মুঠোর মধ্যে যেমন ছটফট করে, স্বয়ম্প্রভাও অনেকটা তেমনি করতে লাগলেন। কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় সদারঙ্গবিহারী ঈষৎ-ব্যায়ত আননে ঘোরা ফেরা করছিলেন কেবল চঞ্চল হয়ে।

"ছেড়ে দাও, আমাকে ছেড়ে দাও"—তারস্বরে আদেশ করতে লাগলেন স্বয়ম্প্রভা।

"ঘোঁতন ছেড়ে দাও বুঝলে—যদিও তুমি ওঁর ভালোর জন্যেই করছ—তবু বুঝলে—উনি যখন সেটা চাইছেন না তখন—বাঃ প্রায় তুলে ফেলেছিলে যে! বাঃ—আর একবার"

"সদারঙ্গ যেতে বল ওকে। তুমিও ওকে ওসকাচ্ছ? ছেড়ে দাও, ছাড় বলছি—ছাড়"

"না না করুক। আপনি বুঝছেন না দিদি। ও ঠিক টেনে তুলে ফেলবে। ঘোঁতন আর একবার"

"আমি মেয়েমানুষ, আমার গায়ে একটা পরপুরুষ হাত দিচ্ছে আর তুমি দাঁড়িয়ে দেখছ সেটা—"

"না, না ব্যাপারটা ওভাবে নেবেন না। আপনার ভালর জন্মেই ও করছে —ঝোপের মধ্যে বরাবর বসে' থাকবেন নাকি! ঘোঁতন—হ্যাঁ—ঠিক—টান। হেঁইও—ও না! হয়েছে—হয়েছে—বাঃ"

"মারো জোয়ান হেঁইও"—ঘোঁতন বলে' উঠল।

"হেঁইও"—বৈরাগী মশাইও বললেন।

"হেঁইও"—ফদকাও বললে।

"হেঁইও হেঁইও হেঁইও"—আত্মবিস্মৃত সদারঙ্গবিহারীলাল নৃত্য করতে লাগলেন দু'হাত তুলে।

চর্‌র্‌র্‌র্‌—! কাপড় ছেঁড়ার একটা শব্দ হল এবং পরমুহূর্ত্তেই স্বয়ম্প্রভা ঝোপমুক্ত হলেন। ঘোঁতন তাঁকে পাঁজাকোলা করে' তুলে এনে রাস্তায় দাঁড় করিয়ে দিয়ে মাথার ঘাম মুছলে।

"অসভ্য বখাটে গুণ্ডা জানোয়ার"—ক্রোধে স্বয়ম্প্রভার মুখ লাল হয়ে উঠেছিল —"শাড়িটা ছিঁড়ে ফ্যাতাফুঁতি করে' দিলে একেবারে—"

"শাড়ি যে আটকে গিয়েছিল মাঠাকরুণ। তলার দিকে হাত চালিয়েও বাঁচানো গেল না, ছিঁড়ে গেল কি করব, ওর কোন চারা ছিল না। শাড়ি বাঁচাবার জন্মেই তলার দিকে হাত চালিয়ে ছিলাম, কিন্তু হল না"

"সরে যাও এখান থেকে। চলে' যাও সবাই"

স্বয়ম্প্রভার চোখে জল এসে গিয়েছিল।

সদারঙ্গবিহারীলালের দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে' তিনি বললেন, "গাড়োল কোথাকার"

"আমি কি করব বলুন"

"তুমি ওসকাচ্ছিলে কেন? আবার বলা হচ্ছে কি করব"

"ওসকানো কথাটা ঠিক হচ্ছে না, না, না—ওসকানো—বাঃ। এক্ষেত্রে ওছাড়া উপায়ই বা কি ছিল বলুন। ঘোঁতন না এসে পড়লে সমস্ত দিন ওই ঝোপে বসে' থাকতে হ'ত—হয়ত সমস্ত রাতও। মারাত্মক আটকে পড়েছিলেন যে"

ওদের চলে যেতে বল। আমার শাড়ি একেবারে ছিঁড়ে গেছে”

“ওদের উপর চটবেন না। আমার পরিচিত লোক সব। আর প্রত্যেকটি ভালো লোক। উচু দরের। বৈরাগীমশাই ভক্ত লোক একজন। ইনি হচ্ছেন গোঁসাইজি, এঁরই হরিমটর হোটেল, সেইখানেই আজ রাত্রে আপনাকে থাকতে হবে হয়তো”

গোঁসাইজি ভ্রূকুঞ্চিত করে’ দাঁড়িয়েছিলেন। গলা খাঁকারি দিয়ে বললেন “ক্ষমা করবেন, আপাততঃ আমি অতিথি সৎকার করতে অক্ষম”

“কিন্তু একটা ঘর তো খালি আছে দেখে এলাম”

“সে ঘরে আমার বন্ধু বৈরাগী মশাই থাকবেন আজ রাত্রে। আমার গুরুভগ্নী অসুস্থা। ওঁকে নিয়ে যাচ্ছি রাত্রে সেবার দরকার হতে পারে। সে বিষয়ে সিদ্ধহস্ত উনি”

“ও”

সদারঙ্গবিহারীলাল একটু থতমত খেয়ে গেলেন।

“শুনছেন দিদি, এ আবার এক প্যাঁচ হল। বেশ, উচু দরের প্যাঁচ—”

স্বয়ম্প্রভা সরে’ গিয়ে আর একটি ঝোপের আড়ালে দাঁড়িয়ে স্বীয় শাড়ি পর্যবেক্ষণ করছিলেন। এই ছেঁড়া শাড়ি পরে’ তাঁকে যে হোটেলে ফিরতে হবে না এ সংবাদে তিনি আশ্বস্ত হলেন কিঞ্চিৎ। এ শাড়ি পরে’ ভদ্রসমাজে বেরোন অসম্ভব।

বৈরাগী মশায়ের মনে হল হোটেলের ঘরটি এঁরা যে পেলেন না সেজন্যে পরোক্ষভাবে তিনিই সম্ভবত দায়ী। সুতরাং একটু জবাবদিহি করা প্রয়োজন। এগিয়ে এসে মৃদু হেসে হাত কচলে বললেন, “দেখুন গোঁসাইজির গুরুভগ্নীটি অসুস্থ হয়ে পড়া গতিকেই আমাকে আসতে হল। গোঁসাইজির কথা ঠেলা যায় না, তাছাড়া এটা একটা সামাজিক কর্ত্তব্যও বটে—অ্যাঁ, কি বলেন। খালি ঘরও তো মাত্র একটি—তা নইলে না হয়—”

"তাতো বুঝলাম। কিন্তু আমি কি জঘন্য প্যাঁচে পড়লাম সেটা ভাবুন। গোঁসাইজি, কোন রকমেই কি হয় না ?"

"না"—গোঁসাইজি দৃঢ়কণ্ঠে বললেন—"প্রকাশ্য দিবালোকে যে স্ত্রীলোক একজন পুরুষের কোমর ধরে' তার বাইসিকলের পিছনে চড়ে' আসতে পারেন তাঁকে কিছুতেই আমি স্থান দিতে পারি না, ঘর খালি থাকলেও পারি না। কেবল পয়সা পেটবার জন্যেই যে আমি হোটেল খুলি নি একথা এ অঞ্চলের সবাই জানে। আমার ওটা হোটেল নয়, হিন্দু পান্থনিবাস"

ঝোপের আড়াল থেকে স্বয়ম্প্রভা বললেন, "ওখান থেকে চলে এস তুমি"... গোঁসাইজির দল গিয়ে শকটে আরোহণ করলেন।

সদারঙ্গবিহারীলাল এগিয়ে গিয়ে নিজের বিরক্তি, অস্বস্তিজনক পরিস্থিতি, মহিলার অপমান, তার অনিবার্য্য কারণ, ক্ষমা প্রার্থনা প্রভৃতি উপকরণ নিয়ে একটি লম্বা বক্তৃতা সুরু করতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু স্বয়ম্প্রভার এক ধমকে থেমে যেতে হল তাঁকে।

"চুপ কর। বাইকটা ঠিক আছে তো ?"

"হ্যাঁ, ওটাকে বাঁচিয়েছি কোনক্রমে। এক আধটা স্পোক সম্ভবত গেছে। ব্রেকটা গোড়া থেকেই খুব ভাল নয়, তবে চলবে আপাতত"

"চল তবে"

"কিন্তু আপনি এখন যেতে পারবেন কি"

"বাজে কথা না বলে' বাইকটা আন"

"কিন্তু এই অবস্থায় যাওয়াটা সঙ্গত হবে কি, ভেবে দেখুন"

সদারঙ্গবিহারী নিজের চশমাটা ঠিক করে' নিয়ে বাইকটার দিকে এগিয়ে গেলেন। বাইকটা কাৎ হয়ে পড়েছিল একধারে। সেটা তুলে স্বয়ম্প্রভার দিকে আর একবার চাইলেন তিনি।

"দেখুন এই অ্যাক্সিডেন্টটা হয়তো ভগবানের ইঙ্গিত হ'তে পারে। হয়তো তাঁর ইচ্ছে নয় যে আমরা এভাবে আর অগ্রসর হই"

"ভগবানের দোহাই দিতে লজ্জা করে না তোমার! আমাকে একটা ঝোপের মধ্যে উল্টে ফেলে দিয়ে কতকগুলো অসভ্য লোক জুটিয়ে আমার অপমানের চূড়ান্ত করে' এখন ভগবানের দোহাই দিচ্ছ ?"

"না—না—বাঃ—কথাটা ওরকমভাবে নিচ্ছেন কেন"

"বাইকে চড়"

সদারঙ্গবিহারী আর আপত্তি করতে সাহস করলেন না।

পথে উল্লেখযোগ্য কোনও বিপদ হল না আর। 'ঝড়াং ঝড়াং করতে করতে সদারঙ্গবিহারীলাল নিজের আস্তানায় পৌছলেন শেষ পর্য্যন্ত। বাইকের পিছনে দোদুল্যমানা স্বয়ম্প্রভাকে দেখে গ্রামের দু'চারজন অসভ্য লোক দু'একটা মন্তব্য অবশ্য করেছিল, কিন্তু স্বয়ম্প্রভা তাতে কান দেন নি। মুখ বুজে গুম হয়ে বসে-ছিলেন তিনি সদারঙ্গবিহারীলালকে আঁকড়ে। নেবেই তিনি সদারঙ্গবিহারীলালকে গাড়ির খোঁজে পাঠালেন। একটা মোটর চাই-ই যেমন করে' হোক। সদারঙ্গ-বিহারী গেলেন (প্রতিবাদ করবার সাহস ছিল না তাঁর আর) এবং একটু পরে ফিরে এলেন। এ তল্লাটে কোনও গাড়ি নেই। কোনও রকম গাড়িই না। বেচুর একটি গরুর গাড়ি ছিল, কিন্তু একটি গরু দু'দিন আগে মারা যাওয়াতে সে গাড়িটিও অচল হয়েছে।

...অল্পক্ষণের মধ্যেই স্বয়ম্প্রভা সদারঙ্গবিহারীলালের গৃহস্থালিতে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে' ফেললেন। ধমকের চোটে পাঁচির মায়ের প্রাচীন পিলে ঘন ঘন চমকাতে লাগল। তাকে শায়েস্তা করে' তারপর তিনি ভাল করে' দেখলেন শাড়িটা কতখানি ছিঁড়েছে। ইস্—কোনও পদার্থ নেই একেবারে। শাড়ির দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে স্বয়ম্প্রভা মতি-স্থির করে' ফেললেন।

"আমি এইখানেই থাকি, বুঝলে সদারঙ্গ। অনীতাকে আমি একটা চিঠি লিখে দিচ্ছি, সেইটে নিয়ে তুমিই চলে যাও। গিয়ে অনীতাকে সঙ্গে করে' নিয়ে এস। মোটর দেবার মতো ভদ্রতা যদি ওদের না-ও হয় বাইকে চড়িয়েই নিয়ে এস। কাগজ কলম দাও"

সদারঙ্গ বিনা বাক্যব্যয়ে কাগজ কলম এনে দিলেন। চশমাটা কপালে তুলে নাক ঝাড়লেন একবার। তারপর লিপি-রচনা-নিরতা স্বয়ম্প্রভার দিকে চেয়ে রইলেন ভ্রূকুঞ্চিত করে'। তাঁর মনে হল কোনও প্রতিবাদ করলে ভয়ঙ্কর কিছু করে' বসবেন স্বয়ম্প্রভা। এখানে থাকাটাও নিরাপদ নয়। অস্বস্তিজনক তো বটেই। খুব। সরে' পড়াই ভালো। তাছাড়া তাঁর নিজেরও যাবার ইচ্ছে করছিল ভিতরে ভিতরে। সান্ত্বনা দেবীর ব্যাপারটা বেশ রহস্যময় হয়ে উঠেছে, জানতে কৌতূহল হচ্ছিল বই কি! নিশ্চয়! স্বয়ম্প্রভা দেবী যা সন্দেহ করছেন তা অবশ্য বিশ্বাস করেন নি তিনি—কিন্তু ব্যাপারটা বেশ একটু ই'য়ে গোছের হ'য়ে দাঁড়িয়েছে।

"নাও। মনে রেখো ভদ্রসন্তান তুমি, আমার কাছে প্রতিশ্রুতি দিয়ে যাচ্ছ যে এ চিঠি তুমি অনীতাকে দেবে এবং সে যদি তোমার সঙ্গে চলে না আসে তার নিজের হাতের লেখা জবাব নিয়ে আসবে"

"বেশ"—আড়চোখে চিঠিটার দিকে চেয়ে ঘাড় চুলকে উত্তর দিলেন সদারঙ্গ-বিহারীলাল।

"ইচ্ছে করতো চিঠিটা তুমি পড়তে পার"

সদারঙ্গ পড়তে লাগলেন। পড়তে পড়তে তাঁর মুখভাব গম্ভীর হ'য়ে এল ক্রমশঃ। স্বয়ম্প্রভা সাগ্রহে তাঁর মুখের দিকে চেয়েছিলেন। চিঠি পড়া শেষ হতেই তিনি বললেন,

"ঠিক হয়েছে তো?"

"হয়েছে, মানে—"

চিঠিটা পকেটে পুরলেন সদারঙ্গবিহারীলাল।

"মানে, আবার কি!"

"একটা জিনিস বুঝতে পারছি না। অনীতার দাম্পত্যজীবনের সুখশান্তি নষ্ট করবার জন্যে কেন এত তোড়জোড় করছেন। মানে, আপনি যা ভাবছেন তা যদি সত্যিও হয়—"

"অনীতার সুখশান্তি নষ্ট করবার জন্যে? তার সুখশান্তি বাঁচাবার জন্যেই এত করছি। ওর স্বামীটিকে সিধে করতে হলে রীতিমত শিক্ষা দিতে হবে"

"ও"

সদারঙ্গবিহারীলালের তর্ক করবার ইচ্ছে হচ্ছিল, কিন্তু তা না করে' তিনি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে হাত দুটি ওলটালেন একবার।

"যাও আর দেরি করো না"

"কাপড় জামা ছেড়ে গেলেই ভাল হয় না?"

"কাপড় জামা ছেড়ে আর কি করবে। রাস্তায় বেরুলেই তো ধূলোয় কালিতে আবার সব একাকার হয়ে যাবে। কিছু দরকার নেই, যেমন আছ চলে যাও"

"বেশ, তাই যাচ্ছি। কিন্তু দেখুন একটা কথা মনে রাখবেন, আমি সেখানে হয় তো না-ও পৌঁছতে পারি। গাড়ির যা অবস্থা, হয় তো 'অয়েলড্ আপ্' হয়ে যাব, কিছুই বলা যায় না। আপনি তো পিছনে বসেছিলেন, নিশ্চয়ই শুনেছেন কি রকম 'পপ' করছিলাম, ভাল্‌ভের ভিতরও অদ্ভুত আওয়াজ দিচ্ছিল একটা—"

স্বয়ম্প্রভা হাত দুটো মুঠো করে' বিস্ফারিত চক্ষে এমনভাবে চাইলেন তাঁর দিকে যে সদারঙ্গ পালাবার পথ পেলেন না।

সদারঙ্গবিহারী চলে যাবার পর পাঁচির মার সাহায্যে ছুঁচ সূতো জোগাড় করে' স্বয়ম্প্রভা নিজের শাড়িটি শেলাই করতে বসলেন। সায়াটি পরে' নিবিষ্ট চিত্তে শেলাই করে' যেতে লাগলেন। ক্লান্তিতে সমস্ত শরীর ভেঙে পড়ছিল, ঘাড় ঝুঁকে ঝুঁকে পড়ছিল ঘুমে, তবু কিন্তু তিনি থামলেন না। শাড়িটি মেরামত না করা পর্য্যন্ত থামবেন না। শেলাই চলতে লাগল। ক্রমশ কেমন যেন স্বপ্নাচ্ছন্ন হয়ে পড়লেন তিনি। নিজেরই বিগত-জীবনের স্বপ্ন সব ভীড় করে' এল মনের মধ্যে—যখন টাকা ছিল না কিন্তু শান্তি ছিল, তখন ফ্যাশান-দুরন্ত সমাজের মোহ-মরীচিকা তাঁকে প্রলুব্ধ করে' হতাশ করে নি। স্বয়ম্প্রভার চিত্ত দ্রব হয়ে এল ক্রমশ। অশ্রু টলমল করতে লাগল চোখের কোণে।

অপরাহ্ণ ক্রমশ সন্ধ্যায় পরিণত হল। জানলার ফাঁকে অস্তগামী সূর্য্যের কিরণজাল উঁকি দিয়ে অন্তর্হিত হল অবশেষে। অন্ধকার নামল, অন্ধকার গাঢ়তর হল, সদারঙ্গবিহারীলাল কিন্তু ফিরলেন না।

(২৬)

মোটরে যাবার সময় স্থশোভন অনীতাকে সব কথা খুলে বলবার স্থযোগ পায় নি। এ মোটরটিতে গোপন আলাপের কোন স্থবিধে ছিল না। অনীতাও এমন একটা উত্তেজিত অবস্থায় ছিল যে আর বিশেষ কিছু জানবার ইচ্ছে ছিল না তার। মনে হচ্ছিল যতটুকু সে শুনেছে তাই যথেষ্ট। স্থশোভন দু' একবার একটু চেষ্টা করে' থেমে গেল। ভাবলে দিগ্বিজয়বাবুর ওখানে গিয়ে বললেই হবে।

স্থরেশ্বরী যে-কোনও দুর্ঘটনার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করে' রেখেছিলেন ইতিমধ্যে। যুগল স্বামী এবং একটি স্ত্রীর এই যুগপৎ আবির্ভাবে তিনি স্থতরাং ঘাবড়ে গেলেন না। স্বামী যুগলের মধ্যে মনোমালিন্যের কোনও লক্ষণ না দেখে' আশ্বস্তই হলেন বরং একটু। স্ত্রীর অনুকরণে দিগ্বিজয়ও এগিয়ে এসে অভ্যর্থনা করলেন তাঁদের। সান্ত্বনাকে দেখা গেল না কোথাও। ব্রজেশ্বরবাবু নেবেই সান্ত্বনার খোঁজ করলেন এবং সে পাশের ঘরে আছে শুনে' সোজা সেখানে চলে' গেলেন। তার পর বিনা বাক্যব্যয়ে তাকে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন বেড়াতে। অনীতা সান্ত্বনাকে দেখবার অবসরই পেলে না।

স্থরেশ্বরী দেবীর অকৃত্রিম স্নেহপূর্ণ আতিথেয়তায় অনীতার শঙ্কা অপনোদিত হ'ল। কেতা-দুরস্ত বড়লোকী আড়ষ্টতা মোটে নেই। নিতান্তই ঘরোয়া ব্যাপার যেন। সান্ত্বনা কেমন লোক জানা যায় নি যদিও এখনও—খুব সম্ভব ভাল নয়—কিন্তু তাতেও কিছু যায় আসে না অনীতার মনে হল। স্থরেশ্বরী দেবীর আন্তরিকতায় এত মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল সে যে তাঁর বাড়িতে কোনও কিছু অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটবার কল্পনাই করতে পারছিল না সে। তারা দু'জন কাপড় বিছানা কিছু আনে নি, কিন্তু সুরেশ্বরী দেবীর তাতে যে শুধু

ভ্রূক্ষেপ নেই তা নয়, এতে যেন আরও বেশী আনন্দিত তিনি। এইটেই যেন প্রত্যাশিত ব্যাপার তাঁর কাছে।

এক ঘণ্টা পরে।

দ্বিতলের একটি শয়নকক্ষে অনীতা বিছানার উপর বসেছিল দুই হাতের উপর নিজের মুখভার রক্ষা করে' এবং সামনের দিকে ঈষৎ ঝুঁকে। মাথায় ঘোমটা ছিল না। কপালের উপর গালের উপর দুলছিল অবিন্যস্ত কালো কুঞ্চিত অলকদাম। চোখের দৃষ্টি সপ্রশ্ন, ভ্রূযুগল কুঞ্চিত। অদ্ভুত একটা বন্যশ্রী ফুটে উঠেছিল তার মুখে। সুশোভন সামনের একটা টেবিলে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়েছিল।

"তোমরা শুধু শুধু মিছে কথা বললে কেন বলতো"—অনীতা প্রশ্ন করছিল —"সান্ত্বনা বরাবর এখানেই ছিল, সেকথা তুমি জানতে, অথচ আমাকে এ মিছে কথা বলবার কি দরকার ছিল"

"তোমার কাছে মিছে কথা বলা উদ্দেশ্য ছিল না আমার"

"স্পষ্ট বললে আর বলছ উদ্দেশ্য ছিল না"

"তোমার কাছে বলা উদ্দেশ্য ছিল না। তোমার মায়ের জন্যেই বলতে হল"

"দেখ, তোমাকে অবিশ্বাস করি নি কখনও। তোমাকে বিশ্বাস করতেই চাই। কিন্তু এর পর কি করে' তা করব বল। মা অবশ্য তোমার উপর চটা, তোমাকে সন্দেহ করেন, সবই ঠিক। এজন্যে মায়ের সঙ্গে আমার ঝগড়াও হয়ে গেছে। কিন্তু তুমি মিথ্যে কথা বলবে কেন। মায়ের কাছেই বা বলবে কেন! কি দরকার—"

"ছেড়ে দাও না ওকথা। দরকার ছিল বলছি—"

"কি দরকার"

"কি"

অনীতা উঠে পড়ল। মাথার এক ঝাঁকানিতে মুখের চুলগুলো সরিয়ে উঠে দাঁড়াল। তারপর মেজেতে নেবে জানলার ধারে দাঁড়াল সুশোভনের

দিকে পিছন ফিরে। পরমুহূর্ত্তেই বদ্ধ দ্বারের সামনে পরেশ এসে বলে' গেল—
"চা দেওয়া হয়েছে মা, আপনারা আসুন"

সুশোভন টেবিলের উপর ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল এবং অনীতাকেই দেখতে লাগল ভুরু কুঁচকে। ভাবতে লাগল এই সামান্য ব্যাপারেই অনীতা যদি এমন বেঁকে দাঁড়ায় তাহলে শেষ পর্য্যন্ত তাকে সব কথা সে বলবে কি করে'। সে অকপটে সব কথা বলতেই চায় তাকে। কিন্তু—

"ওই সান্ত্বনা না কি"—হঠাৎ অনীতা জিগ্যেস করলে।

সুশোভন জানলার ধারে গিয়ে তার পাশে দাঁড়াল। দেখল সান্ত্বনা এবং ব্রজেশ্বরবাবু পাশাপাশি আসছেন মন্থর গতিতে। সান্ত্বনা হাত নেড়ে নেড়ে কি যেন বলছে ব্রজেশ্বর শুনছেন। ডাক্তাররা যে রকম সহানুভূতিপূর্ণ ভদ্র মনোযোগ সহকারে রোগীর মুখ থেকে রোগের বিবরণ শোনেন ব্রজেশ্বরের মুখভাব অনেকটা সেই রকম দেখাচ্ছিল।

"হ্যাঁ, ওই সান্ত্বনা। আলাপ হলে দেখবে চমৎকার মেয়ে"

"বেশ বয়স হয়েছে তো। আমি ভেবেছিলাম বুঝি…"

"হ্যাঁ। কিন্তু আলাপ হলে দেখো লোক খুব ভাল"

"ব্রজেশ্বরবাবুও মিথ্যে কথা বললেন! আচ্ছা, তোমরা দুজনেই মিথ্যে কথা বলতে গেলে কেন বুঝতে পারছি না"

অনীতা ঘুরে দাঁড়াল এবং চোখের উপর থেকে চুলগুলো সরিয়ে নিলে।

"সত্যি কথা বলতো। আরও কিছু কি লুকোচ্ছ আমার কাছ থেকে"

ভ্রূযুগল ঈষৎ উত্তোলন করে' ক্ষণকাল নীরব হয়ে রইল সুশোভন। তার পর বললে—"সবটা বলা হয় নি অবশ্য এখনও"

"ও"

কিছুক্ষণ নীরবতা।

"সব বল আমাকে"

"বলব বই কি। বলতেই তো চাই। কোনও অন্যায় কাজ করি নি তো। কিন্তু সবটা বুঝিয়ে বলতে একটু সময় লাগবে। তুমি চুলটা আঁচড়ে নাও। কাপড় ছাড়বে না? চা দিয়েছে যে—"

ঘরের এক কোণে ড্রেসিং টেবিল ছিল একটা। সেইটের দিকে ফিরে অনীতা বললে—"আমি চুলটা আঁচড়ে নি চট্ করে'। তুমি ততক্ষণ যতটুকু পার বল না, আঁচড়াতে আঁচড়াতেই শুনি—"

ঈষৎ বেঁকে অনীতা বেণী-রচনায় মন দিলে। স্থশোভন গলা খাঁকারি দিলে এক'বার সাড়ম্বরে। কোনও দরকার ছিল না। আড়চোখে একবার আয়নায়-প্রতিফলিত অনীতার মুখের দিকে চেয়ে দেখলে। মনে হল স্থবিধের নয়। চোখের দৃষ্টি চকমক করছে। যে কোনও মুহূর্ত্তে ফেটে পড়তে পারে। বিপজ্জনক মুখভাব।

"ঠিক কোন্ জায়গাটা থেকে আরম্ভ করি বুঝতে পারছি না। ট্রেন তো ফেল করলাম, তোমার কাছে তাড়াতাড়ি পৌঁছবার জন্য ট্যাক্সি ভাড়া করলাম একটা, সান্ত্বনাও জুটল সঙ্গে। এ সব তো শুনেইছ—"

"হ্যাঁ। তুমি সান্ত্বনাকে নিয়ে হোটেলে এলে। সেখানে কাল সমস্ত রাত্রি ছিলে। সমস্ত রাত্রি ছিলে কি? সান্ত্বনা কখন এসেছে এখানে? এইটেই আমি জানতে চাই"

"আজ"

"কি করে"

"মোটরে করে'। যে মোটরে আমরা এসেছিলাম। সেই ট্যাক্সিটা—"

"মোটর তাহলে খারাপ হয় নি?"

"হয়েছিল। গণেশ সেটাকে ঠিক করলে"

"গণেশ? ব্রজেশ্বরবাবুর ডাকনাম?"

"গণেশ হচ্ছে সেই ট্যাক্সি ড্রাইভার"

"সান্ত্বনার সঙ্গে এখানে এল কে তবে? তুমি এলে না কেন"

"আমিই এসেছিলাম"

অনীতা ঘাড় ফিরিয়ে চাইলে সুশোভনের দিকে। এক গোছা কোঁকড়ানো চুল এসে পড়ল গালের উপর। সেটা সরিয়ে দিলে অনীতা ক্ষিপ্র হস্তে।

"আবার মিছে কথা বলছ নিশ্চয়। আচ্ছা, তোমরা তখন থেকে এত মিছে কথা বলছ কেন"

"তোমার মায়ের ভয়ে"

"মাকে ভয় কি"

"এমন অমিতবিক্রমে এতদূর পর্য্যন্ত যিনি ধাওয়া করে' আসতে পারেন তাঁর উপর ভরসা করি কি করে' বল"

"যেজন্যে তিনি এসেছেন মিছে কথা বললেই সেটা মিথ্যে হয়ে যাবে? তাছাড়া ব্রজেশ্বরবাবু মিছে কথা বলছেন কেন! তাঁর তো মাকে ভয় করার দরকার নেই"

"ওটা বোধ হয় ওঁর স্বভাব। রাজনীতি করেন কি না। তাছাড়া সান্ত্বনার —মানে নিজের স্ত্রীর সম্মান রক্ষা করার জন্যেই মিছে কথা বলেছেন বোধহয়। ওঁর স্ত্রীকে কেউ সন্দেহ করে এটা বোধ হয় উনি চান না"

"হ্যাঁ, সে বিষয়ে একটু বেশী সজাগ মনে হচ্ছে। আসবামাত্রই স্ত্রীকে নিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিলেন! কিন্তু এতে সন্দেহ করবারই বা কি আছে। মোটর অ্যাক্সিডেণ্ট হয় না? মোটর অ্যাক্সিডেণ্ট হয়ে তোমরা একটা হোটেলে এসেছিলে এতে মা-ই বা দোষ ধরবেন কেন—সব কথা যদি তাঁকে খুলে বল তোমরা—"

"তিনি দোষ ধরবেন বলে' দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে এসেছেন। তাঁকে নিরস্ত করা সহজ কাজ নয়। বদ্ধপরিকর পুরুষকেই সামলানো শক্ত, উনি তার উপর স্ত্রীলোক—"

"উনি সম্পর্কে তোমার মা হন সে কথাটা মনে রেখ। বিয়ে হয়ে থেকে তুমি

ওঁর সঙ্গে বনিয়ে চলতে পারছ না ; তুমি যদি ওঁকে শ্রদ্ধা না কর উনি তোমাকে ভালবাসেন কি করে'! হাজার হোক, তুমি ওঁর জামাই—"

অনীতা এমনভাবে খোঁপার কাঁটা গুঁজলে যেন শত্রুর বুকে ছুরি হানছে।

"ও রকম স্ত্রীলোক আমি আর কখনও দেখি নি। পৃথিবীতে আর কোথাও আছে কি না জানি না। প্রতিহিংসা না জিঘাংসা—ওই যে কি একটা কথা আছে—তা যে কোনও নারীর হৃদয়ে এতখানি থাকতে পারে তা আমার কল্পনাতীত ছিল। ওঁর সামনে আমি দাঁড়াতেই পারি না। মোপলা দস্যুদল, মারাঠা বীর বা পাঞ্জাবী গুণ্ডা হয়তো পারে, আমি পারি না। আমি নিরীহ ভদ্রলোক—সাংঘাতিক কিছু করা আমার সাধ্যাতীত। উনি আমার কথা বিশ্বাস করতেন না জানি, তাই মিথ্যের আশ্রয় নিতে হয়েছিল ; তুমি করবে, কিন্তু উনি করবেন না, উনি আলাদা জাতের লোক"

"আমার মায়ের সম্বন্ধে খবরদার ওরকম করে' বোলো না বলছি"—কেঁপে উঠল অনীতার ঠোঁট দুটো—"তিনি আমার জন্যেই এত করেছেন, আমাকে ভালবাসেন বলে' "

"এবং আমাকে ঘৃণা করেন বলে' "

অনীতা ক্ষিপ্রহস্তে খোঁপাটা জড়িয়ে ঘুরে দাঁড়াল।

"এর বেশী আর কিছু নেই আশা করি তোমার বলবার"

"এখন এই পর্য্যন্তই থাক না। চা খেয়ে বাকীটা—"

অনীতা এরপর যা করলে তা অপ্রত্যাশিত। দড়াম করে' বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ল সে উপুড় হয়ে বালিশে মুখ গুঁজে'।

"অনীতা, ছি ছি কি করছ তুমি—"

"যাও তুমি নীচে গিয়ে সান্ত্বনার সঙ্গে চা খাও গিয়ে"

"তুমিও চল"

"আমি যাব না! চা খাব না আমি। মাথা ধরেছে আমার"

মিনিটখানেক হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে সুশোভন নীচে নেবে গেল অবশেষে।

সব শুনে সুরেশ্বরী বললেন, "আহা, মাথা ধরবেই তো। আসামাত্রই ওকে এক কাপ চা খাইয়ে দেওয়া উচিত ছিল আমাদের। সে কথাটা মাথাতেই এল না কারও"

"আমারই আসা উচিত ছিল। সব গুলিয়ে ফেলছি"—দিগ্বিজয় বললেন।

"তোমার দোষ কি। আমি বাড়ির গিন্নি আমারই ভাবা উচিত ছিল"

সমস্যা জটিলতর হবার পূর্ব্বেই সুরেশ্বরী দেবী ভাবলেন আগে অনীতাকে চা-টা খাইয়ে আসা যাক, তারপর ধীরে-সুস্থে ঠিক করা যাবে দোষটা আসলে কার।

নিজেই এক কাপ চা নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগলেন। ডিসে খান দুই মাখন-মাখানো টোষ্টও ছিল। কিন্তু চা চল্‌কে পড়ে' সেগুলোর এমন জবজবে অবস্থা হলো যা প্রায় অনীতারই মনোভাবের অনুরূপ। সুরেশ্বরী এই রকম একটা কিছু আশঙ্কাও করছিলেন। হাত কাঁপছিল তাঁর। যখন তিনি উপরে উঠে অনীতার ঘরের দ্বারপ্রান্তে এসে হাজির হলেন তখন টোষ্ট পুডিং হয়ে গেছে প্রায়।

তাঁর গলা শুনে অনীতা তাড়াতাড়ি উঠে কপাট খুলে দিলে। একটু লজ্জিতও হল। চা খেলে।

"চল না নীচে", সুরেশ্বরী দেবী ইতস্তত করে' বললেন একবার।

"যাচ্ছি একটু পরে"

"সুশোভনকে পাঠিয়ে দেব কি"

"না থাক। মাথাটা বড্ড ধরেছে। একটু ঘুমুই"

"সেই ভালো। ঘুমোও তাহলে"

সুরেশ্বরী দেবী নেমে এলেন ভয়ে ভয়ে। সান্ত্বনা চুপি চুপি এসে জিগ্যেস করলে, "আমি গিয়ে আলাপ করব একটু?"

"না। একলা থাক খানিকক্ষণ"

সুশোভন চা খেয়ে দিগ্বিজয়বাবুর দিকে চেয়ে বললে, "একটা চক্কোর দিয়ে আসা যাক, কি বলেন"

"হ্যা, বেশ তো। ওই পশ্চিম দিকটায় যাও। বেশ ফাঁকা মাঠ আছে। ঝোপ-ঝাড়ও আছে। বেশ নির্জ্জন ওদিকটা। একটা ছড়ি নেবে?"

একটা ছড়ি দিলেন তাকে। ছড়ি হাতে বেরিয়ে পড়ল সুশোভন। কিছুদুর গিয়েই সে ছড়ি চালাতে লাগল পথের দুধারের গাছপালার উপর। অনুপস্থিত স্বয়ম্প্রভার উপরই লাঠি চালাচ্ছেন যেন। না, আর সে খাতির করবে না, লড়েই যাবে সে এবার ভদ্রমহিলার সঙ্গে। এস্‌পার ওস্‌পার করতেই হবে যাহোক একটা। অনীতাকে নিয়ে সরে' পড়বে সে—বিলেতে পালাবে—।

...অনেক দূর হাঁটলে সে। একটা গাছতলায় বসে' পড়ল অবশেষে। হাত পা আর চলছে না যেন। উপরের দিকে চেয়ে দেখলে নির্ম্মেঘ নীলাকাশ। একটু আগেই বৃষ্টি হয়ে গেছে। সোঁদাসোঁদা মাটির গন্ধ উঠছে চারিদিকে। চমৎকার! লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল সুশোভন গাছতলায়। ভাবতে লাগল—ইংরেজ সমাজে শুনেছি পুরুষদের কাছে শাশুড়ী একটি ভয়ঙ্কর চীজ। আমাদের সমাজে মেয়েরা শাশুড়ীর ভয়ে অস্থির হয়। আমি ইংরেজও নই মেয়েও নই, অথচ আমার কপালেই এরকম খাণ্ডার শাশুড়ী জুটে গেল। উঃ! জ্বালিয়ে মেরেছে! ওহো, গোঁসাইজির হোটেলে সেই দোকানদারের সাইকেলটা পড়ে আছে। কেউ আবার নিয়ে না যায়। কাল যা হয় ব্যবস্থা করতে হবে একটা। অনীতার রাগটা কমলে এখন বাঁচা যায়। সব কথা বুঝিয়ে বলার সময়ও দিচ্ছে না যে—এমন অবুঝ আর অভিমানী—কি করা যায়! ভাবতে লাগল। ধীরে ধীরে চোখের পাতা বুজে এল তার।

অনেকক্ষণ পরে সুশোভন যখন ফিরল তখন সুরেশ্বরী দেবী বারান্দায় দাঁড়িয়েছিলেন। সুশোভনের জামা ভিজেছে, কাপড়ে কাদা লেগেছে—চুল

উসকো-খুসকো, চোখের দৃষ্টি উদ্‌ভ্রান্ত-গোছের। সুরেশ্বরী দেবীর আশঙ্কা হল আত্মহত্যা করবার চেষ্টা করছিল না তো।

সুশোভন একটু অপ্রস্তুত ভাবে বলিল—"একটা গাছতলায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম"

"ওমা, সে কি!

"ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম বড্ড"

"তাতো হবেই। বিছানায় শুয়ে ঘুমুলেই হ'ত"

"অনীতা এখনও ঘুমুচ্ছে বোধ হয়"

"সে তো চলে গেছে"

"চলে গেছে?"

"হ্যাঁ, সে চলে গেছে"

"কোথায়"

"সদারঙ্গবাবু এসেছিলেন—তিনি এর আগেও বোধ হয় এসেছিলেন একবার আজ। তিনি—"

"সেই লোকটা আবার ধাওয়া করেছে এখান পর্য্যন্ত! সাংঘাতিক তো! ভদ্রলোককে চেনেন আপনারা?"

"হ্যাঁ, একটু আধটু চেনা আছে। ভারী পরোপকারী লোক শুনেছি। তোমার সঙ্গেও আত্মীয়তা আছে শুনলুম শ্বশুরবাড়ীর দিক দিয়ে"

"থাকলেই বা! এমনভাবে এসে অনীতাকে নিয়ে যাওয়াটা ভারি অদ্ভুত লাগছে কিন্তু"

সুশোভনের কথার সুরে থতমত খেয়ে গেলেন সুরেশ্বরী একটু। এই রকমই কিছু একটা আশঙ্কা করছিলেন তিনি। সামলে নিয়ে তবু বললেন, "না, না, ভয়ের কিছু নেই। তিনি অনীতার মায়ের কাছ থেকে চিঠি এনেছিলেন একটা। সেই চিঠি পেয়ে অনীতা চলে গেল। আমি অনীতাকে বোঝাবার চেষ্টা করলাম

যে তোমাকে না বলে' এমনভাবে চলে যাওয়াটা কি ঠিক হবে! কিন্তু রাগ হয়েছে মেয়ের, কিছুতে শুনলে না আমার কথা, চলে গেল”

“কতক্ষণ হল গেছে?”

“তা অনেকক্ষণ হবে। আমার মোটরটা করেই গেল। মোটর ফিরছে বোধহয় এতক্ষণ”

“সদারঙ্গবিহারীও গেল সেই মোটরে?”

“না। তাঁর তো নিজের মোটর বাইক ছিল, তাতেই গেছেন তিনি। আমি তাঁকে বলে দিয়েছি যে তিনি যেন অনীতাকে আর তোমার শাশুড়ীকে বুঝিয়ে বলেন যে এ নিয়ে রাগারাগি করবার কিছু নেই। অনর্থক কেন মাথা খারাপ করছেন তাঁরা। কিছুই তো হয় নি। সান্ত্বনার কাছে সব শুনেছি আমি—”

“কি বললেন শুনে”

“বললেন আমি এসব ব্যাপারে জড়াতে চাই না নিজেকে”

“কিন্তু সমস্তক্ষণই তো এসব ব্যাপারেই জড়িয়ে রেখেছেন নিজেকে দেখছি। উঃ, আচ্ছা এক চিটেগুড়ের পাল্লায় পড়া গেছে কাল থেকে। অনীতা কোথায় গেছেন বলতে পারেন? মানে, তাঁর মা কোথায় আছেন এখন? সেই হোটেলেই, না আর কোথাও”

“তাতো জানি না বাবা। গাড়িটা ফিরলে ড্রাইভার বল্‌তে পারবে। তবে অনীতার মা অনীতাকে যে চিঠিটা লিখেছিলেন সেটা পড়ে ছিল ওপরের শোবার ঘরে। আমি তুলে রেখে দিয়েছি, পড়ি নি। তুমি যদি পড়তে চাও তো—”

‘হ্যাঁ চাই—”

সুরেশ্বরী দেবী চিঠিটা এনে দিলেন।

“ব্রজেশ্বরবাবুরা কোথা?”

“তারাও বেরিয়ে গেছে। ষ্টেশনে গেছে ফেরবার ট্রেনের খবর নিতে। আসবে এখুনি”

স্থশোভন ভ্রূকুঞ্চিত করে' চিঠিখানা পড়ছিল।

"উঃ—" হঠাৎ সে বলে' উঠল।

"কি"

"পড়ছি শুনুন। কি ভয়ঙ্কর"

স্থশোভন চিঠিখানা পড়তে লাগল।

কল্যাণীয়াস্থ,

এতক্ষণ তুমি নিশ্চয় আবিষ্কার করিয়াছ যে স্থশোভন এবং ব্রজেশ্বরবাবু আমাদের যাহা বলিয়াছিলেন তাহা সর্ব্বৈব মিথ্যা।

আমি সদারঙ্গের বাসায় বসিয়া এই পত্র লিখিতেছি। ফাৎনাফিরিঙ্গিপুরের পাশের গ্রাম ছিপছররামারিতে সে থাকে। তাহার মোটর বাইকের পিছনে চড়িয়া এখানে পৌঁছিয়াছি। পথে অসীম দুর্গতি ভোগ করিতে হইয়াছে। মোটর বাইক উলটাইয়া একটা ঝোপের ভিতর পড়িয়া যাই। গা ছড়িয়া গিয়াছে, কাপড়-চোপড় ছিঁড়িয়া গিয়াছে। এই দুর্ঘটনাটি না ঘটিলে আমি নিজেই তোমাকে আনিতে যাইতাম।

কাল রাত্রে যখন স্থশোভন এবং সান্ত্বনা গোঁসাইজির হোটেলে ছিল তখন দৈবক্রমে সাদারঙ্গ সেখানে গিয়ে পড়ে। সান্ত্বনার সহিত পূর্ব্ব হইতেই তাহার আলাপ ছিল। সান্ত্বনা নিজে সদারঙ্গের কাছে স্থশোভনকে নিজের স্বামী বলিয়া পরিচয় দিয়াছে। তাহারা যে একঘরে এক বিছানায় রাত্রি কাটাইয়াছে একথাও সদারঙ্গ পরে বিশ্বস্তসূত্রে জানিতে পারিয়াছে।

তোমাকে এসব কথা লিখিতে বাধ্য হইলাম—কারণ সত্যকে অস্বীকার করিয়া লাভ নাই; যতই অপ্রিয় এবং কঠোর হউক না কেন, সাহস সংগ্রহ করিয়া তাহার সম্মুখীন হইতে হইবে। সৎসাহস ভিন্ন ব্রহ্মেরও কৃপালাভ করা যায় না।

অনেক জেরা করিয়া সদারঙ্গের নিকট হইতে একথাও আমি জানিয়াছি যে ওই সান্ত্বনা মেয়েটি একটি নাম-করা মেয়ে। আর একটি ভদ্রলোকের সঙ্গেও

উহার নাকি বদনাম রটিয়াছিল। ক্ষীণভাবে মনে পড়িতেছে আমিও যেন সমাজে গুজবটা শুনিয়াছিলাম।

তুমি অবিলম্বে আমার কাছে চলিয়া এস। দিগ্বিজয়বাবুর মোটর আছে শুনিলাম। সম্ভব হইলে সেইটা লইয়া এস। আশা করি এ উপকারটুকু তাঁহারা করিবেন। যদি না করেন তুমি সদারঙ্গের মোটর বাইকের পিছনে চড়িয়াই চলিয়া আসিবে। তাহাকে বলিবে খুব সাবধানে যেন চালায়। বেশী জোরে চালাইবার দরকার নাই।

তুমি আসিলে পরামর্শ করিব কি করা উচিত এখন। সুশোভনের বিলাস-লালসার বহু উপকরণের মধ্যে তুমিও যে একটি তাহার এই ভ্রান্ত ধারণা চূর্ণ করিতে হইবে। সর্ব্বাগ্রে যেমন করিয়া হোক তাহাকে এ বিষয়ে সচেতন করিতে হইবে—আমি করিবই—তাহার পর তুমি যাহা চাও তাহাই হইবে।

আমি গোড়াতেই সন্দেহ করিয়াছিলাম, কিন্তু তোমরা আমার কথায় কর্ণপাত কর নাই। ব্রহ্মের যাহা ইচ্ছা তাহাই হইবে।

তুমি অবিলম্বে চলিয়া এস। ইতি

শুভাকাঙ্ক্ষিনী

তোমার মাতা।

পুনশ্চ। তোমার বাবা কলিকাতা ফিরিয়া গিয়াছেন।

"এখন আমি সেখানে যাই কি করে'? মানে যেতে হবেই যেমন করে' হোক"—চিঠি পড়া শেষ করে' সুশোভন জিগ্যেস করলে।

"এখনই যাবে! সে কি! কাপড় জামা ছাড়, খাওয়াদাওয়া করে' বিশ্রাম কর, তারপর ওসব হবে'খন। ওদের মনটা একটু থিতুক না"

"না। আমাকে এখনই যেতে হবে। অনীতার সঙ্গে এখনই দেখা করা দরকার—"

"কিন্তু গাড়িটা তো ফেরেনি এখনও"

"আমি হেঁটেই বেরিয়ে পড়ছি। রাস্তায় যদি আপনার গাড়ির সঙ্গে দেখা হয় নিয়ে নেব সেটা। আচ্ছা, চলি নমস্কার"

(২৭)

"অনীতা কোথা? এত দেরি কেন তোমার! এতক্ষণ আমাকে কি দুশ্চিন্তার মধ্যে ফেলে রেখেছ বলতো। তোমার পাঁচীর-মাকে আমি দূর করে' দিয়েছি। অত্যন্ত অবাধ্য। অনীতা কই?"

সদারঙ্গবিহারীলাল ঢুকতেই স্বয়ম্প্রভা উপরোক্তভাবে সম্ভাষণ করলেন। ক্লান্ত সদারঙ্গ চশমা খুলে লেন্স থেকে ধূলো পরিষ্কার করলেন আগে। এত ধূলো জমে ছিল যে ভাল করে' দেখতে পাচ্ছিলেন না তিনি।

"অনীতা আসে নি?"

স্বয়ম্প্রভা আত্মসম্বরণ করে' রইলেন যতটা পারলেন। তারপর সংযত কণ্ঠেই বললেন, "তুমি গিয়েছিলে তাকে আনতে—ফিরে এসে আমাকে জিগ্যেস করছ সে এসেছে কিনা। তুমি—"

"এতক্ষণ তার আসা উচিত ছিল। আশ্চর্য্য তো! ফানি! সে আমার আগে মোটরে করে' বেরিয়েছে, বাঃ—"

"সে বেরিয়েছে ঠিক তো?"

"ঠিক বই কি! মোটরে করে'"

"আমার চিঠি পড়ে' কি বললে"

"তা শুনিনি। শুনলাম চুপ করে' ছিল। কিন্তু বেশ মজা হ'ল তো। বাঃ হয় তো—"

"তুমি তার সঙ্গে দেখা করনি?"

"সে দোতলায় ছিল। আমি সেখানে উঠব কি করে'। সুরেশ্বরী দেবী চিঠিটা নিয়ে গিয়ে তাকে দিয়েছিলেন"

"বাবাজি ছিলেন কোথা"

"বাবাজি ? মানে, ওদের ঠাকুর ?"—বিস্মিত হ'য়ে প্রশ্ন করলেন সদারঙ্গ-বিহারীলাল।

"ইয়ার্কি করছ নাকি"

"ঠাকুরকেই তো বাবাজি বলি আমরা, মানে এ অঞ্চলে সবাই বলে"—বিস্মিত সদারঙ্গ উত্তর দিলেন—"ওদের ঠাকুরটা কোথায় ছিল জানতে চাইছেন ?"

"ওর স্বামী কোথা ছিল"

"কার স্বামী ? সুরেশ্বরী দেবীর ?"

"আরে না, না—কি গাড়োলের পাল্লাতেই পড়েছি। অনীতার স্বামী সুশোভন"

"জানি না"

"সে ওর কাছে ছিল না ?"

"কার কাছে ?"

"অনীতার কাছে। তুমি কি ভেবেছিলে সুরেশ্বরী দেবীর কাছে বলছি ?"

"হ্যাঁ"

"সুরেশ্বরী দেবীর কাছে ছিল ?"

"না। আমি ভেবেছিলাম সুরেশ্বরী দেবীর কাছে সুশোভন আছে কিনা আপনি জানতে চাইছেন"

"আহ্ হ্। ওকে দেখেছিলে ?"

"কাকে ?"

"কি বিপদ ! সুশোভনকে, সুশোভনকে"

"বললাম তো। ওর খবর জানি না"

"না বলনি তুমি"—অযথা ধমকে উঠলেন স্বয়ম্প্রভা। তারপর একটু থেমে আসল প্রসঙ্গে এলেন আবার।

"অনীতা আমার চিঠি পড়ে' মোটরে করে' বেরিয়েছে সেখান থেকে ?"

"হ্যাঁ। এ কথাও তো বলেছি আপনাকে। দেখুন, বড্ড ক্ষিদে পেয়েছে আমার। কিছু খেয়ে নি। শরীর আর বইছে না"

"সুশোভন কোনও স্থলুক-সন্ধান পায় নি তো ?"

"স্থলুক ?"

"স্থলুক সন্ধান। ও টের পায় নি তো যে অনীতা চলে এসেছে ?"

"না। এক মিনিট, একটু সবুর করুন। গোড়া থেকে সব বলব আবার। হাত মুখ ধুয়ে একটু কিছু খেয়ে নিতে দিন আমাকে"

"অনীতাকে আনতে গেলে, কিন্তু সে-ই এখনও এল না। তার খবরটা পর্য্যন্ত দিতে পারবে না ?"

"এক্ষুণি আসবে। ড্রাইভার হয় তো রাস্তা চেনে না, কিম্বা বাড়ি চেনে না। ঘুরছে। এক্ষুণি এসে পড়বে"

"ঠিক বলেছ। আশ-পাশেই ঘুরছে হয় তো। তুমি এক কাজ কর না হয়"

"কি"

"রাস্তায় গিয়ে তোমার মোটর সাইকেলের হর্ণটা বাজাও। তাহলে ওরা বুঝতে পারবে। অন্ধকারে রাস্তা খুঁজে পাচ্ছে না ঠিক। যাও—"

"দেখুন বড্ড ক্ষিদে পেয়েছে আমার। আর পেরে উঠছি না। সেই সকাল থেকে সমস্ত দিন—মানে এক নাগাড়েই প্রায়। তা ছাড়া আপনি এমন অস্থির হচ্ছেন কেন তাও তো বুঝছি না। আমি গোড়া থেকেই তো বলছি—সান্ত্বনা মেয়েটি খুব ভাল—একা একটা নাইট-স্কুল চালাত—রীতিমত 'গুড' যাকে বলে—স্বরেশ্বরী দেবীও 'কনফার্ম' করলেন এ কথা"

"বাজে বক্তৃতা না করে' যা বলচি কর গে যাও। রাস্তায় হর্ণ বাজাও গিয়ে। যাও, আর দেরি কোরো না"

সদারঙ্গ আর প্রতিবাদ করতে সাহস করলেন না। রাস্তায় দাঁড়িয়ে হর্ণ বাজাতে লাগলেন। কোনও ফল হল না। ফিরে এসে খেতে বসলেন। স্বয়ম্প্রভার তাড়ায় খেতে খেতেও বার দুই উঠে' গিয়ে হর্ণ বাজিয়ে আসতে হল তাঁকে। কিন্তু অনীতার মোটর এল না।

গোঁসাইজি প্রাত্যহিক নিয়ম অনুসারে হোটেল বন্ধ করবার পূর্ব্বে চারিদিকটা দেখে নিচ্ছিলেন একবার। দোরগোড়ায় ঠেসানো বাইসিকলটার দিকে একবার চাইলেন। কখন এসে ভদ্রলোক নিয়ে যাবেন কে জানে। বাইরের ঘরে একটা ব্যাগ আর একটা বেঁটে ছাতা রয়েছে, সেই মেয়েটির বোধ হয়, যিনি হোটেলে এসে রাত্রিবাস করতে চাইছিলেন। নাক কুঁচকে এমনভাবে চাইলেন সেগুলোর দিকে, যেন সেগুলো থেকে কোনও দুর্গন্ধ নির্গত হচ্ছে। তারপর উপরে গেলেন। গুরু-ভগ্নীর খোঁজ নিলেন একবার। নাবছেন এমন সময় দেখলেন একটি মোটর এসে দাঁড়াল তাঁর হোটেলের সামনে। আবার কে জুটল এসে এ সময়। বাইরের ঘরটাতে অপেক্ষা করতে লাগলেন। তিনি যে আপাতত অতিথি-সৎকার করতে অক্ষম এই কথাগুলি আর একবার উচ্চারণ করবার সুযোগ পেয়ে ঈষৎ পুলকিতও হলেন মনে মনে।

অনীতা মোটর থেকে নেবে এল।

"আপনিই কি এই হোটেলের মালিক"

"হ্যাঁ। কিন্তু আপাতত অতিথি-সৎকার করতে অক্ষম আমি। আমার দু'টি ঘরেই লোক আছে"

"এখানে সকালের দিকে আমি এসেছিলাম একবার। তখন আপনি ছিলেন না—"

"ও। এই জিনিসগুলি আপনার তাহলে"

"হ্যাঁ"

"তাহলে নিয়ে যান। এখানে তো স্থান নেই। আর একজন মহিলাও

আসতে চেয়েছিলেন—তিনি সদারঙ্গবাবুর বাইকের পিছনে চড়ে যাচ্ছিলেন—আমি ভেবেছিলাম এগুলো তাঁরই বুঝি”

“হ্যাঁ, আমাদেরই। আমি তাঁর মেয়ে”

“ও! এই বয়সেও আপনার মায়ের বুকের পাটা আছে বলতে হবে। ইসিকলের পিছনে ঝুলতে ঝুলতে যাওয়া কম সাহসের কাজ নয়, বিশেষত এ য়সে! জিনিসগুলো নিতেই এসেছেন তাহলে আপনি”

“হ্যাঁ। আর একটু কাজও আছে—”

“আবার কি”

একটা খবর যদি দিতে পারেন”

“কিসের খবর”

“দেখুন, আপনার এই হোটেলকে কেন্দ্র করে’ নানা রকম অদ্ভুত খবর শোনা যাচ্ছে। আমিও তার মধ্যে জড়িয়ে পড়েছি। আপনার মুখ থেকে সত্যি কথাটা শুনতে চাই”

“আমার হোটেল সম্বন্ধে অদ্ভুত খবর! শুনে স্তম্ভিত হচ্ছি। কে বলেছে—”

“সদারঙ্গবিহারীলাল বলে’ এক ভদ্রলোক। তিনি নাকি কাল রাত্রে এখানে এসেছিলেন। তিনি বলেছেন—”

“ও, তিনি! তাঁর অসাধ্য কিছু নেই”

“তিনি কাল রাত্রে এখানে না কি একজন ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলাকে দেখেন। তাঁরা এখানে না কি কাল রাত্রে ছিলেনও। তাঁদের সঙ্গে আর কোনও তৃতীয় ব্যক্তি ছিল কি?

“কংগ্রেসকর্ম্মী অধ্যাপক ব্রজেশ্বর দে আর তাঁর স্ত্রীর কথা বলছেন কি?”

“হ্যাঁ। অন্তত—তাঁরা দু’জনে কি ছিলেন এখানে?”

“আপনার প্রশ্নের উত্তর দিতে বাধ্য নই আমি জানবেন। ওরকম ভাবে জেরা যদি করেন কিছু বলব না। তবে ভদ্রভাবে যদি জানতে চান বলছি, হ্যাঁ

তাঁরা ছিলেন। তৃতীয় ব্যক্তি আর কেউ ছিল না। একটা হতচ্ছাড়া কুকুর ছিল অবশ্য—"

"দেখুন সমস্ত ঘটনা আমার পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানা দরকার। আপনি দয়া করে' যা জানেন খুলে বলুন। খবরগুলো আমাকে জানতেই হবে যেমন করে' হোক। দরকার হলে আইনের সাহায্যও নিতে হবে শেষ পর্য্যন্ত—"

"আইনের সাহায্য! আপনি কি বলতে চান, আমার হোটেলে বে-আইনী কিছু করি আমি? আইন দেখাচ্ছেন আমাকে! জানেন আমার হোটেল যে আইন অনুসারে চালাই আমি—তা একেবারে নিখুঁত? সন্দেহজনক কোন কিছুকেই প্রশ্রয় দেওয়া হয় না এখানে"

"তা জানি বলেই তো আপনাকে এত কথা জিগ্যেস করছি"

গোঁসাইজির ভাব-ভঙ্গী দেখে অনীতা ঈষৎ মোলায়েম স্বর ধরলে। তা না হলে কার্য্যোদ্ধার হবে না। তার এ কথায় প্রীতও হলেন গোঁসাইজি। বললেন,

"কোনও বাজে লোককে ঢুকতে দিই না আমি এখানে। এখানে ও-সব চালাকি চলবার উপায় নেই"

ঈষৎ হেসে অনীতা বললে—"কিন্তু আপনাকে কেউ ঠকাতেও তো পারে"

"ঠকাবে? আমাকে? আমি কি কচি খোকা?"

"ধরুন, কাল যাঁরা এসেছিলেন তাঁরা যে ব্রজেশ্বরবাবু আর তাঁর স্ত্রী এ কি করে' জানলেন আপনি"

"সদারঙ্গবাবু এই সব বলে' বেড়াচ্ছেন বুঝি! দেখুন, আমি প্রমাণ না রেখে কোনও কাজ করি না। একবার এক অ্যানার্কিষ্ট ছোকরা আমাকে ফাঁকি দিয়েছিল, তার পর থেকে আমি সাবধান হয়েছি। তা ছাড়া একজন কংগ্রেস-কর্ম্মী অধ্যাপক কি মিছে কথা বলবেন?"

"তিনি হয়তো বলবেন না, কিন্তু তাঁর নাম করে' অপর কেউ আপনাকে ঠকিয়ে যেতে পারে"

"তাঁর নাম করে'?"—ঈষৎ থতমত খেয়ে গেলেন গোঁসাইজি, তারপর

আসতে চেয়েছিলেন—তিনি সদারঙ্গবাবুর বাইকের পিছনে চড়ে যাচ্ছিলেন—আমি ভেবেছিলাম এগুলো তাঁরই বুঝি"

"হ্যাঁ, আমাদেরই। আমি তাঁর মেয়ে"

"ও! এই বয়সেও আপনার মায়ের বুকের পাটা আছে বলতে হবে। বাইসিকলের পিছনে ঝুলতে ঝুলতে যাওয়া কম সাহসের কাজ নয়, বিশেষত এ বয়সে! জিনিসগুলো নিতেই এসেছেন তাহলে আপনি"

"হ্যাঁ। আর একটু কাজও আছে—"

"আবার কি"

একটা খবর যদি দিতে পারেন"

"কিসের খবর"

"দেখুন, আপনার এই হোটেলকে কেন্দ্র করে' নানা রকম অদ্ভুত খবর শোনা যাচ্ছে। আমিও তার মধ্যে জড়িয়ে পড়েছি। আপনার মুখ থেকে সত্যি কথাটা শুনতে চাই"

"আমার হোটেল সম্বন্ধে অদ্ভুত খবর! শুনে স্তম্ভিত হচ্ছি। কে বলেছে—"

"সদারঙ্গবিহারীলাল বলে' এক ভদ্রলোক। তিনি নাকি কাল রাত্রে এখানে এসেছিলেন। তিনি বলেছেন—"

"ও, তিনি! তাঁর অসাধ্য কিছু নেই"

"তিনি কাল রাত্রে এখানে না কি একজন ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলাকে দেখেন। তাঁরা এখানে না কি কাল রাত্রে ছিলেনও। তাঁদের সঙ্গে আর কোনও তৃতীয় ব্যক্তি ছিল কি?

"কংগ্রেসকর্ম্মী অধ্যাপক ব্রজেশ্বর দে আর তাঁর স্ত্রীর কথা বলছেন কি?"

"হ্যাঁ। অন্তত—তাঁরা দু'জনে কি ছিলেন এখানে?"

"আপনার প্রশ্নের উত্তর দিতে বাধ্য নই আমি জানবেন। ওরকম ভাবে জেরা যদি করেন কিছু বলব না। তবে ভদ্রভাবে যদি জানতে চান বলছি, হ্যাঁ

তাঁরা ছিলেন। তৃতীয় ব্যক্তি আর কেউ ছিল না। একটা হতচ্ছাড়া কুকুর
ছিল অবশ্য—"

"দেখুন সমস্ত ঘটনা আমার পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানা দরকার। আপনি দয়া
করে' যা জানেন খুলে বলুন। খবরগুলো আমাকে জানতেই হবে যেমন করে'
হোক। দরকার হলে আইনের সাহায্যও নিতে হবে শেষ পর্য্যন্ত—"

"আইনের সাহায্য! আপনি কি বলতে চান, আমার হোটেলে বে-আইনী
কিছু করি আমি? আইন দেখাচ্ছেন আমাকে! জানেন আমার হোটেল যে
আইন অনুসারে চালাই আমি—তা একেবারে নিখুঁত? সন্দেহজনক কোন
কিছুকেই প্রশ্রয় দেওয়া হয় না এখানে"

"তা জানি বলেই তো আপনাকে এত কথা জিগ্যেস করছি"

গোঁসাইজির ভাব-ভঙ্গী দেখে অনীতা ঈষৎ মোলায়েম স্বর ধরলে। তা না
হলে কার্য্যোদ্ধার হবে না। তার এ কথায় প্রীতও হলেন গোঁসাইজি। বললেন,
"কোনও বাজে লোককে ঢুকতে দিই না আমি এখানে। এখানে ও-সব চালাকি
চলবার উপায় নেই"

ঈষৎ হেসে অনীতা বললে—"কিন্তু আপনাকে কেউ ঠকাতেও তো পারে"

"ঠকাবে? আমাকে? আমি কি কচি খোকা?"

"ধরুন, কাল যাঁরা এসেছিলেন তাঁরা যে ব্রজেশ্বরবাবু আর তাঁর স্ত্রী এ কি
করে' জানলেন আপনি"

"সদারঙ্গবাবু এই সব বলে' বেড়াচ্ছেন বুঝি! দেখুন, আমি প্রমাণ না রেখে
কোনও কাজ করি না। একবার এক অ্যানার্কিষ্ট ছোকরা আমাকে ফাঁকি
দিয়েছিল, তার পর থেকে আমি সাবধান হয়েছি। তা ছাড়া একজন কংগ্রেস-
কর্ম্মী অধ্যাপক কি মিছে কথা বলবেন?"

"তিনি হয়তো বলবেন না, কিন্তু তাঁর নাম করে' অপর কেউ আপনাকে
ঠকিয়ে যেতে পারে"

"তাঁর নাম করে'?"—ঈষৎ থতমত খেয়ে গেলেন গোঁসাইজি, তারপর

অযৌক্তিকভাবে বলে' উঠলেন—"দেখুন, আপনি যদি আইনের সাহায্য নেন আপনার বন্ধু সদারঙ্গবাবু মানহানির দায়ে পড়ে' যাবেন বলে' দিচ্ছি। আমার হোটেলের নামে এ রকম যা তা কথা রটিয়ে পরিত্রাণ পাবেন না উনি—"

"না, তাঁর কথা বিশ্বাস করি নি আমি। আমি শুধু জানতে চাইছি যিনি এসেছিলেন তিনিই যে ব্রজেশ্বরবাবু এর কোনও প্রমাণ আছে কি আপনার ?"

"প্রমাণ ? তিনি তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে একঘরে একখাটে শুয়েছিলেন আমি তা স্বচক্ষে দেখেছি—মানে, দৈবাৎ দেখে ফেলেছি"

"এটা কি একটা প্রমাণ হল ? আপনিই বলুন"

ভ্রূকুঞ্চিত করে' গোঁসাইজি চেয়ে রইলেন খানিকক্ষণ অনীতার দিকে। সঙীন মেয়ে তো ! কালে কালে হচ্ছে কি !

"আরও প্রমাণ আছে, আসুন আমার সঙ্গে। আমি যতটা পেরেছি প্রমাণ রেখেছি। আসুন—"

অনীতার চোখের দৃষ্টি উজ্জ্বল হয়ে উঠল। গোঁসাইজির পিছু পিছু আপিস ঘরে ঢুকল সে। আশা আর আশঙ্কার দ্বন্দ্ব চলছিল তার মনে। বুকের ভিতরটা ঢিপ ঢিপ করছিল।

গোঁসাইজি তাঁর 'অ্যাড্‌মিশন রেজিস্টার'খানি পাড়লেন।

"এই খাতায় প্রত্যেক অতিথিকে স্বহস্তে নিজের নাম এবং পরিচয় লিখে দিতে হয়। আমি স্বচক্ষে ব্রজেশ্বরবাবুকে এই খাতায় নিজের নাম এবং পরিচয় লিখতে দেখেছি। এই দেখুন—"

"দেখি"

দেখেই অনীতার মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল।

"আপনি স্বচক্ষে তাঁকে লিখতে দেখেছেন"

"তিনি যখন লিখছিলেন আমি ঘরে এসে ঢুকলাম। স্বচক্ষে দেখেছি বই কি—"

অনীতার বুকের ভিতরটা সহসা মুচড়ে উঠল অনুতাপে। ছি, ছি, সুশোভনের প্রতি কি অবিচারই করেছে সে। এ হাতের লেখা সুশোভনের হতেই পারে না।

এমন স্পষ্ট গোটাগোটা করে' লিখতেই পারে না সুশোভন। তার লেখা তো অর্দ্ধেক পড়াই যায় না, এমন হিজিবিজি করে' লেখে সে।

খাতা বন্ধ করে' অনীতা বেরিয়ে এল আপিস ঘর থেকে। গোঁসাইজিও এলেন।

"দেখুন, আমার হোটেলের বদনাম দেবার সাহস হয় নি আজ পর্য্যন্ত কারও— তা তিনি সদারংই হোন বা সদ্বিক্রমই হোন। কোনও খুঁত রাখি নি আমি। এটা হোটেল নয়, পান্থনিবাস—"

"না আপনার ব্যবস্থা সত্যিই খুব ভাল। আমাদেরই ভুল হয়েছিল। অনেক ধন্যবাদ। নমস্কার—"

অনীতা মোটরে চড়ে বসল। কতকগুলো সমস্যার সমাধান হল না এখনও। সুশোভন কাল রাত্রে কোথায় শুয়েছিল? সুশোভন বললে কাল রাত্রে সে এখানে ছিল। কোথায় শুয়েছিল তাহলে? যাই হোক, একটা ব্যাপার সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়া গেল—সুশোভনকে মিছে সন্দেহ করেছিল তারা। কাল রাত্রে সুশোভন যাই করে' থাক, সে নির্দ্দোষ। বেচারি বার বার চেষ্টা করেছে নিজের দোষস্খালন করবার—কিন্তু সে তার কথায় কর্ণপাত পর্য্যন্ত করে নি।

"এখন কোথায় যাব মা?"—ড্রাইভার জিগ্যেস করল।

"ফিরে চল—"

"বাড়ি?"

"হ্যাঁ"

"এই থাম থাম"—

চীৎকার করে' উঠল সুশোভন।

"দিগ্বিজয়বাবুর গাড়ি না কি"

ক্যাঁচ করে' থেমে গেল গাড়িটা।

"আজ্ঞে হ্যাঁ"—ড্রাইভার জবাব দিলে মুখ বাড়িয়ে।

"শোন, আমি গাড়ি নিয়ে ছিপ্‌ছররামারি বা ফাংনাফিরিঙ্গিপুরে যাব—মানে, অনীতাকে যেখানে রেখে এসেছ সেইখানে রেখে এস আমাকে। জরুরি দরকার"

"তুমি!"

"অনীতা?"

"এস, ভিতরে ঢোক"

তড়াক করে' মোটরে উঠে বসল সুশোভন।

"দেখ, আমি সব বুঝিয়ে বলতে চাই। তুমি অমন অবুঝের মতো করছ কেন। বুঝিয়ে বলছি সব, শোন আগে—"

"দরকার নেই। কিচ্ছু বলবার দরকার নেই। পরে বোলো কোন সময়ে যদি তোমার ইচ্ছে হয়। আমি সব খবর নিয়েছি। বড় অন্যায় হয়ে গেছে আমার। রাগ কোরো না, লক্ষ্মীটি। প্রথমটা মনে হয়েছিল—আমায় মাপ কর তুমি—মাপ কর—বল, মাপ করেছ?"

সুশোভন এটা প্রত্যাশা করে নি। ঘটনা-পরম্পরা যে এমন নাটকীয়ভাবে হঠাৎ ডিগবাজি খেয়ে যাবে তা তার কল্পনাতীত ছিল।

"মাপ? মোটেই না, মানে ও প্রশ্নই ওঠে না। আমাকে ভুল বুঝে তোমরা কেন যে এমন করছ—"

"আর কক্ষণো করব না। এইবারটি মাপ কর"

"না, না, মাপ মানে—উঃ একটা দুঃস্বপ্ন দেখে উঠলাম মনে হচ্ছে। যাক, এখন কি করা যায় বল তো"

সুশোভনের ইচ্ছে করছিল বেলুনের মতো উড়তে।

"চল দু'জনে কোলকাতা ফিরে যাই"

"তা তো যাবই। রাতটা কোথায় কাটানো যায়? এখানে ভালো হোটেল আছে কোথাও বলতে পার"

"দীঘড়াতে আছে। কাছেই"—ড্রাইভার উত্তর দিলে।

"তাহলে সেইখানেই নিয়ে চল আমাদের"

গাড়ি দীঘড়া অভিমুখে ধাবিত হল।

"এইবার সব বলি তাহলে খুলে"—অনীতার দিকে ঘুরে বসল সুশোভন।

"কি দরকার—আসল কথাটা জেনেই গেছি যখন"

"কি করে' জানলে"

"গোঁসাইজির সঙ্গে দেখা করে'। অ্যাড্‌মিশন রেজিস্টারটা দেখেছি। দু'একটা কথা যদিও স্পষ্ট হয় নি এখনও, কিন্তু সে পরে হলেও চলবে"

গাড়ি দীঘড়ায় এসে পৌছল।

নেবেই সুশোভন চেঁচিয়ে উঠল—"আরে গণেশ যে! তুমি এখনও যাও নি!"

গোঁফ চুমরে গণেশ বললে, "এইবার যাব। সমস্ত দিন লেগে গেল রেডিয়েটারটা সারাতে। এখানকার মিস্ত্রি সব অতি বাজে। ঝালতেই জানে না"

"ঠিক হয়েছে এখন?"

"হয়েছে"

"গাড়ি কোথায় তোমার"

"মিস্ত্রির বাড়ির সামনে"

"চল তাহলে তোমার গাড়িতেই ফিরি। এখনি যাব কিন্তু"

"বেশ। গাড়িটা আনি তাহলে"

গণেশ চলে গেল।

সুশোভন অনীতার দিকে ফিরে বললে, "দিগ্বিজয়বাবুকে একটা চিঠি লিখে দি তাহলে—যে পরে কোনও এক সময় আসব আমরা। এখন ফিরে চললুম"

"বেশ"

পকেটবুক থেকে একখানা পাতা ছিঁড়ে সুশোভন একখানা চিঠি লিখে দিলে। ড্রাইভারকে বখশিসও দিলে। তারপর হোটেলে ঢুকল। গরম ভাত, মুগের ডাল, আর গরম মাছভাজা পাওয়া গেল। যথেষ্ট।

খাওয়া দাওয়া সেরে অনীতা বললে—"কোলকাতা যাবার আগে মাকে কিন্তু খবরটা দিতে হবে"

"হ্যাঁ, সদারঙ্গবিহারীলালকেও"

"আমি গিয়ে দেখা করে' এলে কেমন হয়। কাছেই তো, না?"

স্থশোভন ইতস্তত করতে লাগল।

"তোমার গিয়ে দরকার নেই। এখানকার পথঘাট ভাল নয়, তাছাড়া তোমাকে তোমার মা হয় তো ছাড়তে চাইবেন না—সে আবার এক বখেড়া হবে। তার চেয়ে আমিই যাই বরং। খবরটা দেওয়া তো কেবল—"

"আমি মাকে একটা চিঠি লিখে দিই না হয় যে ভয়ের কোনও কারণ নেই। আমাদের আশঙ্কা অমূলক—কি বল—"

মুচকি হেসে স্থশোভনের দিকে চাইলে অনীতা।

"বেশ তাই দাও"

হোটেলওয়ালার কাছ থেকে কাগজ চেয়ে অনীতা চিঠি লিখতে বসল। লিখতে লিখতে অনীতা হঠাৎ জিগ্যেস করলে "আচ্ছা কাল রাত্রে তুমি ছিলে কোথা? তুমিও ওইখানেই ছিলে?"

"সে অনেক কথা। পরে শুনো"

"এইটুকু বল না এখন—"

"হ্যাঁ, ওই হোটেলেই ছিলাম। তবে নানা স্থানে। ঘর তো একটি। কখনও বারান্দায়, কখনও খাবার ঘরে, কখনও উঠোনে, কখনও সিঁড়িতে—এইভাবে কাটিয়েছি আর কি। ভিজেওছিলাম বেশ—"

"ছি, ছি, কি দুর্গতি"

"চরম"

"অসুখ না করে"

"না কিচ্ছু হবে না"

"কিন্তু তোমরা দু'জনে মিলে মিথ্যে কথাটা বললে কেন তা এখনও বুঝতে পারছি না আমি। সান্ত্বনা হোটেলে আছে—মিছে করে' একথা বলতে গেলে কেন"

"না বললে তুমি আমাদের সঙ্গে মোটরে আসতে না"

"আহা"

"নাও, চিঠিটা লিখে ফেল চটপট"

* * *

"এতো সঙীন প্যাঁচ হল দেখছি"—সদারঙ্গবিহারী চিবুক চুলকে বলে' উঠলেন।

"প্যাঁচ! মেয়েটা অন্ধকারে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরছে, সেটা তোমার কাছে প্যাঁচ মনে হচ্ছে! আবার যাও, দেখ কি হল"

"রাস্তায় গিয়ে আর কি করব। ছ'বার তো গেলাম। দিগ্বিজয়বাবুর 'কারে' এসেছে, চিন্তার কোনও কারণ আছে বলে' মনে হয় না। প্যাঁচ অন্য কারণে বলছিলাম। আমাদের কি হবে"

"আমাদের?"

"মানে, শোবার কথা ভাবছি। দোতলার পাঁচির মায়ের ঘরটায় অবশ্য আপনি শুতে পারেন"

"আমি ঘুমুব না। চিন্তায় আমার ঘুম আসবে না। যেখানেই আমাকে শুতে দাও—খাড়া বসে' থাকব আমি সারারাত"

"ও। তাহলে, মানে রাগ করবেন না, আমিই ভাবছিলাম পাঁচির মায়ের ঘরটায় শোব। আপনার সেখানে হয়তো কষ্ট হবে। কিন্তু আপনি যদি জেগে থাকাই 'ডিসাইড' করে' থাকেন তাহলে—ঘরটা কিন্তু—"

"আমি দেখেছি সে ঘর, রাতটা কাটিয়ে দিতে পারব"

"বেশ। কিন্তু আপনি গায়ে কি দেবেন? পাঁচির মায়ের লেপ ছিল একটা—"

"চল দেখি গিয়ে"

"সেই ভাল। না হয় পাড়া থেকে চেয়ে-চিন্তে আনব একটা। জনার্দ্দনবাবু একটা এক্‌স্‌ট্রা লেপ করিয়েছেন এবার জানি"

"চল"

একটা মোমবাতি জ্বালিয়ে নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠলেন দু'জনে। পাঁচির মা থাকত ছাতের ছোট্ট ঘরটায়। সিঁড়ির দুয়ারে মিলারের তালা লাগানো ছিল একটা, চাবি লাগাবামাত্র লাফিয়ে খুলে যায় যেগুলো—আবার টিপলেই বন্ধ হয়ে যায়। সদারঙ্গ চাবিটা খুললেন। রিংসমেত তালাটা 'স্থর্সো'তে ঝুলতে লাগল।

…পাঁচির মার তক্তাপোষের উপর কোণের দিকে বিছানার মতো কি একটা গোটানো ছিল। স্বয়ম্প্রভা—খুলে দেখলেন সেটা। দেখে নাক সেঁটকালেন।

সদারঙ্গবিহারী বললেন, "আপনি যদি ওটা গায়ে না দিতে চান, আমিই দেব না হয়। আমার লেপটা আপনি নিন। তাহলে পাড়ায় বেরিয়ে ছুটোছুটি করতে হয় না আর। রাত প্রায় দশটা হল তো—"

"বেশ তাই হবে। চল নীচে যাই। সিঁড়ির কপাট আবার বন্ধ করতে গেলে কেন। খোল"

"বন্ধ তো করি নি। হাওয়ায় বন্ধ হয়ে গেছে বোধহয়। খুলছি। আরে—এ কি—"

"কি হল"

"এ যে বন্ধ। বাইরে থেকে বন্ধ—আরে"

"শিগ্‌গির কপাট খোল বলছি। রসিকতা করবার সময় এ নয়"

"খুলছে না। একি—আরে"

"খোল বলছি"

"পারছি না, বাইরে থেকে বন্ধ করে' দিয়েছে কেউ। তালাটা বাইরে ঝুলছিল"

"বাজে কথা। ধাক্কা মার। বন্ধ করতে আসবে কে? আর করবেই বা কেন? ঠেল, জোরে ঠেল, ধাক্কা দাও"

সদারঙ্গবিহারীলাল ধাক্কা দিলেন, তারপর ঠেললেন, তারপর স্বয়ম্প্রভার দিকে চাইলেন একবার। মুখে করুণ হাসি। মাথা নাড়লেন। আবার ঠেললেন। কিন্তু না, কপাট খুলল না।

"বাইরে থেকে বন্ধ করে' দিয়েছে কেউ। তালাটা বাইরে ঝুলছিল কি না। কেউ হয়তো ঠাট্টা করে' কিম্বা, কি জানি—"

"আবার ঠেল। ঠেল। গুঁতো মারো। গায়ে জোর নেই না কি! সর—"

"দেখুন আপনি যদি পারেন। দেখুন। পারবেন না। অসম্ভব"

স্বয়ম্প্রভা চেষ্টা করলেন। দাঁতে দাঁত দিয়ে প্রাণপণে চেষ্টা করলেন। হল না। তারপর হঠাৎ তিনি রুখে দাঁড়ালেন। হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন—"তুমিই ষড় করেছিলে বোধহয় কারও সঙ্গে—"

"ষড়! রামঃ—না—না—ছি—বাঃ। পা ছুঁয়ে বলতে পারি আপনার"

"কে তবে বন্ধ করলে কপাট"

"কি করে'—বলব। আপনিও যেখানে আমিও সেখানে। হয়তো পাড়ার কেউ ঢুকেছিল, ইয়ার্কি করে' গেছে। অন্যায় কিন্তু। খুব। ভাবতেই পারি না"

"যেমন করে' হোক বেরুতেই হবে"

"কি করে' তাতো বুঝতে পারছি না"

"সমস্ত রাত এখানে থাকব বলতে চাও তোমার সঙ্গে। বেরুতে হবে যেমন করে' হোক। অনীতা যে কোনও মুহূর্ত্তে এসে পড়তে পারে"

"তা পারে। কিন্তু—ছি—কি কাণ্ড। কি করি বলুন তো"

"চেঁচাও। পাড়ার সবাইকে জাগাও চেঁচাও—"

"না, না, ছি, সে কি হয়! আমি এখানে বাস করি, আমার একটা মান-সম্ভ্রম আছে এখানে। না—চেঁচানো চলবে না। লোকে হাততালি দেবে।

চেনেন না আপনি এদের। গুজবের চোটে কান পাতা যাবে না। সে ভয়ানক ব্যাপার হবে। আপনার পক্ষেও। ঘাবড়ে যা তা করবেন না। দাঁড়ান—"

স্বয়ম্প্রভা পাঁচির মার খাটের উপর বসে' পড়লেন। বিস্রস্ত-কেশ, স্ফীত-নাসারন্ধ্র। সদারঙ্গবিহারীলাল চশমটা খুলে মুছলেন। তারপর সেটা পরে' সভয়ে চেয়ে রইলেন তাঁর দিকে।

"সমস্ত রাত তোমার সঙ্গে এই ঘরে থাকতে হবে নাকি"—চীৎকার করে' উঠলেন স্বয়ম্প্রভা।

"দোহাই আপনার, চেঁচাবেন না অমন করে' "

"কপাট খোল এক্ষুণি। তা নাহলে চেঁচিয়ে পাড়া মাথায় করব আমি—"

"না, না, লোকে হয়তো ভাববে আমি বলাৎ—মানে, খারাপ কিছু করছি বুঝি একটা। একটু সবুর করুন। আমি দূরে থেকে দৌড়ে গিয়ে ধাক্কা মেরে মেরে দেখি। হয় তো ভেঙেও যেতে পারে—ভয়ানক শব্দ হবে কিন্তু—"

"যা করবার কর। আমি এখানে আর একদণ্ড থাকতে চাই না"

ছোট ঘর। দৌড়বার বেশী স্থান ছিল না। মালকোচা মেরে সামান্য একটু ছুটে এসে সদারঙ্গবিহারী যে ধাক্কাটা মারলেন তা নিতান্তই হাস্যকর। কপাট খোলা দূরে থাক তেমন কোনও শব্দও হল না।

"ঠেল, ঠেল, জোরে, আরও জোরে"—চেঁচাতে লাগলেন স্বয়ম্প্রভা।

"হেঁইও—হেঁইও"—সদারঙ্গ চেঁচাতে লাগলেন ঠেলতে ঠেলতে।

"ঠেল, ঠেল, আরও জোরে—"

"বাপ্‌স্—উঃ! চেঁচাবেন না অত জোরে দোহাই আপনার। পাড়ার লোকে যদি শুনে ফেলে—বুঝতেই পারছেন"

(২৮)

অনুসন্ধান করতে করতে সুশোভন সদারঙ্গবিহারীর বাসায় এসে দেখলে কপাট খোলা। আলো জ্বলছে। ঘরে নেই কেউ। ছাতাটি এবং ব্যাগটি সে মেঝেতে

নামিয়ে রাখলে। তারপর অনীতার চিঠিটা বার করে' টেবিলের উপর ঠিক সামনেই এমন ভাবে রাখলে যাতে ঘরে ঢুকলেই চোখে পড়ে।

উপরে শব্দ শুনে ঘাড় ফিরিয়ে দেখলে—সিঁড়ি রয়েছে একটা বারান্দার দিকে। আলো দেখা যাচ্ছে, কথাবার্ত্তাও শোনা যাচ্ছে। ঘর থেকে বেরিয়ে সন্তর্পণে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগল সে। পায়ে ছিল রবার সোল্‌ড্‌ জুতো, কোনও শব্দ হল না। সিঁড়ির কপাটটা হাওয়াতে আপনি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। দোদুল্যমান মিলারের তালাটা চোখে পড়ল। সদারঙ্গবিহারীলাল এবং স্বয়ম্প্রভার কথার টুকরো শুনতে পেলে দু'একটা। ক্ষণকাল স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সুশোভন। পরমুহূর্ত্তেই হাসি চিকমিক্ করে' উঠল তার চোখে। আস্তে আস্তে উঠে তালাটি কুট করে' লাগিয়ে দিয়ে নেবে এল সে। চাবির রিংটি টেবিলের উপর রেখে বেরিয়ে পড়ল। মিনিট দশেকের মধ্যেই হোটেলে পৌঁছে গেল আবার।

"খুব চট করে' ফিরলে তো"

"হ্যাঁ, চিঠিটা সদারঙ্গবাবুকে দিয়েই চলে এলাম। কথাবার্ত্তা হল না তেমন কিছু"

"মাকে কেমন দেখলে"

"তিনি পাশের ঘরে ছিলেন, তাঁর সঙ্গে আর দেখা করি নি"

"চটবেন খুব"

"গণেশ এসেছে ?"

"হ্যাঁ"

"চল তবে আর দেরি কেন"

"চল"

মোটর ছুটে চলেছে নিঃশব্দ দ্রুতগতিতে অন্ধকার ভেদ করে'। ঘেঁসাঘেঁসি করে' পাশাপাশি বসে' অনীতা আর সুশোভন। সুশোভনের ঘাড়ে মাথা রেখে অনীতা ঘুমুচ্ছে।

সমাপ্ত